স্মরণীয় বিচার

চিরঞ্জীব সেন

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন, কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন
কলিকাতা -৭০০০০৯

মুদ্রক : প্রশান্ত তালুকদার
গদাধর প্রিণ্টার্স
৪১/ডি/১০৩ মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা-৬৭

প্রচ্ছদ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঃ যে-সকল ঐতিহাসিক বিচার এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ঃ

বাহাদুর শাহ্-এর বিচার
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা
আজাদহিন্দ ফৌজের বিচার
লাল সিং-এর বিচার
নির্মলকান্ত রায়ের বিচার
আলিপুর বোমা মামলা
শহীদগঞ্জের মামলা
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার
কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা
ভগৎ সিং-এর বিচার
কমাণ্ডার নানাবতির বিচার
গান্ধী হত্যার বিচার

এই লেখকের অন্যান্য বই

এনটিবি বিভীষিকা
স্ক্যাণ্ড্যাল
স্মরণীয় বিচার
ইলেকট্রো যৌবনা
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা
পাকুড় হত্যা মামলা
পয়েন্ট ব্ল্যাংক

স্মরণীয় বিচার

স্মরণীয় বিচার
স্মরণীয় বিচার
স্মরণীয় বিচার

॥ লাল সিং-এর বিচার ॥

প্রথম শিখযুদ্ধ শেষ হল। ইংরেজরা মহারাজা দলিপ সিং-এর সঙ্গে সন্ধি করলেন। এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল ৯ মার্চ ১৮৪৬ সালে যা ট্রিটি অফ লাহোর নামে ইতিহাসখ্যাত।

এই চুক্তি দ্বারা মহারাজা বিপাসা নদী থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চল এবং কাশ্মীর ও হাজারা সমেত সমস্ত ভূখণ্ড ইংরেজদের তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানিকে ছেড়ে দিলেন।

লাহোর সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য জম্মুর রাজা গুলাব সিং-এর অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার সেইসব পাহাড়ী ও অন্যান্য অঞ্চল যেগুলি নাকি পৃথক এক চুক্তি বলে মহারাজাকে দেওয়া হবে সেই সব অঞ্চলে মহারাজার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরে ১৬ মার্চ ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ও মহারাজা গুলাব সিং-এর মধ্যে ঐতিহাসিক অমৃতসর চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। যার দ্বারা সিন্ধুনদের পূর্বে ও রাপ্তি নদীর পশ্চিমে চম্বা সমেত কিন্তু লাহুল বাদে সমস্ত ভূখণ্ড যা নাকি ইংরেজরা লাহোর রাজ্যের কাছ থেকে পেয়েছিল তা মহারাজা গুলাব সিং-কে দিয়ে দেওয়া হল।

বিনিময়ে মহারাজাকে ইংরেজদের দিতে হবে মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ইংরেজ সরকারের গৌরব স্বীকার স্বরূপ ইংরেজদের বছরে একটি ঘোড়া,

লোমওয়ালা ও উৎকৃষ্ট ৬টি পুরুষ ছাগল ও ৬টি ছাগী এবং তিন জোড়া কাশ্মীরি শাল ইংরেজদের দিতে হবে।

সোজা কাথায় মহারাজা গুলাব সিং মাত্র এক দফায় ৭৫ লক্ষ টাকায় কাশ্মীর কিনে নিলেন। তিনি হলেন বংশপরম্পরায় কাশ্মীরের রাজা। কাশ্মীরের শেষ রাজা মহারাজা হরি সিং তাঁরই বংশধর ছিলেন।

গুলাব সিং সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের দখল পান নি। কাগজে কলমে দলিল সম্পাদন এক ব্যাপার এবং সম্পত্তির দখল নেওয়া আর এক ব্যাপার যদি নাকি সেই সম্পত্তিতে আর কেউ জমিয়ে বসে থাকে।

শিখশক্তি ১৮১৯ সালে কাশ্মীর দখল করেছিলেন এবং লাহোর কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা কাশ্মীর শাসন করতেন।

১৮৪৬ সালে কাশ্মীরের শাসনকর্তা ছিলেন শেখ ইমামুদ্দিন। লোকটির বুদ্ধি ছিল প্রখর, নানা বিদ্যায় পারদর্শী, শিক্ষিত, উচ্চাশা-সম্পন্ন। তা বলে তিনি যে সৎ ব্যক্তি ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হলেও কুট ছিলেন এবং নারী-লোলুপ ছিলেন।

বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতনে ইমামুদ্দিনকে গুলাব সিং কাশ্মীরের শাসনকর্তা রাখতে রাজি ছিলেন। তিনি সে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

ইমামুদ্দিন ভাবলেন শিখেরা তো কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাবে তবে আমি এই সুযোগে কাশ্মীরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এখানকার বাদশা হয়ে যাই না কেন?

গুলাব সিং-এর কাছ থেকে ইংরেজরা তো ৭৫ লক্ষ টাকা পেয়েই যাচ্ছেন অতএব ইংরেজদের ঘুষ দিয়ে আমি শেখ ইমামুদ্দিন কাশ্মীরের বাদশা বনতে অসুবিধে কোথায়?

এ কাজ তো একা করা যেতে পারে না। একজন সঙ্গী জুটল।

গুলাব সিং পাঞ্জাবী নন, ডোগরা। গুলাব সিং কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা হোক এটা লাহোর দরবারের মন্ত্রী রাজা লাল সিং-এর মনঃপুত ছিল না। একজন পাঞ্জাবীই যখন কাশ্মীরের রাজা হচ্ছে না তখন একজন মুসলমান সে রাজ্যের বাদশা হতে ক্ষতি কি?

রাজা লাল সিং ইমামুদ্দিনকে বুদ্ধি দিলেন তুমি গদি ছেড়ো না। কাশ্মীর হস্তান্তরে বাধা দাও, গুলাবকে দখল দিয়ো না।

ছ'মাস ধরে শলাপরামর্শ চলল এবং ইমামুদ্দিন তার বাহিনীকে প্রস্তুত রাখল। গুলাবকে কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ক্রমে ষড়যন্ত্র বেশ পেকে উঠল।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। ব্রিটিশরা গুলাব সি-এর পক্ষ সমর্থন করতে থাকল। ইমামুদ্দিনের কাছ থেকে আর এক দফা ঘুষের লোভ তারা সম্বরণ করেছিল।

কাশ্মীর নিয়ে তখন থেকেই গোলমাল।

ইংরেজরা গুলাব সিং-এর পক্ষ নিলেন, এই গোলমালের জন্যে লাহোর সরকারকে দায়ী করলেন এবং আদেশ করলেন সামরিক শক্তি দ্বারা গুলাব সিং-কে সাহায্য করত।

আদেশ জারী করে ইংরেজরা চুপ করে বসে রইল না। গুলাব তখন কাশ্মীর দখলের জন্যে অভিযান আরম্ভ করেছে। তার বাহিনীর পশ্চাদ্দিক রক্ষার জন্যে ইংরেজরা নিজেদের সৈন্য পাঠাল।

শেখ ইমামুদ্দিন বিপদ গুনল, বুঝল শিয়রে সংকট। এখন বুঝি সব যায়, এর চেয়ে আপাততঃ গুলাব সিং-এর লাখ টাকা মাইনের চাকরী ভাল ছিল।

ইমামুদ্দিনের একজন উকিল ছিল, সে বোধহয় তার মক্কেলের চেয়েও ধূর্ত। ইমামুদ্দিন সেই উকিলের শরণ নিল, বলল বাঁচাও, ধনে মানে তো যেতে বসেছি এখন বুঝি পৈত্রিক প্রাণটাই যায়।

উকিলের নাম লালা পূরণচাঁদ।

পূরণচাঁদ ধুর্ত, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। উত্তমরূপে সবদিক ভেবেও ভালমন্দ বিচার করে দেখল তারপর তার মক্কেল ইমামুদ্দিনকে বলল: যে বাঁচবার একটাই পথ আছে এবং সে পথ হল রাজা লাল সিংকে ফাসিয়ে দেওয়া।

এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ইমামুদ্দিন তখন ডুবতে বসেছে। হাতের কাছে কুটো পেলেও সেটাই ধরবে। ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায়

গুলাব সিং কদম কদম এগিয়ে আসছে।

ইমামুদ্দিন পুরণচাঁদকেই ভার দিলেন, যা পার তুমিই কর বাপু, আমার হাত-পা নড়ছে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট লেফটেনান্ট হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের সঙ্গে দেখা করল পুরণচাঁদ, হাতে একটা দরখাস্ত, দরখাস্তর মর্ম যেন বড়লাটকে এখনই জানিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? এডওয়ার্ডস জানতে চাইলেন।

ব্যাপার আবার কি? লাহোর দরবারের উজির রাজা লাল সিং আমার কর্তা কাশ্মীরের শাসনকর্তা শেখ ইমামুদ্দিনকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছেন।

এডওয়ার্ডস জিজ্ঞাসা করলেন: আরে আসল ব্যাপারটা কি খুলেই বল না, দরখাস্ত পরে পড়ব এখন।

পুরণচাঁদ বলল: আসল ব্যাপার হল এই যে লাল সিং আমার কর্তা কাশ্মীরের শাসনকর্তা ইমামুদ্দিনকে হুকুম করেছিলেন যে গুলাবকে কাশ্মীরে ঢুকতে দিয়ো না।

কি সব বাজে কথা বলছ, গর্জে ওঠেন পলিটিক্যাল এজেন্ট।

বাজে কথা নয় স্যার, আমাদের কাছে লাল সিং উজিরের নিজের হাতে সই করা চিঠি আছে, যথাসময়ে ও যথাস্থানে দেখাব। এডওয়ার্ডস এবার দরখাস্তখানা ভাল করে পড়লেন। জায়গায় জায়গায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিলেন, মারজিনে ছোট ছোট অক্ষরে কিসব নোট করলেন তারপর বললেন:

এই ষড়যন্ত্রে লাহোর দরবারের হাত আছে এবং লাল সি এই ব্যাপারে জড়িত আছে এমন কিছু যদি ইমামুদ্দিন প্রমাণ করতে পারে তাহলে তিনি ইমামুদ্দিনকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন এবং কাশ্মীরে ইমামুদ্দিনের যেসব সম্পত্তি আছে তাতে ব্রিটিশ সরকার যাতে হস্তক্ষেপ না করে সেদিকে দেখবেন।

আপাতত একটা ফয়সালা হল।

শেখ ইমামুদ্দিন তার অবরোধ তুলে নিয়ে রাজধানী শ্রীনগর থেকে

চল্লিশ মাইল মার্চ করে যেয়ে এডওয়ার্ডসের কাছে আত্মসমর্পণ করল আর ওদিকে মহারাজা গুলাব সিং ৯ নভেম্বর ১৮৪৬ তারিখে শ্রীনগরে সদলে প্রবেশ করলেন।

শেখ ইমামুদ্দিন এখন রাজসাক্ষী। লাল সিং-এর বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দেবে। বড়লাটের এজেন্ট হেনরি লরেন্সের কাছে শেখ তিন'খানা চিঠি পেশ করল। চিঠি তিন'খানা লাল সিং ইমামুদ্দিনকে লিখেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। চিঠিগুলি আসল বা সত্য হলে তার ফল হবে সাংঘাতিক ও সুদূরপ্রসারী।

ইমামুদ্দিনের দরখাস্ত, লাল সিং-এর তিনখানা চিঠি ও এজেন্টের মন্তব্য ইত্যাদি কলকাতায় বড়লাট লর্ড হার্ডিং-এর কাছে পেশ করা হল।

ব্যাপারটার কড়া তদন্ত হওয়া উচিত। ব্রিটিশ সরকার কাশ্মীর হস্তান্তরের একটা চুক্তি করলেন এবং সেই চুক্তি বানচাল করবার চেষ্টা মানে রাজদ্রোহীতার সমতুল্য। কোথাও একটা ঘোর ষড়যন্ত্র হয়েছে। ষড়যন্ত্রে কারা কার পক্ষ, লাল সিং-এর ভূমিকা কি? ইমামুদ্দিনেরই ভূমিকা কি? এসবের তদন্ত হওয়া দরকার।

সৎ ও বিচক্ষণ শাসক হিসেবে লর্ড হার্ডিং-এর সুনাম ছিল। তাঁর ওপর বিলেতের কর্তাদের বিশ্বাস ছিল এবং অনেক কাজ তিনি কলকাতায় তাঁর কাউনসিলের সঙ্গে পরামর্শ না করেই করতে পারতেন।

এই ব্যাপারটায় বড়লাট অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন। ভারত সরকারের ফরেন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি ফ্রেডরিক কারিকে তিনি পাঠালেন তলিয়ে তদন্ত করতে। তাঁকে সহায়তা করবে লেফটেনান্ট কর্নেল এইচ এম লরেন্স। লরেন্স তখন পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলিপ সিং-এর উপদেষ্টা।

ফ্রেডরিক কারিকে বড়লাট বলে দিলেন যে ইমামুদ্দিনের অভিযোগ যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে লাল সিংকে যেন পদচ্যুত

করা হয়। নাবালক মহারাজ দলিপ সিং-এর দায়িত্ব এমন লোকের হাতে দেওয়া যায় না, যাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ক্ষতি। লাল সিং যদি অন্যায় কিছু করে থাকে তাহলে তাকে তার ফলভোগ করতে হবে।

এই তদন্ত বলতে গেলে লাল সিং-এর বিচার এবং সেই সঙ্গে লাহোর দরবারেরও। লাহোর দরবার সম্বন্ধে নানারকম সত্য মিথ্যা দুর্নীতির কথা শোনা যাচ্ছিল। রঙেরসে পরিপূর্ণ নানারকম কাহিনী।

তবে কোনো ব্যক্তিবিশেষের অপরাধের জন্যে লাহোর দরবারকে দায়ী করা বা কৈফিয়ত দাবি করার উদ্দেশ্য ইংরেজ সরকারের ছিল না।

দোষী সাব্যস্ত হলেও লাল সিংকে সরানো কঠিন ছিল কারণ লাল সিংকে সব ব্যাপারে সমর্থন করত মহারাজা রণজিৎ সিং-এর বিধবা জিন্দন বাই, নাবালক রাজা দলিপের মা। লাল সিং-এর প্রতি জিন্দন বাই-এর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। দুজনের মধ্যে নাকি প্রণয় ছিল।

যাইহক লাল সিং-এর ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার জন্য ফ্রেডরিক কারি লাহোরে এসে পৌছলেন।

একটা কোর্ট অফ ইনকুয়ারি গঠিত হল। কারি ছাড়া অন্যান্য সদস্যরা হলেন গভরনর জেনারেলের এজেণ্ট এইচ এম লরেন্স, লাহোর গ্যারিসনের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল স্যার জন লিটলার, জলন্ধরের কমিশনার জন লরেন্স এবং টুয়েলভথ নেটিভ ইনফ্যানট্রির কমাণ্ডার লেফটেনাণ্ট কর্নেল অ্যাণ্ড্রি গোলডি।

৩ ডিসেম্বর ১৮৪৬ তারিখে প্রথম অধিবেশন বসল। অধিবেশনে উপরোক্ত সভ্যগণ ব্যতীত অবশ্যই হাজির ছিলেন লাল সিং এবং দেওয়ান দীননাথ, সর্দার তেজ সিং, খলিফা নুরুদ্দিন, সর্দার আত্তর সিং কালেনওয়ালা, সর্দার সের সিং আত্তরিওয়ালা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সর্দারগণ।

নিজের কর্মচারীগণসহ শেখ ইমামুদ্দিন অবশ্যই হাজির ছিলেন।

তিনি তো থাকবেনই, তাঁকে নিয়েই তো বিচার, তাঁর জন্যেই তো এই কোর্ট অফ ইনকুয়ারি বসেছে।

প্রথমে সাক্ষ্য দিল শেখ ইমামুদ্দিন। সে বলল : লাল সিং-এর কাছ থেকে সে তিনখানা চিঠি পেয়েছিল, সে যা কিছু করেছে তা ঐ চিঠির প্ররোচনাতেই করেছে, সে আদেশ মেনেছে মাত্র। তিন'খানা চিঠি সে আগেই ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করেছে।

লাল সিং-এর লেখা প্রথম চিঠির তারিখ ২৫ জুলাই ১৮৪৬। চিঠি ঠিক নয়, সৈন্যদের জন্য আদেশ বলা যেতে পারে। তাতে লেখা ছিল কাশ্মীরের সৈন্যগণ, যেন শাসনকর্তা শেখ ইমামুদ্দিনের প্রতি অনুগত থাকে এবং সর্বদা তাঁরই আদেশ পালন করে। শেখ সাহেব যখন এখানে ফিরে আসবেন তখন তারাও যেন ফিরে আসে। তাদের চাকরী বজায় থাকবে।

উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে লাহোর ও অমৃতসর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং কাশ্মীরে অবস্থিত সৈন্যদের আদেশ করার ক্ষমতা লাল-সিং-এর থাকা উচিত নয়। তবে তখনও হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয় নি অতএব দুই দেশের মধ্যে যেসব কাজ বাকি ছিল সে সম্বন্ধে হয় তো আলাপ আলোচনা চলছিল। তাই লাল সিং এর এই পরোয়ানা।

এই চিঠির তারিখ ২৫ জুলাই। পরের চিঠির তারিখ ২৬ জুলাই এই দ্বিতীয় চিঠিতে বলা হয়েছে শেখ ইমামুদ্দিন যেন লাহোর দরবারের প্রতি অনুগত থাকে।

প্রথম চিঠিখানির লেখক হল মুনশি রতনচাঁদ আর পরের চিঠি দু'খানির লেখক হল পুরণচাঁদ। পরের চিঠি দু'খানাই লাল সিং অস্বীকার করে বলে এ চিঠি দু'খানাই জাল, এই চিঠি সে কাউকে পাঠায় নি।

লাহোর দরবারের পক্ষ থেকে ইমামুদ্দিনকে দেওয়ান দীননাথ কয়েকটা প্রশ্ন করেন :

প্রশ্ন : লাহোর থেকে শ্রীনগরে আপনার কাছে যে সমস্ত চিঠি যেত সবই রতনচাঁদের লেখা কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনি পুরনচাঁদের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি দেখে আপনার কি কোনো সন্দেহ

হয় নি ?

উত্তর : সন্দেহ কেন হবে ? পূরনচাঁদের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি আমি তো লাহোর থেকে আগেও পেয়েছি।

প্রশ্ন : পূরনচাঁদের লেখা কোনো চিঠি আপনি দেখাতে পারেন ?

উত্তর : এখন আমার সঙ্গে নেই তবে হাতের লেখা যাচাই করবার জন্যে দু'খানা চিঠি আমি থানা শহরে কর্নেল লরেন্সকে দেখিয়েছি।

প্রশ্ন : এই বিশেষ ব্যাপারে পূরনচাঁদের হাতে লেখা আর কোনো চিঠি কি আপনার কাছে আছে ?

উত্তর : না, আমি সেসব নষ্ট করে ফেলেছি।

পরের সাক্ষী মুনশি রতনচাঁদ। রতনচাঁদ স্বীকার করল যে ২৫ জুলাই তারিখের আদেশপত্র তারই হাতে লেখা এবং নীচে উজির লাল সিং দস্তখত দিয়েছিলেন।

লাহোর দরবারের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন দেওয়ান হাকিম রায়। তিনি বললেন কাশ্মীরে অবস্থিত সৈন্য সম্বন্ধে রাজার আদেশ অন্যরকম ছিল অর্থাৎ লাল সিং-এর পরোয়ানার বিরুদ্ধেই তিনি বললেন তবে তিনি বলেছিলেন যে রাজার আদেশ মৌখিক ছিল এবং কোনো প্রমাণ তাঁর হাতে নেই।

অবশেষে লাল সিংকে ডাকা হল এবং কৈফিয়ত চাওয়া হল। প্রথম চিঠিখানা লাল সিং স্বীকার করেছিল তাই তাকে প্রশ্ন করা হল।

প্রশ্ন : আপনি সৈন্যদের প্রতি আপনার পরোয়ানাতে বলেছিলেন যে সৈন্যরা যেন শেখ সাহেবের প্রতি অনুগত থাকে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং সৈন্যরা যখন শেখের আদেশ অনুসারে গুলাব সিং-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো তখন আপনি আর একখানা পরোয়ানা জারি করে বললেন না কেন যে শেখের আদেশ পালন করা নয় যে গুলাব সিং-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা

উত্তর : না, আমি তা করি নি।

পরদিন আবার আদালত বসল। দেওয়ান দীননাথ আবার সাক্ষ্য দিলেন। তিনি বললেন : এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাজদরবার থেকে

জরুরী হলেও সেই চিঠি পুরনচাঁদকে দিয়ে লেখানো হবে এটা বিশ্বাস করা যায় না। শেখ ইমামুদ্দিন যা কিছু করেছেন তা নিজের ইচ্ছা ও দায়িত্ব অনুযায়ীই করেছেন।

ইমামুদ্দিনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হল এবং পুরনচাঁদের হস্তলিখিত ও ইমামুদ্দিনকে লেখা একখানি কাগজ আদালতে দাখিল করা হল ও আবার বলা হল যে অনুরূপ দু'খানি চিঠি আগেই থানা শহরে কর্নেল লরেন্সকে দেখানো হয়েছে।

সেই কাগজ লাল সিংকে দেখানো হলে তিনি সেখানি আসল বলে স্বীকার করলেন।

এইভাবেই একদিন আদালতের তদন্ত কাজ শেষ হল। কারি সাহেব ও অন্যান্য সভাগণ আদালতের সিদ্ধান্ত শোনাবার জন্যে মন্ত্রী ও প্রধান সদারদের তাঁদের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন কিন্তু লাল সিং বা শেখ ইমামুদ্দিনকে ডাকা হল না।

কারি সাহেব বললেন যে পুরনচাঁদের হস্তাক্ষরে লেখা এবং লাল সিং-এর স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি দু'খানি সন্দেহ করবার কারণ নেই যদিও আইনতঃ চিঠি দু'খানি প্রমাণ করা কঠিন।

অতএব চিঠি দু'খানি যে অবৈধ তা এইখানেই তো স্বীকার করে নেওয়া হল এবং সমস্ত বিচারটাই যে একটা প্রহসন মাত্র তাও বলে দিতে হয় না।

প্রমাণ না থাকলেও দেওয়ান হুকুম রায়ের সাক্ষ্য বিশ্বাস করে কারি সাহেব তাঁর রায় দিয়েছিলেন। গোপন নির্দেশ দিয়ে রাজ দরবার থেকে দেওয়ান হুকুম রায়কে নাকি শ্রীনগরে ইমামুদ্দিনের কাছে পাঠান হয়েছিল। শেখ যেন গুলাবকে বাধা দেয়। এই ছিল গোপন নির্দেশ।

বলা বাহুল্য যে লাল সিং দোষী সাব্যস্ত হল কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। সর্দাররাও কোনো মন্তব্য করলেন না এমন কি দেওয়ান দীননাথ ও চুপ করে রইলেন।

প্রতিবাদ করেছিল মাত্র একজন, রাজমাতা জিন্দন বাই। এমন কি লাল সিং-এর মুক্তির জন্যে তিনি ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে আবেদন করেছিলেন।

লাল সিং-কে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হল। তিনি ফিরোজপুর হয়ে আগ্রা গেলেন। সেখানেই ছিলেন। লাহোর দরবার থেকে তাঁকে মাসে ২০০০ টাকা পেনসন দেওয়া হত।

॥ বাহাদুর শা-এর বিচার ॥

পুরো নাম আবদুল জাফর সিরাজ-উদ-দিন মহম্মদ বাহাদুর শাহ। ইতিহাসের পাতায় তিনি শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শা নামে পরিচিত কিন্তু তিনি নিজেকে কবি বাহাদুর শা জাফর নামে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন।

বাহাদুর শা যখন মোগল মসনদ লাভ করলেন তখন মসনদের কোনো জৌলুস তো ছিলই না বলতে কি মোগল সাম্রাজ্যই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

অতএব আকবর শায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শা ৬২ বৎসর বয়সে উপাধিটুকুই সার করে সিংহাসনে উঠলেন মাত্র। বাহাদুর শায়ের কর্তৃত্ব আবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র তাঁর প্রাসাদের মধ্যে। অবশিষ্ট জমিদারি থেকে বার্ষিক মাত্র দেড় লক্ষ টাকা আয় ছিল, দিল্লির বাড়িগুলি থেকে কিছু ভাড়া পেতেন আর ইংরেজ সরকার তাঁকে মাসিক এক

লক্ষ টাকা পেনসন।

সম্রাট বাহাদুর যদিও ইংরেজদের বিচারালয়ের আওতার বাইরে ছিলেন তথাপি তাঁর গতিবিধি সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে দেশে উর্দু কবিতা ও শের লেখার একটা জোয়ার এসেছিল। বাহাদুর শা নিজেও কবিতা ও শের লিখতে সুরু করেন। যদিও তিনি উচ্চস্তরের কবি ছিলেন না কিন্তু হেলাফেলা করবার মতও কাব্য রচনা করেন নি। উল্লেখযোগ্য যে মির্জা গালিবের কাব্যের প্রথম বই ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরেজদের কাছে বাহাদুর শা একটা নিবেদন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিরজা জওয়ান বখত-কে যেন মোগল সম্রাটরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উত্তরে ইংরেজ সরকার বলেছিল : আমরা তোমার পেনসনের পরিমাণ কমিয়ে দোব কিনা ভাবছি। তুমি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমার বংশের ইতি ঘোষণা করে দেব।

বাহাদুর শা মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু করবেনই বা কি। তিনি তখন ঢাল-তলোয়ার বিহীন নিধিরাম সর্দার। তাই মিরাটে ১০ মে ১৮৫৭ তারিখে যখন সিপাইরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল তখন ইংরেজদের মতোই তিনিও কম বিস্মিত হন নি।

মনে মনে হয়তো আশা পোষণ করছিলেন যে বিদ্রোহীরা জয়ী হক, তিনি মসনদের গৌরব লাভ করবেন।

পরদিনই অর্থাৎ ১১ মে তারিখে বিদ্রোহীরা তাঁর প্রাসাদে এসে হাজির এবং বাহাদুর শাকে বললেন নেতৃত্ব নিতে। বাহাদুর প্রথমে রাজি হন নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি হতে হয়েছিল।

তখন তাঁর বয়স ৮১, দৈহিক বা মানসিক কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই। বিদ্রোহীরা তাঁকে হিন্দুস্তানের সম্রাটরূপে ঘোষণা করল। বিদ্রোহীরা যেন একটা স্বীকৃতি অর্জন করল, তারা তাদের সম্রাটের জন্যে যুদ্ধ করছে।

কিন্তু বাহাদুর শুধু নামেই রইলেন। কোনো বিষয়েই তাঁর মতামত

বা অনুমতি নেওয়া হয় নি।
তিনিও যা, একটা পুতুলও তাই।
বিদ্রোহীরা কেবলমাত্র সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করত।
ইংরেজরা ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে নি। দেখতে পারেও না। তারা সর্বত্রই শুনল সিপাহিদের নেতা সম্রাট বাহাদুর শা।

তিন মাস ধরে প্রস্তুতির পর ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লি পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজ সৈন্য দিল্লি আক্রমণ করল এবং ২০ সেপ্টেম্বর সম্রাটের প্রাসাদ তাদের হাতে এসে গেল।
বাহাদুর শা তখন শহরের প্রান্তে তাঁর পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন। ২১ সেপ্টেম্বর তিনি ইনটেলিজেন্স প্রধান ক্যাপ্টেন হডসনের কাছে এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন যে তাঁকে তাঁর বেগম জিনত মহলকে এবং তাঁদের পুত্র ও পৌত্রদের হত্যা করা হবে না।
সম্রাটের জীবন ব্যতীত আর কারও জীবন সম্বন্ধে হডসন নাকি প্রতিশ্রুতি দেয় নি তবুও হডসন বাহাদুর শায়ের দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকে দিল্লি গেটের কাছে নিজে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।
এজন্যে হডসনকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং হডসন নিজেও লখনৌয়ে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিল। তাই সমালোচনার উত্তরে তাঁর বক্তব্য শোনা যায় নি।
বাহাদুর শাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও রাজদ্রোহীতার অপরাধে তার বিচার করা সাব্যস্ত হল। বিচার অবিশ্যি শেষপর্যন্ত একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল।
দিল্লি ডিভিসনের ডেপুটি জজ-অ্যাডভোকেট সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি কর্তাদের অনুমতি না নিয়েই সংবাপত্রে প্রকাশ করতে দেন। কর্তারা এজন্যে চটে গিয়েছিলেন কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

যাইহক সম্রাটের বিচারের জন্যে একটা মিলিটারি কমিশন নিযুক্ত করা হল। দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লায় দিওয়ান-ই খাস ভবনে ২৭ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে সম্রাট বাহাদুর শা'য়ের বিচার আরম্ভ হয়। বিচার চলেছিল ২১ দিন।

তখনকার পরিস্থিতিতে সম্রাট সুবিচার আশা করেন নি এবং সে ইচ্ছেও ইংরেজদের ছিলও না। বিচারে সম্রাট দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল।

সেই বছরেই অক্টোবর মাসে তাঁকে কলকাতায় আনা হল এবং পরে রেঙ্গুনে পাঠান হল। সঙ্গে গেল বেগম ও একমাত্র জীবিত পুত্র। ১৮৬২ সালে ৭ নভেম্বর ৮৭ বছর বয়সে রেঙ্গুনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চল্লিশ বছর পরে বাহাদুর শায়ের বিচারের বিবৃতি সরকারী ব্লু বুক মারফত প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ব্লু বুকেরই একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করেন পাঞ্জাব সরকারের নথিপত্রের রক্ষক এইচ এল ও গ্যারেট। এই দীর্ঘদিন পরেও বাহাদুর শায়ের প্রতি ইংরেজরা তাদের ঘৃণা ভুলতে পারে নি।

সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল চারটি কিন্তু অভিযোগগুলি প্রমাণ করবার জন্যে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। লোক দেখানো বিচারের প্রয়োজন ছিল তাই এই অভিনয়। মূল অভিযোগ ছিল চারটি। ভরতে ব্রিটিশ সরকারের পেনসনভোগী বাহাদুর শা ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পনির আরটিলারি রেজিমেন্টের সুবেদার মহম্মদ বখত খাঁকে এবং অন্যান্য সৈনিককে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এটি হল প্রথম অভিযোগ।

দ্বিতীয় অভিযোগ হল সম্রাট তাঁর পুত্র মির্জা মোগলকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিলেন।

তৃতীয় অভিযোগঃ তিনি নিজেকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং বে-আইনীভাবে দিল্লি নগর দখল করে রেখেছিলেন।

চতুর্থ অভিযোগ হল যে প্রাসাদের সীমানার মধ্যে তিনি ৪৯ জন ইয়োরোপীয়কে যাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক তাদের এবং

অন্যান্য ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ১৬ মে তারিখে হত্যার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী।

বাহাদুর শা অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে জজ-অ্যাডভোকেট যা বললে তা বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছু নয়। তিনি বললেনঃ এই মামলা আর অগ্রসর হবার আগে বলে দেওয়া ভাল যে আপনার বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করা হবে তাদ্বারা হয়তো অভিযোগগুলি সরাসরি খণ্ডন করা নাও যেতে পারে।

এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা বিবৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কি? সম্রাটকে হত্যা করা হবে না এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং মামলা কঠোরভাবে অনুসরণ করলে হয়তো তাঁকে প্রাণদণ্ড দিতেই হত এই জন্যেই কি সরকার তখন সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করলেন না? নাকি তখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসার জন্যে সাক্ষ্য প্রমাণগুলি উপস্থিত করা যায় নি।

সরকার পক্ষ অনেক দলিল দস্তাবেজ দাখিল করেছিল। এর মধ্যে এমন কিছু দলিল ছিল যার সঙ্গে মূল মামলার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।

সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য লাইসেনসের নিমিত্ত একটি আবেদন পাওয়া যায়। আবেদনের তারিখ ছিল ২৪ জুন ১৮৫৭। আবেদন-কারীর নাম জুম্মা-উদ-দিন খান। তাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছিল কিন্তু তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে সে যেন কোনো মিথ্যা খবর না ছাপে, কোনো ব্যক্তির চরিত্রে যেন কটাক্ষপাত করা না হয়।

বিচারের দ্বিতীয় দিনে সম্রাটের পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন গোলাম আব্বাস আদালতে হাজির হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাক্ষী হতে বলা হল। এমন ঘটনা অভূতপূর্ব। তার সাক্ষ্য শেষ হলেই তাকে আবার ওকালতী করতে অনুমতি দেওয়া হল।

অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে সম্রাটের চিকিৎসক আসানুল্লা খাঁ এবং তাঁর

প্রাক্তন মুনসি এবং জনৈক মুকুন্দলালকেও ডাকা হয়েছিল।

অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে বাহাদুর শা লিখিত জবাব পেশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

বিদ্রোহ ঘোষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। সকাল আটটা আন্দাজ সময়ে একদল বিদ্রোহী এসে আমার প্রাসাদের জানালার নীচে সোরগোল তোলে। তারা বলতে থাকে যে মীরাটে সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করে তারা দিল্লিতে এসেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্মবিরোধী গোরু ও শূকর চর্বি মিশ্রিত টোটা দাঁত দিয়ে কাটবার জন্যে তাদের বাধ্য করা হচ্ছিল বলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

প্রাসাদের জানালার নিচে যে-সমস্ত ফটক আছে আমি সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করতে বলে প্যালেস গার্ডদের কমাণ্ডান্টকে খবর পাঠাই।

খবর পেয়ে কমাণ্ডান্ট নিজেই এসে পড়েন এবং আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি গেট খুলে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি তাঁকে নিরস্ত হতে বললাম কিন্তু তিনি শুনলেন না। তিনি চলে গেলেন এবং থামের কাছে দাঁড়িয়ে কিছু বলে ফিরে এসে আমাকে বললেন যে তিনি শীগগির বিদ্রোহীদের সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন।

অল্পক্ষণ পরে মিঃ ফ্রেজার আমার কাছে দু'টি কামান চেয়ে একটি চিরকুট পাঠালেন এবং কমাণ্ডান্ট দু'টি পালকি চেয়ে আর একটি চিরকুট পাঠালেন।

কমাণ্ডান্ট অনুরোধ করেছেন যে দু'জন মহিলা তাঁর কাছে আছেন। তাঁদের নিরাপদে রাখবার জন্যে মহিলা দু'জনকে তিনি আমার অন্দরমহলে রাখতে চান। আমি রাজি ছিলুম, পালকি পাঠিয়েছিলুমও কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মিঃ ফ্রেজার, কমাণ্ডান্ট এবং দু'জন মহিলাও নিহত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বিদ্রোহীরা প্রাসাদে ঢুকে পড়ে এবং আমাকে ঘিরে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য কি আমি জিজ্ঞাসা করি এবং তাদের চলে যেতে অনুরোধ করি। তারা আমাকে চুপ করে থাকতে বলে। আমি ভয় পাই এবং আমার নিজস্ব ঘরে চলে যাই।

নির্বিচার হত্যাকাণ্ড থেকে তিনি তাঁদের বিরত হতে বলেন কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে নি কারণ এই হত্যাকাণ্ডও তারা সম্রাটের নামে চালাচ্ছিল। তিনি আরও লিখেছেন ঃ

মির্জা মোগল, মির্জা খিজির সুলতান, মির্জা আবু বকর এবং বসন্ত নামে আমার একজন ভৃত্য আমার অজানতে ও বিনা অনুমতিতে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেছিল এবং আমার নাম ব্যবহার করছিল। আমাকে কিছু জানানও হত না।

তারা অনেক রকম কাগজপত্র এনে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিত ও আমার মোহরের ছাপ দিতে আমাকে বাধ্য করত। যার যা ইচ্ছে সে তাই করত। আমি কিছুই জানি না। আমি তাদের হাতে একরকম বন্দী হয়েই ছিলুম।

বিচারক স্বীকার করেছেন যে সিপাই বিদ্রোহ নামে আন্দোলন ধর্মীয় কারণে শুধু বিদ্রোহ নয়, এই বিদ্রোহ হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত করেছিল এবং তারা ক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই বিদ্রোহ ইতিহাসে

তুলনারহিত।

বিচারের কোন রায় দেওয়া হয় নি। রায় দেবার কিই বাছিল ? যা করা হবে তাতো ইংরেজ সরকারের আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। সরকারিভাবে রায় না দিয়ে ভালোই করেছে।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এইট্টিন ফিফটি সেভেন নামে যে বই লিখেছেন তার ভূমিকায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন ঃ বাহাদুর শা-এর প্রতি যে আনুগত্য তখনকার জনসাধারণ দেখিয়েছিল তা ব্যক্তিগতভাবে বাহাদুর শাকে নয় পরন্তু বলা যেতে পারে এই

আনুগত্য ছিল মোগল বাদশাদের বংশধরদের প্রতি। ভারতীয় জনগণের ওপর মোগল বাদশারা এমনই এক প্রভাব বিস্তার করেছিল যে যখন প্রশ্ন উঠেছিল ব্রিটিশদের কাছ থেকে কে ক্ষমতা গ্রহণ করবে তখন হিন্দু ও মুসলমানেরা, একবাক্যে বাহাদুর শা-এর নাম উচ্চারণ করেছিল। দুঃখের বিষয় যে বাহাদুর শা-এর সে যোগ্যতা ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শা-এর ভূমিকা সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, যে কৃতিত্ব বাহাদুর শাকে দেওয়া হয় সে কৃতিত্ব বাহাদুর শা এর প্রাপ্য নয়। তিনি নাকি ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

বেচারী বাহাদুর শা! রেঙ্গুনে নির্বাসিত থাকবার সময় আক্ষেপ করে একটি শের রচনা করেছিলেন। জাফর কি হতভাগ্য, যে দেশে জন্ম হল সেই দেশে কবরের জন্যে তাঁর দু গজ জমিও জুটল না। বাহাদুর শা জাফর লিখেছিলেন—

গনীমৎ হ্যায় মিল জায়ে
ম-দফন কো মেরে
অগর ইস গলীমেঁ জমী
আয়সী ঐসী।

আমার কবরের জন্য যদি এখানে ওখানে যেমন তেমন একটু জমিও পাই তবে তাই আমি যথেষ্ট মনে করব।

আলিপুর বোমা মামলা ॥

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আলিপুর বোমা মামলা নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই বিচারের ফলেই দেশবাসী প্রথম জানল যে একদল যুবকের নিবেদিত প্রাণ দেশকে স্বাধীন করবার ব্রত নিয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাশ সৃষ্টির পথ বেছে নিয়েছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় সন্ত্রাশবাদীদের জন্ম। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে সারা দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল যা স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাতিলাভ করেছে।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে বাংলাকে ভাগ করলেও সুচতুর ইংরেজ সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। দেশব্যাপী আন্দোলন ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেও ইংরেজ যখন বাংলা ভাগ করল তখন ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট তারিখ থেকে বিলাতী সামগ্রী বয়কট অর্থাৎ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বাংলার গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ল। নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমশঃ অবনতি ঘটতে থাকল।

দেশবাসীরা ইংরেজদের আর বিশ্বাস করতে রাজি নয়। আন্দোলন ভাঙবার জন্যে ইংরেজ অর্ডিনান্স জারি করতে লাগল একের পর এক। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ চলতে থাকল, সভাসমিতি বন্ধ করে দেওয়া হল। রাজদ্রোহিতার অপরাধে কত নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল এবং ১৮১৮ সালের রেগুলেশন তিন আইন বলে অনেক নেতাকে বর্মায়

নির্বাসন দেওয়া হল।

এই আন্দোলনের তলে তলে সেই যুবকদল ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে সাংবিধানিক পথে ইংরেজ এ দেশ ছাড়বে না, বোমা পিস্তল দ্বারা সন্ত্রাশ সৃষ্টি করে তাদের তাড়াতে হবে।

তারা সতর্কতার সঙ্গে আন্দোলনে নেমে পড়ল। দলগঠন ও প্রচারের জন্যে বেছে বেছে যুবক সংগ্রহ করতে লাগল এবং দেশের নরনারীর মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলবার জন্যে ও প্রত্যক্ষ ভাবে উত্তেজিত করার জন্যে সংবাদপত্র যথা যুগান্তর ও সন্ধ্যা প্রকাশিত হতে থাকল।

১৯০৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদায় অধ্যাপনা করছিলেন। বাংলার আন্দোলন লক্ষ করে তিনি সেই সুযোগে বিপ্লবী সাংগঠনিক কাজের জন্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন, সঙ্গে দিলেন তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে যিনি তাঁর কাছে থাকতেন। তিনি এই সময়ে বাংলায় এলেন এবং প্রচার করতে সুরু করলেন যে ইংরেজ বিতাড়নের পথ আলাপ আলোচনা নয়, প্রহার না দিলে ওরা এ দেশ ছাড়বে না।

কিন্তু বারীন্দ্র পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আবার বরোদায় ফিরে গেলেন। দেশে ফিরেছিলেন দু বছর পরে।

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে বাংলাকে ভাগ করা হল। রাজসাহী, ও ঢাকা চট্টগ্রাম বিভাগ আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। সারা দেশে স্বদেশীর দীক্ষা নেওয়া হয়েছে, বিলিতি দ্রব্য বিশেষ করে বিলিতি বস্ত্র বয়কটের আন্দোলন ও বিলিতি দ্রব্য ক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং চলছে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যার সম্বন্ধে প্রথিতযশা সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছিলেন বাংলা দেশে বাঙালী জন্মায় মানুষ জন্মায় না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বাঙালী ছিলেন এবং মানুষ ছিলেন, তিনি ১৯০৪ সালে প্রকাশ করেন সন্ধ্যা সংবাদপত্র। সন্ধ্যার সুচিন্তিত ও কুশাসনের

বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি দেশবাসীকে বিশেষ করে যুবকদের রক্তস্রোত চঞ্চল করে তুলল।

পঞ্চাশ বছর পরে দেশ আবার জেগে উঠেছে। লোকে বুঝতে পেরেছে ইংরেজ আমাদের ভাল করতে আসে নি, তারা এসেছে ভারতবাসীদের পঙ্গু করে দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে। উপনিবেশ স্থাপন করে কায়েমী হয়ে গেড়ে বসতে। কার্জন বাংলা ভাগ না করলে এই সময়ে আন্দোলন সম্ভবত আরম্ভ হত না।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বরোদা থেকে ফিরে এলেন। তিনি প্রথম থেকে ছাত্রদের বেছে নিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেলালে ছাত্রদের সহজে প্রভাবিত করা যায়। তিনি তাঁদের পড়াতে লাগলেন অন্য দেশের বিপ্লব ও সন্ত্রাশের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে পড়াতে লাগলেন গীতা এবং উপনিষদ।

বারীন্দ্র যে দল গঠন করেছিলেন সেই দল থেকে প্রকাশিত হল 'মুক্তি কোন পথে' এবং ১৯০৬ সালের ১৫ মার্চ থেকে যুগান্তর দৈনিক (বর্তমানের যুগান্তর নয়)। পরে যোগ দিয়েছিল ১৯০৭ সালের ২০ মে তারিখ থেকে প্রকাশিত নবশক্তি। দেশের লোককে জাগিয়ে তুলতে এদের অবদান অনস্বীকার্য তবে যা কিছু লেখা হত অনেকটা আইন বাঁচিয়ে, কারণ সোজাসুজি কিছু লিখলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কাগজ বন্ধ করে দেবার আশংকা আছে এবং কাগজ বন্ধ হয়ে গেলে প্রেরণার উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।

আরও একটি সহায়ক ছিল ছাত্রভাণ্ডার নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। জিনিস কেনাবেচার মাধ্যমে স্বদেশী প্রচার চালানো হত এই ভাণ্ডারের মাধ্যমে।

বিপ্লব আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে যারা বারীন্দ্রের হাত মজবুত করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত এবং অন্যান্যরা।

সন্ত্রাশবাদীরা কাজ আরম্ভ করে দিলেন কিন্তু প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৯০৭ সালের অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে বাংলার

ছোটলাট স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের গাড়ি উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে চন্দনগরে রেল লাইনের ওপর বোমা রাখা হয়েছিল।' সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

আর একবার ডিসেম্বর মাসে একই উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড়েও রেললাইনের তলায় বোমা রাখা হয়েছিল। সেবারও অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার বেঁচে গেলেন। ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের প্রাণনাশের চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

নারায়ণগড় ট্রেন রেকিং কেস বা নারায়ণগড় ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টার জন্য কয়েকজন সাধারণ কুলিকে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করা হয় কিন্তু সি, আই, ডি, একটা সূত্র পেয়ে যায়। তারা জানতে পারে যে লাটসাহেব ও অন্যান্যদের এই প্রাণনাশের চেষ্টা একই দলের কাজ এবং তাদের প্রধান আড্ডা হল কলকাতা।

এই দলের সমস্ত কার্যাবলী প্রকাশ হয়ে পড়ে মজঃফরপুরে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে ঐতিহাসিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে।

কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিংসফোর্ড। কিংসফোর্ড অনেকগুলি রাজনৈতিক মামলার বিচার করেছিল এবং কয়েকজন যুবককে অন্যায় ও কঠোর দণ্ড দিয়েছিল। বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডকে ভাল চোখে দেখে নি। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর।

কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরে বোধহয় কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি করে দিল। তাদের অনুমান বিপ্লবী হাত এতদূর পৌঁছবে না।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে পাঠান হল। ঠিক ছিল যে, রাত্রে ক্লাব থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কিংসফোর্ড যখন ফিরবে তখন সেই গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করা হবে।

বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিলও কিন্তু গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিল না, ছিল

জনৈক মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা। রাত্রের অন্ধকারে গাড়ি বা ভেতরের আরোহীদের চিনতে ভুল হয়েছিল।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে ও ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাটে আত্মহত্যা করে।

মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ কলকাতার পুলিসকে সচকিত করে তুলল। সারা শহর তারা তোলপাড় করল। তাদের নজর পড়ল মানিকতলায় ৩২ মুরারিপুকুর রোডে, ৪৮ গ্রে স্ট্রীটে, ৩৫ গোপীমোহন দত্ত লেন, ৩০।৪ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট এবং ১৩৪ হ্যারিসন রোডে।

মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িটি করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রের পিতা ডাক্তার কে, ডি. ঘোষ। অতএব শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ৩২ মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন।

এই সকল স্থান সার্চ করে পুলিস বেশ কিছু বোমা রাইফেল, বন্দুক, রিভলবার, পিস্তল, বিস্ফোরক-পদার্থ ও আপত্তিজনক বই উদ্ধার করেছিল। পুলিস চৌদ্দ জনকে গ্রেফতার করেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ।

এল, বিরলে নামে একজন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যুবকদের হাজির করা হল। কয়েকজন যুবক বিবৃতি দিলেন এবং স্বীকারোক্তিও করলেন। ২২২ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। বিরলে সাহেব ১৯০৮ সালের ১৯ আগস্ট তারিখে মামলা আলিপুরে দায়রা সোপর্দ করলেন।

ইতিমধ্যে আলিপুরে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হল, কয়েক-জনকে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত করা হল, ৫৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হল এবং তাদেরও আলিপুরে দায়রা সোপর্দ করা হল। তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর।

আলিপুর বোমা মামলা ও মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে দুটি মামলা সরকার দায়ের করলেন এবং দুই মামলারই আসামীদের

বিচার সুরু হল। প্রথম মামলার আসামী সংখ্যা ৯ জন এবং দ্বিতীয় মামলার আসামী সংখ্যা ৩১ জন। ইনকুয়ারি করতে সময় লাগল ৭৬ দিন। রাজসাক্ষী হওয়ার জন্যে অপরাধ আইনের ৩৩৭ ধারা বলে নরেন গোঁসাইকে মাফ করা হল। তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও পুলিশ হেফাজতে রাখা হল।

এই ঐতিহাসিক মামলা শুরু হয় ১৯ অক্টোবর ১৯০৮ তারিখে, শুনানী চলেছিল পরের বছর ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত। ২০৯ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল। জুরিরা তাদের সিদ্ধান্ত জানায় ১৪ এপ্রিল তারিখে আর ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন ৬ মে।

এই ঐতিহাসিক মামলার বিচারক ছিল আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ সি পি বিচক্রফট আই, সি, এস।

এই বিচক্রফট এবং শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র ছিলেন, দু জনেই ছিলেন সহপাঠি এবং দু জনে একই সঙ্গে আই, সি, এস, পরীক্ষা দিয়েছিলেন। গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ বিচক্রফট অপেক্ষা বেশি নম্বর পেয়েছিলেন।

আজ একজন বিচারকের আসনে অপরজন আসামীর কাঠগড়ায়। বিচার যখন চলছে তখন কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তর গুলিতে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই নিহত হল।

নরেন তখন ছিল জেল হাসপাতালে। সত্যেন এবং কানাই পীড়ার ভান করল এবং তারা বলল যে নরেনের মতো তারাও রাজসাক্ষী হতে চায়। পীড়ার জন্যে তো বটেই এবং এ বিষয়ে নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে তাদের জেল হাসপাতালে পাঠান হক। জেল হাসপাতালে ঢুকেই ওরা দুজনে নরেনকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। কানাই ও সত্যেন দুজনেরই ফাঁসি হয়।

পুলিস অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জি যে নাকি মোকামাঘাট রেল স্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল কিন্তু তার সামনেই প্রফুল্ল আত্মহত্যা করায় নন্দলাল ব্যর্থ হয়েছিল সেই নন্দলালকে কে বা কারা

হত্যা করে।

মোকামাঘাটে প্রফুল্ল চাকী নন্দলালকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল বলে শোনা যায় কিন্তু নন্দলাল নাকি বসে পড়ায় সেবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু এবার আর নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে আদালতের কাছেই একজন যুবক গুলি করে হত্যা করে, নিজেও আত্মহত্যা করে। আশু বিশ্বাস ছিলেন সেই সময়ের একজন সেরা উকিল। তাঁকে সহায়তা করছিল আর একজন বিচক্ষণ উকিল আর্ডলে নর্টন। এই আর্ডলে নর্টন পরে শোভাবাজারে পুলিস ইনস্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ হত্যায় অভিযুক্ত নির্মলাকান্ত রায়ের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং আসামীকে খালাস করে আনতে পেরেছিলেন।

হাইকোর্টে যখন বারীন ঘোষ প্রমুখদের মামলার আপিল চলছিল সেই সময় পুলিস অফিসার সামসুল আলমকে হাইকোর্টের বারান্দায় গুলি করে হত্যা করা হয়। যে যুবক গুলি করেছিল সে ধরা পড়ে এবং তাঁর ফাঁসি হয়।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করেছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছিলেন :

আমি দু বছর ধরে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরেছি। পরিশ্রমের ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং বরোদায় ফিরে যাই। সেখানে এক বছর লেখাপড়া করি। বাংলায় আবার ফিরে আসি কিন্তু এবার আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে জনগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাই যথেষ্ট হবে না, সামনে যে বিপদ আসছে তার মোকাবিলা করবার জন্যে আত্মিক উন্নতিও প্রয়োজন এই জন্য একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও আমার উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে স্বদেশী ও বিদেশী বর্জন বা বয়কট আন্দোলন আরম্ভ হয়। আমি কর্মী সংগ্রহে মনোনিবেশ করি কিন্তু তারা সকলেই গ্রেপ্তার হয়। তাদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাই নি।

আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সহযোগিতায় আমি যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করি। প্রায় দেড় বছর চালাবার পর পত্রিকাটির ভার আমি বর্তমান পরিচালকদের হাতে ছেড়ে দিই। পত্রিকার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমি আবার কর্মী সংগ্রহে মনোনিবেশ করি। ১৯০৭ সাল থেকে আরম্ভ করে আমি প্রায় ১৫ জন যুবক সংগ্রহ করি। আমি তাঁদের রাজনীতিক ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি পড়াবার ব্যবস্থা করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সুদূর প্রসারী বিপ্লবে, সেইজন্য আমরা সেইভাবে তৈরি হচ্ছিলুম এবং অল্প অল্প করে অস্ত্র সংগ্রহও করছিলুম।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে সব স্বীকার করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে আমার এই স্বীকারোক্তি করা সম্বন্ধে আমার দলে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল কিন্তু আমি তাদের বলি যে আমরা ধরা পড়েছি, আমাদের দলের আর কোনো কাজ করা উচিত নয়, যারা নির্দোষ তাদের বাঁচানো আমাদের কর্তব্য অতএব ইনস্পেক্টর রামসদয় মুখার্জির কাছে লিখিত ও মৌখিক বিবৃতি দিয়েছি।

যুবক বারীন্দ্রকুমারের এই সরল ও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি সরকার পক্ষের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সরকারপক্ষ সমর্থনকারী উকিল নর্টন সাহেব বলেছিল দলের নেতা অসাধারণ গুণসম্পন্ন একজন যুবক। তার কার্যাবলী কোনো উকিল সমর্থন করবে না বা কোনো রাজনীতিক প্রশংসা করবে না কিন্তু বারীন্দ্রকুমার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ এবং উদার হৃদয় সম্পন্ন···বিপথগামী হলেও বারীন্দ্র সৎ এবং সাহসী। সহকর্মীদের দায়ী না করে সে সমস্ত ঝুঁকি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

দলের লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আর একজন বিশিষ্ট কর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ঃ

নির্দিষ্ট একটা পথ ধরে কাজ করবার উদ্দেশ্যে আমি ধর্মভিত্তিক একটি রাজনীতিক সংস্থা গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

করেছিলুম। যার দ্বারা ভারতকে আমরা পুনরায় জাগিয়ে তুলতে পারব কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এই চিন্তাও করেছিলুম যে ধর্ম ব্যতীত ভারতবাসীদের দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না। সেজন্য আমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ নিয়োগের চেষ্টায় ছিলুম। সাধু সন্ন্যাসী সংগ্রহের জন্যে আমি সারা ভারত ভ্রমণ করেছিলুম কিন্তু আমি আমার মনোমত সাধু পাইনি। সাধু যখন পাওয়া গেল না তখন আমি স্কুল থেকে ছাত্র সংগ্রহ করে তাদের আমি ধর্ম, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলুম। বারীন্দ্র ঘোষ যুবক সংগ্রহে লেগে গিয়েছিল, আমিও তার সঙ্গে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে হাত মেলালুম। তখন থেকে আমি প্রধানতঃ এইসব ছাত্র ও যুবকদিগকে আমাদের দেশের অবস্থা এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করা আমাদের একমাত্র পথ এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা দরকার ও সংগ্রাম করবার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের শিক্ষা দিতে ও সেই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে তাদের সচেতন করে তোলবার জন্যে আত্মনিয়োগ করি।

পরিশেষে উপেন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ আমরা স্থির করেছিলুম যে আমরা যদি গ্রেফতার হই তাহলে নির্দোষ ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে আমরা স্বীকারোক্তি করব, নির্দোষদের ওপর যেন অত্যাচার না হয় এবং যারা আমাদের আরব্ধ কাজ হাতে তুলে নেবে তারা যেন সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।

আইনজ্ঞদের পরামর্শে তাঁরা তাঁদের স্বীকারোক্তি পরে প্রত্যাহার করেছিলেন কিন্তু তাঁরা যা স্বীকার করেছিলেন তার মধ্যে গোপন কিছুই ছিল না, সাহসের সঙ্গে সত্য ঘটনা তাঁরা সোজাসুজি স্বীকার করেছিলেন।

আলিপুর দায়রা আদালতে সকল আসামীকে দায়রা সোপর্দ করার পর দু জন অ্যাসেসরের সহযোগিতায় সি, পি, বিচক্রফট আই সি এস-এর আদালতে বিচার আরম্ভ হল।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১, ১২১এ, ১২২ এবং ১২৩ ধারা অনুসারে আসামীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার গুরুতর চার্জ গঠন করা হয়েছিল। মানিকতলায় ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোড সমেত বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে আসামীরা মহামান্য ভারত সম্রাটকে উচ্ছেদ করার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি বা যুদ্ধঘোষণা করার জন্যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছিল, বে-আইনী ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং মজুত করেছিল অথবা নিজেরা প্রস্তুত করেছিল এবং এই সকল প্রস্তুতি তারা গোপন রেখেছিল। এতদ্ব্যতীত তারা দেশের লোকের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করেছিল এবং সংবাদপত্র যথা যুগান্তর, সন্ধ্যা নবশক্তি, বন্দেমাতরম প্রকাশ, প্রচার করেছিল।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের তখন পুরোধা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। দেশবাসীর অসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখে দেশের লোক স্বভাবতই সন্দেহাকুল। অর্থাৎ বোমা তৈরির দলে এ লোক থাকতে পারে না, স্বদেশী আন্দোলন থেকে অরবিন্দ ঘোষকে সরিয়ে নেওয়াই হল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এক চক্রান্ত। বিচারক বিচক্রফট মন্তব্য করেছিল যে আসামীর কাঠ-গড়ায় অরবিন্দ ঘোষ না থাকলে এই মামলার নিষ্পত্তি অনেক আগেই হয়ে যেত।

আগেই বলেছি বিচক্রফট ছিল শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠি অতএব শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা তার অজ্ঞাত ছিল না। বিচক্রফট বোধহয় বলতে চেয়েছিল যে শ্রীঅরবিন্দের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান একজন ব্যক্তি দলে থাকার জন্যে আসামীরা সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারছে না।

সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হবার ফলে দায়িত্ব পড়েছিল আর্ডলি নর্টনের ওপর। বিপ্লবীদের সঙ্গে অরবিন্দের যোগাযোগ প্রমাণ করবার জন্যে নর্টন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত অরবিন্দের চিঠিপত্র, তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতা,

এবং ধৃত কাগজপত্রে তাঁর নামের উল্লেখ ইত্যাদি ভিত্তি করে অরবিন্দর বিরুদ্ধে নর্টন অভিযোগ খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন।

মোক্ষম প্রমাণ স্বরূপ নর্টন একখানা চিঠি আদালতে পেশ করেছিল যেখানি সুইটস লেটার নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই চিঠি দ্বারা নর্টন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির একজন সক্রিয় সভ্য এবং হত্যা-ষড়যন্ত্রাদির বিষয় তিনি সম্যক অবগত ছিলেন।

চিঠিখানি নিম্নরূপ :—

বেঙ্গল ক্যাম্প, নিয়ার অজিত'স
২৭ ডিসেম্বর ১৯০৭

ডিয়ার ব্রাদার,

নাউ ইজ দি টাইম, প্লিজ ট্রাই অ্যাণ্ড মেক দেম মিট ফর আওয়ার কনফারেন্স। উই মাস্ট হ্যাভ সুইটস অল ওভার ইণ্ডিয়া রেডি ফর ইমারজেন্সি (ভুল বানান, 'ই') আই ওয়েট হিয়ার ফর ইয়োর অ্যানসার।

ইয়োরস অ্যাফেকশানেটলি
স্বাঃ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

এই সুইটস লেটার অর্থাৎ মিঠাইয়ের চিঠির ওপর সরকারী পক্ষের কৌসুলি নর্টন সায়েব খুব জোর দিয়েছিলেন। বাংলায় চিঠিখানি এইরকম দাঁড়ায় :—

বেঙ্গল ক্যাম্প, অজিতের কাছে
২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৭

প্রিয় দাদা,

এখনই সময়, আমাদের কনফারেন্সে যাতে সকলের সঙ্গে দেখা হয় তার চেষ্টা কোরো। জরুরী দরকারের জন্যে ভারতের সর্বত্র মেঠাই প্রস্তুত রাখতে হবে। আমি এখানে তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম।

তোমার স্নেহের
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

নর্টন ভেবেছিল এই চিঠির জোরেই সে অরবিন্দকে ঘায়েল করবে, শ্রীঅরবিন্দ যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে তা প্রমাণ করতে পারবে।

নর্টন বলল মেঠাই মানে বোমা। কনফারেন্স অর্থাৎ সুরাট কংগ্রেসের সময় বারীন্দ্র গোপনে সেখানে তাদের গুপ্ত সমিতিব সভা ডেকেছিল তাই বোঝাচ্ছে। বারীন্দ্রের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দর চিঠিপত্রেব আদান প্রদান বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই দল ও ষড়যন্ত্রেব মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ আছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সুরাট কংগ্রেসে দুই ভাই-ই উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেস সভাপতির পদে রাসবিহারী ঘোষের নির্বাচন নিয়ে টিলক ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দারুণ বিবাদ হয় ফলে অধিবেশন ভেঙে যায়।

চিত্তরঞ্জন দাশ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কঠোর পবিশ্রম করে চিঠিখানা জাল প্রমাণ করেন। আদালতে চিত্তরঞ্জন নিম্নরূপ যুক্তি উপস্থিত করেন:

চিঠিখানা যে সময়ে লেখা তখন দুই ভাই ই সুরাটে উপস্থিত। সে ক্ষেত্রে গোপন ব্যাপাবে চিঠি লিখে জানাবার প্রশ্ন ওঠে না। তারপর বারীন্দ্র যে সুরাটে উপস্থিত ছিলই তার প্রমান কোথায়? বারীন্দ্র সবসময়েই শ্রীঅরবিন্দকে সেজদা বলে ডাকতেন অতএব তিনি ডিয়ার ব্রাদার লিখবেন কেন? চিঠি লিখলেও বারীন্দ্র সবসময়ে বারীন কিংবা বারী সই করতেন, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখবেন কেন? এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে এমন একখানা চিঠি শ্রীঅরবিন্দ নষ্ট না করে সঙ্গে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। তারপব দেখুন বারীন্দ্র লেখাপড়া জানা শিক্ষিত যুবক তিনি 'এমার্জেন্সি' বানান কি করে ভুল লিখবেন? চিঠিখানি আবিষ্কার সম্বন্ধে বিভিন্ন সাক্ষীর মত আবার দেখুন, খানাতল্লাসীর সময় যে সাক্ষী ছিল সে পুলিসের গোয়েন্দা, নাম অমরনাথ এবং তাকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে কোর্টে ডাকা হল না কেন? ব্যাপারটা হল কি যে দরকার পড়লে পুলিস এরকম ভাবে চিঠিপত্র জাল করে থাকে এবং এই জাল চিঠি

শরৎ গোয়েন্দার কীর্তি।

শ্রীঅরবিন্দ নাকি তাঁর স্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ; মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে ?

সায়েব ব্যারিস্টার নর্টন বললেন ঃ এই তো ষড়যন্ত্রের গন্ধ !

চিত্তরঞ্জন বললেন ঃ পরাধীনতা যে কি পরিমাণ দুর্বিসহ, শ্রীঅরবিন্দ তাই বোঝাতে চেয়েছেন।

বন্দেমাতরম পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দর প্রবন্ধগুলি নর্টন রাজদ্রোহকর বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করলেন শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছেন তা প্যাসিভ রেজিস্ট্যানসের প্রচার ছাড়া কিছুই নয়। সরকার পক্ষের যুক্তি গুলি চিত্তরঞ্জন সুকৌশলে খণ্ডন করলেন।

মূল আসামী শ্রীঅরবিন্দকে ষড়যন্ত্রে জড়িত করবার জন্যে সরকার যে মেঠাই চিঠি আবিষ্কার করেছিল সেটিকে জাল প্রমাণ করবার জন্যে চিত্তরঞ্জন যে ত্রুটিহীন যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন তা জজসাহেবের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

চিত্তরঞ্জনের যুক্তি মেনে নিয়ে জজসাহেব বিচক্রফট বলেছিলেন ঃ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে যেখানে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয় সেখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বাড়িতে কাগজপত্র ঢুকে যায় এবং কি করে ঢুকে যায় তার কৈফিয়ৎ আসামী দিতে পারে না।

অর্থাৎ জজসায়েব বলেছিলেন যে ওই জাল মেঠাই চিঠিখানিও পুলিসের গোয়েন্দারা কোনো সময়ে শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতে কাগজ-পত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

দীর্ঘ এক বৎসর শুনানীর পর আসামী পক্ষের নবীন ব্যারিস্টার সি, আর, দাশ, উত্তর জীবনে যিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নামে সর্বজনের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন তিনি জজ ও অ্যাসেসরদের সম্বোধন করে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের শেষে বলেছিলেন ঃ

"এখন আপনাদের সমক্ষে আমার নিবেদন এই, যে অপরাধে এই

ব্যক্তি শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত, মনে করিবেন না যে তিনি কেবল আপনাদের সম্মুখেই এই আদালতে অভিযুক্ত, মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণেও তাঁহার বিচার ভার নির্দিষ্ট আছে। আপনাদের বিচার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বাদবিষম্বাদ নীরব হইবার অনেক পরে এই উদ্বেলতা ও সংক্ষুব্ধ আন্দোলন থামিবার অনেক পরে, মহাকাল আসিয়া ইহার স্থূলদেহ ধ্বংস করিবার পরেও লোকে তাঁহাকে স্বদেশ প্রেমের কবি, মহামানবপ্রেমিক ও জাতীয়তা উদ্বোধনের গুরুরূপে পূজা করিবে। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পরে, বহু পরেও তাঁহার বাণী কেবল ভারতে নহে, সুদূর মহাসাগরের পারেও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইবে। তাই আমি বলি এই আদালতেই তাঁহার বিচার হইতেছে না, স্বাধীনতার ইতিহাসের উচ্চতম ধর্মাধিকরণও একদিন ইহার ন্যায়বিচার করিবে। এইবার আপনার বিচারাদেশ বিবেচনা করিবার ও (অ্যাসেসরদ্বয়ের প্রতি) আপনাদের মতামত প্রদানের মুহূর্ত সমাগত। বিচারপতি, ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে সর্বোজ্জ্বল অধ্যায়টি ইংরেজ বিচারকগণের ন্যায়পরায়ণতায় অলংকৃত হইয়াছে, তাহার দোহাই দিয়া মহত্বের শাশ্বত আদর্শের দিকে চাহিয়া ইংরাজের বিচারক সংসদ হইতে যে সমস্ত শত সহস্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নীতিসূত্র সমদ্ভুত হইয়াছে, তাহাদের নামে, যে-সমস্ত বিচারক পণ্ডিতগণ অপরাধীর বিচার বিধানে ও ন্যায়ের ব্যবস্থাপনে দণ্ড নির্দেশ করিয়াই কেবল ক্ষান্ত থাকেন নাই, পরন্তু জনসাধারণের শ্রদ্ধাও অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামে নিবেদন করিতেছি, ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক মহিমান্বিত কথা স্মরণ করাইয়া নিবেদন করিতেছি যে, একথা যেন ভবিষ্যতে কেহ না বলিতে পারে যে এই বিচারের সময় একজন ইংরাজ বিচারক ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষায় পরাম্মুখ হইয়াছিল। আর আপনাদের (অ্যাসেসরদ্বয়ের প্রতি) কাছেও আমার নিবেদন যে, আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিয়াছে, তাহার নামে, আমার মাতৃভূমির শিক্ষাদীক্ষায় রাজনীতির ধারার কথা স্মরণ করাইয়া আমি নিবেদন করিতেছি যে ভবিষ্যতে এমন কোনো সমালোচনায় যেন আমাদের

ইতিহাস কলঙ্কিত না হয় যে দুইজন স্বদেশবাসী ভ্রান্ত সংস্কার ও পক্ষপাতিত্বের প্রভাবে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আপনাদের বিচার বুদ্ধির অবমাননা করিয়াছিল।'

ওই আবেদনের প্রায় এক মাস পরে ৬মে ১৯০৯ তারিখে বিচারপতি বিচক্রফট শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে রায় দিলেন ঃ

Taking all the evidence together I am of opinion that it falls short of such proof as would justify me in finding him guilty of so serious a charge.

শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। সকলেই উল্লসিত কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর কারাকাহিনী বইতে নর্টন চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

কৌঁসিলী নর্টন মাদ্রাজী সাহেব, সেইজন্য বোধহয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিস্টারমণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন সেইজন্য বোধহয় বিরুদ্ধাচারণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধ-চারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে হিংস্র স্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখনও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কি না বলিতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন, সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পরিপাটো, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহাসিকতায় সাক্ষী ও জুনিয়র ব্যারিস্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত।...সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। এই অর্থ বৃথা ব্যয় হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি যাহাতে না হয়, নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছেন।

হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন শেকসপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, আমাদের নাটকের শেকসপিয়র ছিলেন নর্টন সাহেব। তবে শেকসপিয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। শেকসপিয়র সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, নর্টন সাহেব ভালমন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অনো অনীয়ান, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই। তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্টি প্রচুর Suggestion inference hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর প্লট রচনা করিয়াছিলেন যে শেকসপিয়র ডেফো ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের প্লটের কল্পনা প্রসূত কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী Bold bad man। আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পিতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন অরবিন্দ ঘোষ।

তাঁহার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধহয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজের ভারত সামাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।···

সেসন আদালতে আমি নির্দোষী প্রমাণিত হইলে নর্টনকৃত প্লটের শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বিচক্রফট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিলেন।"

বিচক্রফটের রায়ে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন কিন্তু ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ এবং ১২২ ধারা অনুসারে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তর ফাঁসির হুকুম হল।

রায় পড়ে যখন শোনানো হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দ তখনও আসামীর তকে দাঁড়িয়ে। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড শুনে তিনি আর্তনাদ করে

উঠলেন, তাঁর দুই চোখে অবিরল অশ্রুধারা।

১২-এ এবং ১২২ ধারা অনুসারে হেমচন্দ্র দাশ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুধীরকুমার সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং ইন্দুভূষণ রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল।

১২১ এবং ১২২ ধারা অনুসারে পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিপদ রায়ের ১০ বছর করে দ্বীপান্তর। উক্ত সকল আসামীর সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন।

অশোকচন্দ্র নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানে, সুশীলকুমার সেনের ৭ বছর করে দ্বীপান্তর। কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং শ্রীঅরবিন্দ সমেত বাকি সতেরজনকে মুক্তি দেওয়া হল।

সেইদিনই আদালতে বেদনাহত শ্রীঅরবিন্দকে চিত্তরঞ্জন বললেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি বারীন্দ্রকে খালাস করে আনব, ওকে খুব ভাল কাজে লাগাব।

বিচারের সময়েও বারীন্দ্র তার বন্ধুদের বলত, তোরা দেখিস, আমার ফাঁসি হবে না, সেজদা বলেছে। সেজদা অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ।

দণ্ডাধীন সকল আসামীই হাইকোর্টে আপিল করল। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিনস এবং বিচারপতি কার্নডাফের এজলাসে ৯ আগস্ট ১৯০৯ তারিখে শুনানী আরম্ভ হয়েছিল, চলেছিল ৪৭ দিন। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড রদ হল। হাইকোর্টে দণ্ডাদেশ দেবার সময় প্রধান বিচারপতি বললেন:

The question of punishmont is one of considerble difficulty ; those who have been convicted are not ordinary criminals they are for the most part men of education of strong religious instincts and in some cases of considerable force of character.

At the same time they have been convicted of one of the most serious offince against the state in

that they have conspired to wage war against the king and the punishment must be in proportion to the gravity of the offence.

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র দাশকে বিচারপতিরা এক শ্রেণীভুক্ত করলেন। তিনি বললেন এরাই হল গুপ্ত সমিতির নেতা। এদের শাস্তিও সেই রকমই হবে।

উল্লাসকর এবং হেমচন্দ্র বোমা তৈরি করেছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন। এদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হল।

দশ বৎসর করে দ্বীপান্তর দেওয়া হল বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল এবং ইন্দুভূষণ রায়কে।

সুধীরকুমার সরকার, পরেশচন্দ্র মৌলিক, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সাত বৎসর করে এবং শিশিরকুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায়কে পাঁচ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

কৃষ্ণজীবন সান্যাল, সুশীলকুমার সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শৈলেন্দ্রনাথ বসু এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীর অভিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি কার্নডাফের সঙ্গে মতদ্বৈধতা ঘটেছিল। এই পাঁচ-জনের মামলা স্যার রিচার্ড হ্যারিংটনের আদালতে পুনরায় পাঠান হল।

৩ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে শুনানী আরম্ভ হয়ে এক মাস চলেছিল। কৃষ্ণজীবন, সুশীল এবং ইন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন কিন্তু শৈলেন ও বীরেনের দণ্ড বহাল রইল।

এই ভাবে আলিপুর বোমা মামলার ওপর যবনিকা পাত হল।

নির্মলকান্ত রায়ের বিচার

নির্মলকান্ত রায় কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নয়, শহীদ নয়, দ্বীপান্তরের আসামীও নয় কিন্তু তাকে ঘিরে সে সময়ে যে মামলা হয়েছিল তা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নির্মলকান্ত রায়ের মামলায় আমরা আর্ডলে নর্টনকে আর এক ভূমিকায় দেখি। এখানে সে সরকারের পক্ষ সমর্থনকারী ব্যারিস্টার নয়। এখানে সে আসামী নির্মলকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ইংরেজ সরকার ও পুলিসের ত্রুটি।

১৯ জানুয়ারি ১৯১৪ রাত্রি আটটা।

শোভাবাজার আর চিৎপুরের মোড়ে ঘোড়ায় টানা ট্রাম থেকে নামল পুলিস ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ। ঐ ট্রাম থেকে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে নামল দু'জন বাঙালী যুবক। একজনের গায়ে কালো চাদর অপরের গায়ে হলদে চাদর। তখনও শীত শেষ হয় নি অতএব গায়ে চাদর বা র‍্যাপার অথবা আলোয়ান থাকা স্বাভাবিক। ট্রাম থেকে নেমেই যুবকেরা নৃপেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। দু'টি বা তিনটি গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যুবকেরা দৌড়তে আরম্ভ করল।

একজন যুবক চিৎপুর রোডেই কোথায় হারিয়ে গেল আর অপরজন বেনেটোলা স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল তারপর সে ঢুকল সোনার গৌরাঙ্গ টেম্পল লেনে। ইতিমধ্যে তাকে ধরবার জন্যে 'পাকড়ো পাকড়ো' করে লোকজন তাকে তাড়া করেছে।

গঙ্গা তেলি আর অনন্ত তেলি তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। অনন্ত

বালক মাত্র। সে পলাতক যুবকের গা থেকে চাদরটা ধরে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু যুবক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তল বার করে গুলি ছোঁড়ে।

গঙ্গা তেলির হাতে গুলি লাগে, সে রাস্তায় পড়ে যায় কিন্তু বালক অনন্তর গায়ে গুলি লাগে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। গুলি ছুঁড়েই যুবক ছুটতে থাকে। পিছনে কি হল, কে মরল, কে বাঁচল তা দেখবার জন্যে সে অপেক্ষা করে নি।

যুবক ছুটতে ছুটতে মসজিদবাড়ি স্ট্রিট ঢুকে পড়ল এবং পুলিসের বিবৃতি অনুসারে দু'জন লোক তাদের জীবন বিপন্ন করে তাকে ধরে ফেলে।

দু'জনেই স্থানীয় অধিবাসী।

একজনের নাম মনোদত্ত পাঁড়ে আর অপরজন দোসাদ নামেই পরিচিত। সে ছ্যাকড়া গাড়ি চালায়। সে বলে যে আসামী যখন রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছিল তখন সে ভাড়া পাবার অপেক্ষায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দোসাদ আসামীর কাছ থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নেয় আর তার পকেট থেকে দুটো কার্তুজও বার করে নেয়।

এই যুবকেরই নাম নির্মলকান্ত রায়।

নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অনন্ত তেলিকে হত্যার অভিযোগে তাকে হাইকোর্টে ফৌজদারি সোপর্দ করা হয়।

তার দু'বার বিচার হয়।

প্রথমবার বিচার হয় বিচারপতি স্টিফেনের আদালতে স্পেশাল জুরি সহযোগে। জুরিরা দুটি খুনের অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়ে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে।

জুরিদের রায়ে জজসাহেব সন্তুষ্ট নয়।

তিনি পুনরায় বিচারের আদেশ দিলেন।

তাঁরই আদালতে ১৬ মার্চ ১৯১৪ তারিখে পুনরায় বিচার আরম্ভ হল তবে এবার জুরি স্বতন্ত্র, ভারতীয় জুরি একজনও ছিল না।

অভিযোগের ধরনও এবার কিছু পাল্টানো হয়েছে যেমন ইনস্পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে খুন করার জন্যে সহায়তা (১১৪ এবং ১০৯ ধারা) এবং অনন্ত তেলিকে হত্যা কিন্তু হত্যার জন্যে কোনো ষড়যন্ত্র করা হয় নি।

আসামী নির্মলকান্তের পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত আর্ডলে নর্টন এবং চিত্তরঞ্জন দাশ। সরকার পক্ষেও বাধা ব্যারিস্টার। স্বয়ং অ্যাডভোকেট-জেনারেল সত্যপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) এবং বি, সি, মিত্র পরে রাইট অনারেবল স্যার বি, সি, মিটার পি, সি।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এমন কেলেংকারি আর কখনও দেখা যায় নি।

ইংরেজ সরকার এক অতুল কীর্তি স্থাপন করে শুধুই যে তীব্র সমলোচনার সম্মুখীন হয়েছিল তাই নয় হাস্যাস্পদও হয়েছিল। বলতে গেলে এই ঘটনার জন্যেই মামলায় সরকারের হার হয়েছিল। বিচার আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে তো বটেই এমন কি সরকারি ভাবে অভিযুক্ত করার আগে পুলিসের এক কুচকাওয়াজে বাংলার লাটসাহেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে যেসব ব্যক্তি আসামীকে ধরেছিল তাদের হাতে মোটা নগদ টাকা পুরস্কার হিসেবে তুলে দেন।

পুলিস কমিশনারও একটি বক্তৃতা দেন এবং নির্মলকান্ত রায়কেই খুনী বললেন অথচ তখনও তার বিচারই শুরু হয় নি।

এ ঘটনা অভাবনীয়, বিচার হল না, প্রমাণ হল না, কিছুই হল না, পুরস্কার দেওয়া হল, নির্দোষ লোককে খুনী বলে ঘোষণা করা হল। এ যেন মগের মুল্লুক।

মিঃ নর্টন তাঁর মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করতে উঠে আদালতকে বলেন যে তাঁর এই মক্কেল নিতান্তই হতভাগ্য, সদ্য তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে বলে নয়, তাঁকে তার জীবনের জন্যে দু'বার একই বিচারকের সম্মুখীন হতে হল এবং তাও মাত্র চৌদ্দ দিনের মধ্যে।

প্রথম বারের বিচারে জুরিগণ তাঁর অনুকূলে রায় দিয়েছিল কিন্তু বিচারক

সে রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি পুনরায় তার বিচারের আদেশ দেন। সেই একই বিচারপতির আদালতে তার পুনর্বিচারের আদেশ হয় কিন্তু এবার জুরি স্বতন্ত্র। মিঃ নর্টন বলেন যে আইনের ধারা লঙ্ঘন করে এবার ভিন্নদেশীয় জুরি নিয়োগ করা হয়েছে অথচ সর্বাধিক সংখ্যা দেশীয় জুরি দ্বারা আসামীর বিচার পাবার অধিকার আছে। কিন্তু এখানে ত করা হয় নি।

লাটসায়েব কর্তৃক পুরষ্কার বণ্টনের ইঙ্গিত করে বিচারের নামে প্রহসনেরও উল্লেখ করেন মিঃ নর্টন। তিনি আরও বলেন যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের সে সাক্ষ্য যে মোটেই সত্য নয় তাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করবেন। তিনি বলেন যে that the story that he (Nirmalkanta) assisted in the murder of the inspector is false from the beginnig is false right through and is false up to end.

বিচারধীন একজন আসামীকে সরকারী অনুষ্ঠানে সরকার কি করে দোষী বলতে পারে এ তিনি বুঝতে পারছেন না। অতএব মিঃ নর্টন বলেন: তিনি এই মামলাটিকে একটি পুলিস কেস বলতে চান। ইনস্পেক্টরের মৃত্যু খুবই দুঃখজনক তা তিনি অস্বীকার করছেন না কিন্তু মামলাকে পুলিস এমনভাবে সাজিয়েছে, এমন সব সাক্ষী উপস্থিত করেছে, এমন সব উক্তি করেছে যে এখন পুলিসকেই কৈফিয়ত দিতে হবে। এমন কি সরকারের মান সম্মানও এই বিচারের ফলাফলের সঙ্গে জড়িত।

লাটসাহেবের উপস্থিতিতে পুলিস কমিশনার ধৃত ব্যক্তিকে খুনী বলে উল্লেখ করেছেন এবং এতদ্বারা তিনি লাটসাহেবকেও তাঁর উক্তির অংশীদার করেছেন অতএব লাটসাহেবেরও সম্মান জড়িত। কিন্তু অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এস, পি, সিংহ লাটসাহেবের ব্যাপারটা অস্বীকার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে লাটসাহেব দর্শক বা শ্রোতা মাত্র। তিনি কি করে পুলিস কমিশনারের উক্তির দায়িত্ব নিতে পারেন?

সরকার যাদের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন তারা প্রত্যেকে পাখি পড়ার মতো করে বলে গিয়েছিল যে আসামীই খুনী এবং এই সব সাক্ষীকে জেরা করে মিঃ নর্টন যেভাবে তাদের উক্তি মিথ্যা এবং সাজানো বলে প্রমাণ করেন তাতে সরকাব নিজেদের অসহায় বোধ করতে থাকে।

ভদ্রলোক সাক্ষী একজনও ছিল না। মিঃ এস, পি, সিংহ অবশ্য তাঁর সওয়ালের সময় বলেছিলেন যে আসামীকে পাকড়াও করবার জন্যে উকিল, ডাক্তাব, জমিদাব প্রমুখ ভদ্রলোকেবা পিছু পিছু ধাওয়া করে না।

উত্তরে মিঃ নর্টন অবশ্য বলেছিলেন যে উকিল, ডাক্তার জমিদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্যতীত আব কেউ যেন ভদ্রলোক নেই এবং ভদ্রলোকের প্রতি মিঃ সিংহর কটাক্ষ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মিঃ নর্টন সাক্ষীদেব কিভাবে জেবা করেছিলেন তাব কিছু নমুনা এখানে তুলে দেওয়া গেল ঃ—

দোসাদ ছ্যাকরা গাড়ির চালক। আসামীকে সে ধরেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

মিঃ নর্টন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—

—তুমি বর্ধমান চেনো ?

—হ্যাঁ।

—সেখানে তুমি কখনও গিয়েছিল ?

—না!

—বর্ধমানে তুমি কি ১০, ১২, বা ১৪ দিন জেলখানায় ছিলে না? কতকগুলি জামাকাপড় ও একটা ঘড়ি চুরির ব্যাপারে তোমাকে সন্দেহ করা হয়েছিল ?

—হ্যাঁ, বাড়ি যাবার পথে আমাকে থানায় আটক করা হয়েছিল—

সন্দেহ করা হয়েছিল যে তুমি সেগুলি চুরি করেছিলে ?

—হ্যাঁ, দোসাদ বলে

—তুমি ঘড়ি পছন্দ কর, তাই নয় কি? তুমি ঘড়ি সংগ্রহ কর?

—আমি দেশের বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তাই একটা ঘড়ির দরকার ছিল, একটা পেয়েছিলুমও।

—তুমি তো ঘড়ি দেখতে জান, না '

—না।

—তবে তুমি ঘড়ি নিয়ে কি করবে? তুমি ঘড়িটা চুরি করেছিলে?

—না আমি কিনেছিলুম।

—কার কাছ থেকে কিনেছিলে।

—আর একজন ছ্যাকরা গাড়ির গ াড়োয়ানের কাছ থেকে।

—ঘড়িটা কোথায়?

—আমি হারিয়ে ফেলেছি।

—তা তুমি কি আবার ঘড়ি কিনেছ?

—না।

—আমি বলছি যে তুমি ঘড়িটি আসামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলে!

—মিথ্যা কথা।

—শুধু ঘড়ি নয়, কিছু টাকা এবং একটি রুমাল।

—না, আমি ওসব কিছু দেখি নি।

—তুমি কি সেগুলি আসামীর কাছে দেখ নি?

—না।

—১৯শে জানুয়াবি তোমার কাছে একটা ঘড়ি ছিল?

—না।

—আগেকার ঘড়িটা হারিরে যাওয়ায় তুমি কি উদ্বিগ্ন ছিলে?

—আমি আর ঘড়ি কিনতে পারি নি

—তোমার কি ঘড়ি .কনবার ইচ্ছে এখনও আছে?

—সে কথা আমি বলতে পারি না তবে ইচ্ছে হলে আমি কিনব।

—তুমি যে ৭৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলে তা থেকে কিছু খরচ করে কি একটা ঘড়ি কিনবে?

—না

—ঐ টাকার অংশ কাউকে কি দিয়েছ ?

—ধার শোধ করেছি

—কিছু কি দান করেছ

—না, করি নি

—পুলিসকে কিছু টাকা ফিরিয়ে দাও নি ?

—না।

ঘড়ির ওপর নর্টন সায়েব এত জোর দিলেন কেন ? কারণ আসামীর সঙ্গে একটি ঘড়ি ছিল এবং কিছু টাকা পয়সা ও একটি রুমালও ছিল। নর্টন সাহেব প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ঘড়িটি আসামীর এবং সেটি দোসাদ চুরি করেছিল।

দুঃখীরাম দত্ত, ছাতা বিক্রেতা, আর একজন সাক্ষী। নর্টনের জেলায় পড়ে সে স্বীকার করে যে কোনো এক মহিলার কিছু সামগ্রী চুরির অপরাধে তার সাজা হয়েছিল।

আসামীকে অনুসরণ করে যারা ধরেছিল তাদের মধ্যে গঙ্গা তেলি একজন। তার বিষয়ে নর্টন বলেছেন যে সে তো মিথ্যাবাদীদের মুকুটহীন রাজা। জেরায় চাপে পড়ে সে স্বীকার করেছিল যে ছাগল চুরির অপরাধে তার সাজা হয়েছিল। তাকে সাত ঘা বেত মারা হয়েছিল। নর্টন আরও অভিযোগ করেন যে আসামীকে ধরা দূরের কথা, গঙ্গা তেলি সেদিন সেই সময়ে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে উপস্থিত ছিলই না।

উত্তরে গঙ্গা তেলি বলে আপনার যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

নর্টন আরও বলেনঃ গঙ্গা তেলিরা হল পুলিসের পোষা দাগী ওরা পুলিসের সাজানো ও শেখানো সাক্ষী।

আর একজন সাক্ষী ভোলা কালোয়ার। নর্টন তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

—তুমি কোকেনের ব্যবসা কর ?

—কোকেন কিরকম আমি জানি না। আমার একবার মুখ ফুলে-ছিল তখন আমি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেছিলুম।

—প্রায়ই ব্যবহার কর ?

—আমার একবারই মুখ ফুলেছিল

—কখন ?

—১৯১৭ সালে, তখন আমি ২৯৬ নম্বর আপার চিৎপুর রোডে থাকতুম।

—২৯৬ নম্বরটা কি ২৯৭ নম্বর থেকে আলাদা বাড়ি ?

—আমি বুঝতে পারছি না।

—তোমার যখন মুখ ফুলেছিল তখন তুমি কিভাবে কোকেন ব্যবহার করেছিলে ?

—আমি ওটি মুখের ভেতরে পুরে দিই।

—বুঝেছি, তোমার কাছে অবৈধ ৩৭টা প্যাকেট কোকেন আছে না ?

—হ্যাঁ।

—তুমি এত বেশি কোকেন কোথায় পেলে ?

—ওষুধ হিসেবে পেয়েছি, পুরিয়াগুলো আমার কাছে আছে।

—আর এই জন্যেই কোনো হাকিম তোমাকে সাজা দিয়েছিলেন কি ?

—হ্যাঁ, আমি দোষ করেছিলুম।

—কোকেনটা কি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ?

—না।

—তোমার ৫০ টাকা জরিমানা আর এক মাসের জে । হয় নি কি ?

—আমি জরিমানার টাকা দিয়েছিলুম, হ্যাঁ।।

—আবগারি দফতরের মিঃ হ্যানসকে তুমি তো বলেছিলে যে তুমি তাঁকে কয়েকটা ভাল কেস দেবে আর সেই জন্যেই হ্যানস হাকিমকে অনুরোধ করেছিল তোমাকে শুধু জরিমানা করতে ?

—না, আমি তা বলি নি।

এর পরের সাক্ষী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নর্টন সায়েবের মতে দশ বছর জেল খাটার সম্মানে সম্মানিত সদ্যোমুক্ত মাননীয় ব্যক্তি।

আসামী যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল আর গঙ্গা তেলি আর বালক অনন্ত তেলি ছুটে গিয়ে আসামীর চাদর ধরে টানাটানি করছিল, এই দৃশ্য

তখন যোগেন দেখেছিল। নর্টন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

—১৯০৩ সালে চুরির দায়ে তোমার সাজা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—ভারতের হোটেলে ধরা পড়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তোমার এক বছর জেল হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তার আগে ১৯০১ সালে তুমি চুরি করেছিলে?

—আমার মনে নেই।

—সেজন্যে ১০ বছর মেয়াদ খেটেছিলে?

—আমার মনে নেই।

—তোমাদের একটা চোরের দল ছিল সেজন্যে ১৯০৫ সালে তোমার ১০ বছরের জেল হয়েছিল?

—হ্যাঁ, আট বছর মেয়াদ খেটেছিলুম।

—আবার পৃথক পাঁচটা অপরাধে তুমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলে?

—হ্যাঁ,

—এক মাস, ছ' মাস, দশ মাস, এক বছর করে মেয়াদ আর পনেরো ঘা বেত তোমার পিঠে পড়েছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, কিন্তু দশ মাসটা আমার মনে পড়ছে না।

—বেত খেয়েছিলে কেন?

—মারামারি করার জন্যে

—১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে তোমার আবার সাজা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—মামলা প্রত্যাহার করা হয় নি?

—না।

—আবগারি আইনের ব্যাপারে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট তোমাকে পুনরায় আদালতে হাজির হতে বলেন নি?

—না।

—কোকেন রাখার জন্যে ১৯১৪ সালে আবার তোমাকে ধরা হয়েছিল।

—না, কোকেন নয়, বদভাবে জীবন যাপন করার জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল

—আমি বলতে চাই যে পুলিসের সঙ্গে তোমার দহরম মহরম আছে।

—না

—আসামীকে ধরার জন্যে পুলিস কমিশনার তোমাকে ১০০ টাকা দিয়েছিলেন এবং তুমি তা নিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

এতগুলি দাগী ও মিথ্যাবাদী সাক্ষীর সমাবেশ নর্টন সায়েব উত্তম রূপে ব্যবহার করেছিলেন। হেড কনস্টেবল আবদুল গফুরকে জেরা করে নর্টন প্রমাণ করে যে জেল ঘুঘু ও দাগী অপরাধীদের সঙ্গে পুলিসের একটা যোগাযোগ আছে এবং প্রয়োজনে পুলিস তাদের সাহায্য নিয়ে থাকে।

নর্টন বলেন যে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে মোট ৯ জন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে তার মধ্যে চারজন সাক্ষী হল রাধেশ্যাম সিং, মনোদত্ত পাঁড়ে, দোসাদ। দোসাদ হল মনোদত্তর ভৃত্য যদিও সে তা স্বীকার করে না। তারপর আবদুল গফুর কনস্টেবল, দেবী বরাই পানওয়ালা, একজন সি, আই, ডি অফিসার সাক্ষ্য দিলেও তিনি ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন, মিথ্যাবাদীর রাজা গঙ্গা তেলি এবং দশ বছরের মেয়াদ-খাটা যোগেন ভট্টাচার্য সাক্ষ্য দিয়েছিল। নর্টন বলতে থাকে যে এই ন জনের মধ্যে একমাত্র দেবী বরাই পুরস্কৃত হয় নি। এখন যে পরিমাণে মোট পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তা মাথা পিছু ভাগ করলে প্রতি ন জনের ভাগে ৭৫০ টাকা পড়ে। পুলিস সাক্ষী সমেত বাকি সকলকে এই টাকা দিয়ে তাদের সাক্ষ্য ক্রয় করা হয়েছে যদিও তারা বলেছে যে পুরস্কারের অর্থ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয় নি।

ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষীরা বলেছে যে মনোদত্ত ধরলেও প্রত্যেকেই কিন্তু আসামীকে ধরেছে বলে দাবি করে কিন্তু আমরা শুনেছি আসামীর

হাতে পিস্তল ছিল। আসামীর হাতে পিস্তল থাকলে কেউ তার কাছে যেতে সাহস করত?

আসামী অবশ্যই সেই সময়ে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে ছিল এবং আসল খুনীও রাস্তাতেই ছিল। খুনীকে ধরবার জন্যে অনেকে ছোটাছুটি করছে, খুনী আবার গুলি চালাচ্ছে শুনে কেউ কেউ দৌড়ে পালাচ্ছে আসামীও হয়তো সেইভাবে পালাচ্ছিল এবং সেই সময়ে দাগী মনোদত্ত এবং ছ্যাকরা গাড়িব গাড়োয়ান দোসাদ, সেও একজন দাগী, আসামীকে ধরে ফেলে।

তার ঘড়ি, চারটে টাকা আর রুমাল কেড়ে নেয় কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আসামীকে পুলিসের হাতে দিয়ে দেয় এবং নিজেরা ডাকাতি করে থাকলেও সাধু সাজে।

সাধু না সেজে উপায় কি? তাহলে যে ছিনতাইয়ের অপরাধে তাদের হাতে দড়ি পড়ত।

নর্টন আর একটা প্রশ্ন তোলেন। আসামীই যে খুনী সেটা প্রমাণ হবে কি করে? মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে মনোদত্ত আর দোসাদ তাকে ধরে কিন্তু শোভাবাজারের মোড়ে ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষের সঙ্গে যে দু জন ছোকরা নেমেছিল তাদের কে দেখেছিল? এবং তাদের মধ্যে একজন বা দুজনেই যদি গুলি ছুঁড়ে থাকে তাকেই বা কে দেখেছিল? কেউ দেখে নি অর্থাৎ এমন কোনো সাক্ষী পুলিস উপস্থিত করতে পারে নি। কারণ তখন সমবেত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে ব্যাকুল। মনোদত্ত ও দোসাদ তাদের দেখেই নি উপরন্তু শোভাবাজারের মোড়ে এই দুজন আসামী নির্মলকে অনুসরণ করে নি অতএব নির্মলকান্ত সেই সময়ে শোভাবাজারের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষকে গুলি করেছিল তার প্রমাণ কোথায়?

নর্টনের এই সকল অকাট্য যুক্তির পর আসামী নির্মলকান্তকে নট গিল্টি বলা ছাড়া জুরিদের আর উপায় ছিল না কিন্তু জজ সাহেব তবুও দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি রায়দান স্থগিত রাখলেন কিন্তু পরদিন ৯

এপ্রিল তারিখে অ্যাডভোকেট জেনারেল সত্যপ্রসন্ন সিংহ সকলকে অবাক করে দিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন।

॥ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ॥

ভারতে ইংরেজ সরকার লাল জুজুর ভয়ে দিশেহারা হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচার করেন এবং যার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি উৎপাটিত হওয়া দূরের কথা প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় তরুণ ও যুবক কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

কয়েকজন বিখ্যাত লেবর ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতার উদ্যোগে ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানালের একটি শাখা ভারতে স্থাপিত হয়।

পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মজঃফর আমেদ, এস এ ডাঙ্গে, সৌকত উসমানি এবং আরও অন্যান্য।

কংগ্রেস যখন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, সত্যাগ্রহ, বিদেশী বর্জন ইত্যাদি

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করবার চেষ্টা করছে তখন কমিউনিস্ট পার্টি চেষ্টা করছে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে যাতে ইংরেজ ভাবত ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ভারতে গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুর্জোয়া শাসন এবং ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদ থেকে দেশের জনগণ, কৃষক ও শ্রমিকদের কিভাবে মুক্ত করা যেতে পারে সে বিষয়ে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশানালের একটি কর্মসূচী ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেই কর্মসূচী অনুসরণ করে এদেশে রাশিয়ার মতো গণরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কমিউনিস্টদের আদর্শ দেশে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করতে লাগল এমন কি ভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কেউ কেউ এই নতুন পার্টির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু অন্যতম বলে মনে করা হয়।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর ১৯১৮ সালের শেষ নাগাদ পাঞ্জাবের স্বনামখ্যাত কর্মী সর্দার সোহন সিং যোশের উদ্যোগে কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া ওআরকার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির উদ্বোধন হল।

সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্টই বললেন ঃ—

ব্রিটিশ তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেলে তবেই ভারত স্বাধীন হবে…নেহরু কমিটি (মতিলাল নেহরু ?) যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের অনুমোদন করেছেন তাদ্বারা কি ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে? সংবিধান রচনা করে ভারতকে স্বাধীন করা যাবে না, স্বাধীনতা আনতে পারে কেবলমাত্র বিপ্লব। আমাদের শ্রমিক ও কৃষক পার্টি একটি স্বতন্ত্র দল এবং আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। যাঁরাই বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী তারাই আমাদের পার্টিতে যোগদান করতে পারেন এবং বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে দেশকে স্বাধীন করতে পারবেন।…রাশিয়ার কর্মীবন্ধুরা এবং আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে নচেৎ

আমরা অকৃতজ্ঞ বিবেচিত হব।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাঁর পার্টি কি করবে সে বিষয়ে সর্দার মোহন সিং বলেন।

যুদ্ধ বাধলেই আমরা ব্যাপক হরতাল, স্ট্রাইক, সাবোটাজ, বয়কট-এর আশ্রয় নেব, পরিবহন ব্যবস্থা বানচাল করে শত্রুকে নাজেহাল করব ···শত্রু যখন যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবে আমরা তখন এমন কৌশল অবলম্বন করব যাতে শত্রুকে দ্বিধাবিভক্ত হতে হবে এবং সেই সুযোগে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ভেঙ্গে দেব। আমি আমার মনের কথা খুলেই বলছি এবং এই পথ ধরেই রাশিয়ার বলশেভিকরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁচেছে, তারা আমাদের পথ দেখিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ···

উক্ত নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির সভাপতি যদিও খোলাখুলি বলেন নি যে তাঁরা কমিউনিস্ট কিন্তু এটা ঠিক যে তাঁরা কমিউনিস্ট ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পার্টির মুদ্রিত সংবিধান পাঠ করলেই তা বোঝা যাবে।

বাংলা, পাঞ্জাব ও বম্বের কৃষক-শ্রমিকরা অনেকেই বিশ্বাস করত যে এই পথেই স্বাধীনতা আসবে, কংগ্রেস নির্ধারিত অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পথে নয়। সকল প্রকার রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দাসত্ব থেকে কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্ত করে একটি সংযুক্ত সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য।

কমিউনিস্টদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে ভারত সরকার সচকিত হয়ে উঠল। এদের আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এখনই কিছু করা দরকার। এজন্যে কোনো অর্ডিনান্স জারি করতে হয় নি। প্রচলিত আইনের বলেই ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট দমন আরম্ভ করল। তারা গোড়া থেকেই মীরাটকে বেছে নিল।

মীরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক পরোয়ানা বলে ভারতের প্রধান প্রধান শহর যথা কলকাতা, বম্বে, নাগপুর, লাহোর, এলাহাবাদ ইত্যাদি স্থানে সার্চ ও গ্রেফতার আরম্ভ হল। সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বা নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির সভ্যদের গ্রেফতার করা শুরু হল এবং মোট একত্রিশ জনকে গ্রেফতার করা হল।

ভারতীয় পেনাল কোডের ১২০ বি (ষড়যন্ত্র) এবং ২১-এ ধারাবলে গ্রেফতার করা হল। এই ধারা বলে ব্রিটিশ ভারত থেকে সম্রাটকে রাজ্যচুত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া যেতে পারে।

এই ষড়যন্ত্রের জন্যে যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন লেস্টার হাচিনসন ইংরেজ কমিউনিস্ট, ফিলিপ স্প্র্যাট কেম্ব্রিজ গ্র্যাজুয়েট, বি এফ ব্র্যাডলি, ডি আর থেংডি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, কিশোরীলাল ঘোষ কলকাতার সাংবাদিক, ভি এস মুখার্জি, গোরক্ষপুরের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কেদারনাথ সায়গল লাহোর, এস এইচ ঝাবভালা একমাত্র পার্শি আসামী, মজঃফর আমেদ, ডাঙ্গে, ঘাটে, যোগেলেকর, মিরাজকর, নিম্বকর, সৌকত উসমানি, মোহন সিং যাশ, মজিদ, অযোধ্যাপ্রসাদ, অধিকারী, কাসলে, গৌরীশংকর, কদম এবং ধরমবীর সিং।

মীরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর মিলনার হোয়াইটের আদালতের বিচারপর্ব শুরু হল। আসামীদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি আনা হল:—

রাশিয়াতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল নামে একটি সংস্থা আছে যার উদ্দেশ্য হল সারা পৃথিবীতে সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের দ্বারা প্রচলিত সরকারের উচ্ছেদসাধন এবং মস্কোর সেন্ট্রাল সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বত্র সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উদ্দেশ্য কিভাবে সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান, ওয়ারকার্স অ্যাণ্ড পেজান্ট পার্টি, ইয়ুথ লিগ ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি স্থাপন করে তাদের মাধ্যমে কিভাবে সরকারের উচ্ছেদ সাধন করা হবে এবং সর্বত্র কমিউনিস্ট কর্মীদের ছড়িয়ে দেওয়া হবে ও সংবাদপত্র এবং

বক্তৃতা ও পুস্তক মাধ্যমে কিভাবে প্রচার চালান হবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল তার কর্মসূচী প্রস্তুত করে রেখেছে।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং বিভিন্ন সাব কমিটির সাহায্যে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন কমিটি, শাখা ও সংস্থার মাধ্যমে কাজ ও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি উক্ত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের একটি বিভাগ।

আসামী মজঃফর আমেদ, এস. এ ডাঙ্গে এবং সৌকত উসমানি প্রমুখ কমিউনিস্টগণ ১৯২১ সালে ব্রিটিশ ভারতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের একটি শাখা স্থাপন করেছিল এবং ব্রিটিশ ভারত থেকে ভারত সম্রাটকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেছিল।

ভারতে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল আসামী স্প্রাট ও ব্র্যাডলিকে ভারতে পাঠিয়েছিল।

আসামীগণ বিভিন্ন স্থানে বাস করলেও তারা ব্রিটিশ ভারত থেকে ভারত সম্রাটকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য নিজেদের মধ্যে এবং অপরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের কর্মসূচী রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে কাজ করে যাচ্ছিল।

আসামীগণ তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশেষভাবে মীরাটে শ্রমিক ও কৃষক পার্টি গঠন করেছিল এবং সভা আহ্বান করেছিল।

মীরাটে মিলনার হোয়াইটের আদালতে মামলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষ থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপত্তি জানিয়ে আবেদন করা হয় যে, মামলা মীরাটের পরিবর্তে অন্য কোনো প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হোক।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রিমউড মিয়ার্সের এজলাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু এই আবেদন পেশ করেন। প্রধান বিচারপতি অবিশ্যি সে আবেদন নাকচ করে দেন।

আসামী পক্ষ থেকে বলা হয় যে আসামীরা কেউই মীরাটে বাস করে না, বম্বে ও কলকাতাতেই তারা কাজকর্ম করে। তাদের পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ব্যারিস্টার হাইকোর্টের প্র্যাকটিশ ছেড়ে মীরাটে আসবেন না। কলকাতা বা বম্বে থেকে মীরাট অনেক দূর, যাতায়াতের ভাড়া প্রচুর, আসামীদের আত্মীয় বা বন্ধুদের পক্ষে যাওয়া আসা করা ব্যয়সাধ্য ও অসুবিধা।

মীরাট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দীর্ঘ সাত মাস ধরে তথ্যানুসন্ধান চলল এবং ১৪ জানুয়ারি ১৯৩০ সালে আসামীগণকে মীরাটে দায়রা সোপর্দ করা হল। মীরাটের দায়রা জজ আর এল ইয়র্কের আদালতে বিচার আরম্ভ হল। জজসাহেবকে কয়েকজন অ্যাসেসর সাহায্য করবেন। জুরিদের দ্বারা বিচারের জন্য আসামী পক্ষ থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রার্থনা ক। হয়েছিল কিন্তু এত সুদীর্ঘ রাজনীতিক মামলার সাক্ষ্য জুরিদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না এই যুক্তিতে এই প্রার্থনাও প্রধান বিচারপতি নাকচ করে দেন।

আসল কথা এই যে অ্যাসেসরদের কোনো ক্ষমতা নেই, তাদের মতামত গ্রাহ্য করতে বিচারপতি বাধ্য নয়।

দায়রা আদালতে বিচার ওঠবার আগেই ধরমবীর সিংকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ডি আর থিংড়ি ও কিশোরীলাল ঘোষের মৃত্যু হয়।

দায়রা আদালতে মামলা আরম্ভ হতেই সরকার পক্ষের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার কলকাতার ল্যাংফোর্ড জেমস মারা যান। বম্বের ব্যারিস্টার আই কেম্প তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

দায়রা জজ মিঃ ইয়র্ক তাঁর রায় দেন ১৫ জানুয়ারি ১৯:৩ তারিখে ঠিক চার বছর পরে। আসামীরা সকলেই অকপট স্বীকারোক্তি করেছিল এবং মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে জজসাহেব সাতাশ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে কঠোর দণ্ড দেন। পার্টির প্রেসিডেন্ট মজঃফর আমেদকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয় এবং অন্যান্যদের বারো থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত

দ্বীপান্তর এবং চার থেকে ছ বছর পর্যন্ত কঠোর শ্রমসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিন জন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই কঠোর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

আদালতে স্বীকারোক্তি করবার সময় মজঃফর আমেদ বলেন ঃ

আমি একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট। এই মামলা সম্পর্কে আমাকে গ্রেফতার করার দিন পর্যন্ত আমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলুম। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের নীতি, প্রচারপত্র সমূহ এবং কর্মসূচীর প্রতি পার্টি সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান এবং যতদূর সম্ভব পার্টি সেগুলি প্রচার করেছে। আমার ত্রুটি সত্ত্বেও আমি গর্ব করে বলতে পারি যে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আমি একজন পথিকৃৎ।

ডাঙ্গে বলেন ঃ

কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করা এবং ভারতের কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য ডাঙ্গের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা থেকে তিনি ১৯২৭ সালে মুক্তি লাভ করেন এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়মে নির্বাচিত হন। শ্রমিক ও কৃষক পার্টিতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'ক্রান্তি' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং গিরনি কামগর ইউনিয়নের সেক্রেটারি রূপে কাপড় কল ধর্মঘটে তিনি অগ্রণী ছিলেন।

ঘাটে ছিলেন বম্বের লোক। কমিউনিস্ট পার্টিতেও তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর এবং ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টি যে কাউনসিল অফ ওঅর গঠন করেছিলেন তিনি তাঁর সভ্য ছিলেন। ঘাটে আদালতে বলেছিলেন ঃ

নিপীড়িত মানব সম্প্রদায়ের খেটে খাওয়া মানুষদের দ্বারা গঠিত এই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল বোধহয় সর্বাপেক্ষা সুগঠিত সংস্থা ও শক্তির উৎস। এই সকল অবহেলিত মানুষ, কৃষক ও মজদুরদের

উপযোগী নতুন রাজ্য গঠন করতে হলে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটাতে হবে এবং জন-মজদুরদের এই পার্টি তা করতে পারে। যোগলেকার আদালতে বলেন ঃ

আমি গোপন রাখতে চাই না যে আমরা আবার যখন কাজ আরম্ভ করতে পারব তখন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমরা আঘাত হানব।

নিম্বকর একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করেন। তাঁর সেই বিবৃতিটি আসামীগণ কর্তৃক তাঁদের যুক্ত বিবৃতি বলে স্বীকার করেছিলেন। বিবৃতিতে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছিল ঃ

আমরা এক নয়া দুনিয়া স্থাপন করতে চলেছি অতএব প্রচলিত আইনের প্রতি আমাদের কোনোই বিশ্বাস নেই···দুনিয়ার বিপ্লবের জন্য শক্তিশালী সংস্থা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল প্রচারিত সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক কর্মধারায় আমরা বিশ্বাসী।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল বা রাশিয়ার শ্রমজীবীগণ প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি নেই বলতে কি আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব।

মিরজকর তো সোজাসুজি বললেন যে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করাই আমার লক্ষ্য, তাকে আপনারা মহামান্য সম্রাটের সার্বভৌমত্ব হরণ বলুন আর যাই বলুন।

ইংরেজ আসামী স্প্র্যাট, ব্র্যাডলি এবং হাচিনসনও বিবৃতি দিয়েছিল। আদালতকে স্প্র্যাট বলেছিল ঃ

আমার কোনো এক বক্তৃতায় আমি আমাদের উগ্র ও হিংস্র-নীতির উল্লেখ করেছি বলে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন। আমি আমার সেই উক্তি প্রত্যাহার করছি না। আমি স্বীকার করছি যে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হবে।

আসামীদের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির ফল কি হবে তা বোঝাই গিয়েছিল। হাচিনসন ব্যতীত অ্যাসেসরগণ সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বলেন যে মিত্র, দেশাই, ঝাববালা সাইগল, আলভে কাসলে,

গৌরীশংকর এবং কদমের বিরুদ্ধে সরকার কোনো কেস দাঁড় করাতে পারেন নি। পাঁচজনের মধ্যে চারজন অ্যাসেসরের এই হল মত কিন্তু দেশের আইনানুসারে অ্যাসেসরদের মতামত জজসাহেব মানতে বাধ্য নন। জজসাহেব অ্যাসেসরদের সিদ্ধান্ত বাতিল ক'র দিয়ে তিন জন আসামী ব্যতীত সকলকে শাস্তি দেন।

জজসাহেব ৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী রায় দান করেন এবং বিচারাধীন কালে আসামীরা যতদিন জেলে ছিল সেই সময়কাল দণ্ডাদেশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ যার পাঁচ বছর জেল হল তাকে পাঁচ বছরই জেল খাটতে হবে।

আসামীদের এই অভূতপূর্ব দণ্ড, জুরিদের দ্বারা বিচার করতে দিতে এবং জামিন না দিতে আপত্তি দেশে তো বটেই বিদেশেও প্রতিবাদ ও কঠোর সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। ইয়র্কের আর্চ-বিশপ, এইচ জি ওয়েলস, রমাঁ রোলাঁ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, হ্যারল্ড ল্যাসকি প্রমুখ মনীষীগণ তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

পার্লামেন্টে ভারত সচিবকে তো জবাবদিহি করতে নাজেহাল হতে হয়েছিল। ইণ্ডিয়া অফিসে প্রতিবাদ পত্রের স্তূপ জমেছিল, ব্রিটিশ বিচার পদ্ধতির প্রতি অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেছিল।

ল্যাসকি লিখেছিলেন: Meerut trial a grim incident in the history of British India. Men were torn from civil life for long years whose only crime was to carry out the ordinary work of trade union and political agitation after the fashion of everyday life in this country. Not merely socialist opinion in Great Britain recognised that it was a prosecution scandalous in its inception and disgraceful in its continuance ...A government which acts in this fashion indicts itself. It acts in fear, it operates by terror, it is incapable of that magnanimity which is the condition for the exercise of justifiable power.

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক আসামীই এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল

করলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর সা সুলেমান এবং বিচারপতি ডগলাস ইয়ং-এর এজলাসে ২৪ জুলাই ১৯৩৩ তারিখে আপিলের শুনানি আরম্ভ হল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা সমাপ্ত হল ৩ আগস্ট তারিখে। সুখের বিষয় যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ একজন বিচারপতি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আসামী পক্ষের সওয়াল আরম্ভ করেছিলেন কৈলাসনাথ কাটজু এবং অভিযোগকারীর পক্ষে আই কেম্প।

বিচারপতিদ্বয় কাজের সুবিধার জন্য সকল আসামীকে চারটি গ্রুপে ভাগ করেন। প্রথম গ্রুপে বারোজন আসামী যারা প্রত্যেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।

দ্বিতীয় গ্রুপে দুজন ইংরেজ আসামী যারা গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নয়।

তৃতীয় গ্রুপে ছজন আসামী যারা কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নয়।

চতুর্থ গ্রুপে বাকি সাতজন আসামী ছিলেন যারা কমিউনিস্ট নন এবং এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও নন। এই আসামীরা দাবি করেছেন যে তাঁরা রাজনীতিক কর্মী, তাঁরা শ্রমিক ও কৃষক সমিতি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

আদালত বলেন যে প্রথম বারোজন আসামী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। তাঁরা জেনে শুনেই সভ্য হয়েছিলেন। পার্টির রিপোর্ট পড়ে জানা যায় যে জনগণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত এবং বিপ্লব শুরু হলে রাজনীতিক আলোড়নের সৃষ্টি হবে। ঐ রিপোর্ট পাঠ করে আর একটি তথ্য জানা যায় যে কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশানালের কর্মসূচীতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদেরই কেবল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য করা হবে। এই পার্টির মুখ্য কর্মসূচী হল

দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

আসামীরা 'কর্মসূচী' কথাটিতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে এটা তাঁদের 'কর্মসূচী' নয়, লক্ষ্য। কিন্তু আদালত বলেন যে আসামীরা এটা তাঁদের লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং এ বিষয়ে আদালত নিঃসন্দেহ অতএব কর্মসূচীর পরিবর্তে লক্ষ্য শব্দটি বসাবার দরকার নেই।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের কর্মসূচী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যগণ মেনে নিতে বাধ্য আছেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের কর্মসূচীর ভূমিকাতেই বলা হয়েছে যে কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়া শাসন বলপ্রয়োগ করে উৎখাত তারা সমর্থন করে।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের কর্মসূচী নিম্নোক্ত চারটি ভাগে বিভক্ত ঃ

১ ॥ পুঁজিবাদি বেতন ব্যবস্থা ও শাসন

২ ॥ মজদুরদের মুক্তি ও কমিউনিস্ট ভাবধারা

৩ ॥ বুর্জোয়াদের পতন ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রাম

৪ ॥ গণশাসন এবং কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশল

হাইকোর্টের বিচারকদ্বয় নানাদিক থেকে মামলাটি বিচার করেছিলেন। আইনের বিভিন্ন ধারা ; ষড়যন্ত্র, কর্মসূচী, লক্ষ্য ইত্যাদি সব কিছুই তারা বিশেষভাবে বিচার করেছিলেন এবং আসামীদের দণ্ড অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়ে দিয়েছিলেন। বিচার আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই আসামীরা জেলে ছিলেন, তাদের জামিন দেওয়া হয় নি। জেলের এই সময়কালেও বিচারপতিরা দণ্ডভুক্ত করে দিলেন। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কমিয়ে তিন বছর করা হল, যারা বারো বছরের দণ্ড পেয়েছিলেন তাদেরও কমিয়ে তিন বছর করা হল কেবল দুজন বাদে, দশ বছর যাদের সাজা হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে মাত্র এক বছর এবং বাকি কেউ মুক্তি পেল অথবা ইতিমধ্যেই তাদের দণ্ডাদেশ কারাগারে অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

হাইকোর্টের বিচারপতিরা মন্তব্য করেন যে সবদিক বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে নিম্ন আদালত আসামীদের যে দণ্ডবিধান করেছেন তা কঠোর দণ্ড বলতে হবে।

আসামীকে দণ্ড দেবার পূর্বে বিচার করতে হবে যে মানুষকে আগে বিপদ থেকে রক্ষা করা কর্তব্য, অপরাধ বন্ধ করাও সেই সঙ্গে উচিত এবং অপরাধীকে সংশোধন করা। রাজনীতিক অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে আসামীদের অপরাধের তুলনায়, তাদের দণ্ড অতিরিক্ত হচ্ছে কিনা, অতিরিক্ত হলে তাদের অপরাধকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং অপরাধীরাও তাদের মতবাদে ও বিশ্বাসে অধিকতর আস্থা স্থাপন করবে। অতএব বিচারকেরা মনে করেন যে নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করেছে।

প্রসঙ্গত কবির একটি উক্তি মনে পড়ছে ঃ ওদের আঁখি যত রক্ত হবে মোদের আঁখি তত ফুটবে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলেছিল আসামীরা গ্রেপ্তারের সময় থেকে আরম্ভ করে হাইকোর্টের রায় দেওয়া পর্যন্ত সময় ধরলে সাড়ে চার বছর।

মীরাট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা রুজু করা হয় ১৫ মার্চ ১৯২৯ তারিখে। প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান করতে লাগে সাত মাস এবং আসামীদের দায়রা সোপর্দ করা হয় ১৪ জানুয়ারি ১৯৩০ তারিখে।

দায়রা আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে সময় লেগেছিল ১৩ মাসের কিছু বেশি।

আসামীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে লেগেছিল ১০ মাসেরও বেশি। আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দুই মাস এবং দুপক্ষের সওয়াল চলেছিল সাড়ে চার মাস ধরে।

দায়রা আদালতের জজ রায় দিতে সময় নিয়েছিলেন পাঁচ মাস অথচ এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল দাখিল হওয়ার তারিখ থেকে রায় দেওয়া

পর্যন্ত সময় নিয়েছিল সাড়ে চার মাস।

দুই পক্ষের সাক্ষ্য ছাপাতে ২৫ খণ্ড বড় সাইজের বই তৈরি হয়েছিল, সরকারী পক্ষের একজিবিটের সংখ্যা ৩৫০০টি ও সাক্ষীর সংখ্যা ছিল ৩২০ জন।

দায়রা আদালত যে রায় দিয়েছিলেন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৭৬।

বিচার চলাকালে সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার ল্যাংফোর্ড জেমস এবং দুজন আসামী কিশোরীলাল ঘোষ ও ডি আর থিংড়ি মারা যান।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চালাতে সরকার পক্ষে ব্যয় হয়েছিল কুড়ি লক্ষ টাকা যখন সাড়ে তিন টাকা মন দরেও চাল পাওয়া যেত।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এদেশে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করতেই সাহায্য করেছিল। সরকারের দমননীতি ব্যর্থই হয়েছিল।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতে রাজনীতিক মামলার ইতিহাসে কাকোরি একটি অবিস্মরণীয় নাম।

লখনৌ লাইনে কোথায় কোন ছোট একটি রেলস্টেশনের কাছে ট্রেনে একটা ডাকাতি হয়েছিল। ব্রেক ভ্যান থেকে কিছু টাকা লুঠ হয়েছিল, টাকার পরিমাণে সে কালের মূল্যেও বেশি নয় কিন্তু এই ডাকাতি উপলক্ষ্য করে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের মামলা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এত বড় ষড়যন্ত্র মামলা এর আগে আর হয় নি।

কিছু বিপ্লবী ছোকরা একটা ট্রেনে ডাকাতি করেছিল ঠিকই কিন্তু অতি উৎসাহী পুলিস সেই ডাকাতিকে কেন্দ্র করে মামলাটিকে কি পরিমাণ জটিল করেছিল এবং সারা দেশে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এই মামলা তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কাকোরির নাম শোনে নি এমন অনেক লোককে পুলিস গ্রেফতার করত, থানায় ধরে নিয়ে যেত, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো নানা প্রশ্ন করত। কারও কারও ওপর অত্যাচার করত, কাউকে বা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করত, নইলে জেলে পড়ে পচ।

এটা অবিশ্যি ঠিক যে সে সময়ে দেশে বিশেষ করে বাংলায় মাঝে মাঝে রাজনীতিক ডাকাতি হত। যারা বিপ্লবী দল গঠন করেছিল তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করতে হত। উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ ছিল, পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা।

ঐতিহাসিক এই মামলার সূত্রপাত ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট তারিখে। সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে আলিমনগর আর লখনৌ স্টেশনের মাঝে কাকোরিতে এক ট্রেন ডাকাতি হয়। এমন চাঞ্চল্যকর ট্রেন ডাকাতি ইতিপূর্বে বড় একটা হয় নি। ট্রেন যখন কাকোরিতে পৌঁচেছে তখন তিনজন যুবক অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পিছনে ব্রেক ভ্যানের দিকে ছুটে যায়। তারা গার্ড সায়েবের গাড়িতে উঠে রিভলভার ও পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে এবং গার্ডকে ভয় দেখিয়ে ব্রেকভ্যানের সিন্দুক থেকে নগদ ৩৫৪১ টাকা ৩ আনা, ১০১২ টাকার নোট আর ১২৫ টাকা ১ আনার ভাউচার, মোট ৪৬৭৮ টাকা ৪ আনা নিয়ে কেটে পড়ে।

ব্যাপারটা প্রথমে রেল পুলিস নিজেদের হাতে নেয় কিন্তু প্রাথমিক অনুসন্ধানেই বোধহয় বোঝা যায় যে এই ডাকাতির তদন্ত করা রেল পুলিসের সাধ্য নয়, এটি সাধারণ ডাকাতি নয়, একদল শিক্ষিত যুবক এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত, তখন সি আই ডি-কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়।

এখন যার নাম উত্তর প্রদেশ তখন তার নাম ছিল যুক্ত প্রদেশ, সেই যুক্ত প্রদেশ সি আই ডি পুলিসে তখন হর্টন নামে একজন ধুরন্ধর অফিসার ছিল। তদন্তের ভার তার ওপরেই দেওয়া হল। পূর্ব বছর যুক্ত প্রদেশে কয়েকটা ডাকাতি হয়েছিল। সেগুলি সাধারণ ডাকাতি নয় বা সাধারণ ডাকাতরাও সেগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল না। পুলিসের সন্দেহ কিছু শিক্ষিত যুবক এই ডাকাতিগুলি করছে কিন্তু কাউকে পুলিস ধরতে পারে নি। অনুমান যে তিনটি ডাকাতির সঙ্গে শিক্ষিত এবং পুলিসের সন্দেহভাজন কিছু যুবক ডাকাতদের দলে থাকতে পারে।

ডাকাতি যারাই করে থাকুক এবং যে ধরনের ডাকাতি হোক না কেন ঐ তিনটি ডাকাতির বিষয় জানতে পারলে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমি কিছু জানা যেতে পারে।

যুক্ত প্রদেশের পিলিভিত জেলায় বামরাউলি গ্রামে বলদেও প্রসাদ

নামে এক স্বচ্ছল ব্রাহ্মণেব বাড়ি প্রথম ডাকাতিটি হয়। প্রায় ২০ জন ডাকাত বলদেও প্রসাদের বাড়িতে চড়াও হয়। সোনার গহনা ও নগদে ডাকাতবা চার হাজার টাকা লুট করে তারমধ্যে নগদ ছিল ১৬০০ টাকা। ডাকাতবা গুলি করে একজনকে হত্যা করে আর জখম হয় ছ জন।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় একজন আসামী ছিল তার নাম ছিল বৌশন সিং। গ্রামবাসীবা বলে যে এই রৌশন সিং ডাকাতদলে ছিল। পুলিস অনুসন্ধান কবে জেনেছিল যে বৌশন সিং সেই দিন রামবাউলি গ্রামে উপস্থিত ছিল। স্থানীয় ছু দল ঠাকুরদের মধ্যে শত্রুতা চলছিল। রৌশন সিং এই ব্যাপাবেও জড়িত ছিল।

পুলিস সন্দেহক্রমে কিছু লোককে গ্রেফতার কবে আদালতে অভিযুক্ত কবে কিন্তু প্রমাণ অভাবে বিচাবক তাদের সকলকে মুক্তি দেন।

১০ মার্চ ১৯২৫ তাবিখে পিলিভিত জেলাতেই বিচপুব গ্রামে আর একটি ডাকাতি হয়। বাড়ির মালিকের নাম টোটি কুরমি। এখানেও একজন লোক নিহত হয়। পুলিস তিনটি বুলেট পেয়ে ছিল কিন্তু এই ডাকাতি সম্পর্কে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি।

ঐ বছবেই ২৫ মে তাবিখে প্রতাপগড় জেলায় দ্বারকাপুর গ্রামে শিউবতন বেনিয়াব বাড়িতে ডাকাতি হয়। প্রায় ন দশজন ডাকাত শিউরতনের বাড়ি চড়াও হয়ে তাকে ও তার স্ত্রীকে প্রহার করে এবং ছু হাজার টাকাব সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

ডাকাতদেব গুলিতে এখানেও একজন নিহত হয় এবং কয়েকজন জখম হয়। ডাকাতরা চলে যাবার পর একটি গুলিভরা রিভলভার এবং মাটি খোঁড়ার একটি যন্ত্র শিউরতনের বাড়িতে পাওয়া যায়।

পুলিস ডাকাতদের ধরতে পারে নি কিন্তু গ্রামবাসীরা বলেছিল যে ডাকাতদলের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক আছে।

তিনটে ডাকাতিতেই পুলিশ আসল আসামীদের গ্রেফতার করতে পারে

নি তবে তারা এইটুকু অনুমান করেছিল যে ডাকাতদলের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক আছে। কাকোরি ট্রেন ডাকাতির পর পুলিসের সেই অনুমান বদ্ধমূল হল। প্রাথমিক তদন্তেই জানা গেল এরা সাধারণ দস্যু নয়।

হর্টন সন্দেহ করল যে এরা শুধু লেখাপড়া জানা যুবক নয়, এরা বিপ্লবী। যুক্ত প্রদেশে বিপ্লবী বলে যাদের সন্দেহ করা হত—হর্টন তাদের সকলকে চিনত।

তাদের চিনলেও কাকোরি ট্রেন ডাকাতির অভিযোগে পুলিস কাউকে গ্রেফতার করতে পারছে না। নাম জানলেই তো হবে না, প্রমাণ চাই। আগের তিনটে ডাকাতিতে পুলিস কারও বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করে কেস দাঁড় করাতে পারে নি।

পুলিস ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল। যারা ট্রেন ডাকাতি করেছে তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে পুলিস পুরস্কার দেবে। পুলিস হয়তো ভেবেছিল মোটা টাকার লোভে দলের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেবে।

পুলিসের অনুমান কাকোরি ট্রেন ডাকাতির সঙ্গে রাজেন লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, এস এন বকসি এবং মন্মথনাথ গুপ্ত সেদিন ৯ আগস্ট বেনারসে ছিল না। বেনারস তখন ছিল দলের কেন্দ্র। বেনারসে অনুপস্থিত মানেই যে তারা কাকোরিতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল তার প্রমাণ কোথায়?

পুলিস বিপ্লবীদের নাম জানল কি করে?

দলে স্কুলের একজন ছাত্র ছিল। ইন্দুভূষণ মিত্র। বিপ্লবীরা পরস্পরকে যেসব চিঠি লিখত সেগুলি তারা ইন্দুর কাছে পাঠাত। ইন্দু সেগুলি রামপ্রসাদের কাছে পাঠিয়ে দিত।

এই চিঠি দেওয়া-নেওয়ার ভেতর ইন্দুর অজ্ঞাতে একটা কাণ্ড ঘটে যেত। ইন্দুর স্কুলের মুসলমান হেডমাস্টার চিঠিগুলি নকল করে পুলিসের হাতে তুলে দিত। এই সূত্রে পুলিস বিপ্লবীদের নাম জানতে পারত এবং তাদের ওপর নজর রাখত।

ঐ চিঠির সূত্রে একবার পুলিস জানতে পেরেছিল যে বিপ্লবীরা শীঘ্রই মীরাটে মিলিত হবে কিন্তু কোনো কারণে নির্ধারিত তারিখে মীরাটে মিটিং হয় নি। তবে তখনও পুলিস জানত না যে বারানসীর বিপ্লবীরা বিরাট একটা দল তৈরি করেছে। সেটা তারা জানতে পেরেছিল বিপ্লবীদের গ্রেফতারের সময়। যোগেশ চ্যাটার্জি এবং মন্মথ গুপ্তের বাড়িতে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব তারা টের পায়। সারা যুক্তপ্রদেশ জুড়ে বিরাট একটা বিপ্লবী দল তৈরি হয়েছে এবং বেনারস তাদের কেন্দ্র এটা পুলিস জানতে পারে। ডাকাতির সময় ডাকাতদের চালচলন ও কথাবার্তা এবং ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র থেকে পুলিসের ধারণা দৃঢ় হয়। তারা বুঝতে পারে সকল ডাকাতিগুলিই বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

ইন্দুভূষণ মিত্রের সূত্রে সাংকেতিক ভাষায় পাওয়া একখানি চিঠি থেকে পুলিস অনুমান করে যে বিপ্লবীরা শীঘ্রই কনখলে একটা ডাকাতি করবে।

কিন্তু কেন এই ডাকাতি ?

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মন্মথনাথ গুপ্ত এ বিষয় লিখেছেন ঃ কয়েক মাসের মধ্যেই পার্টি বিরাট এক দল হয়ে উঠল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি. বেনারসে যার গোড়াপত্তন, বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যার নেতা) কিন্তু দলকে চালু রাখতে হলে অর্থের প্রয়োজন। বিপ্লবীরা এবং যারা দলের জন্যে দিনরাত্রি পরিশ্রম করছে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে টাকা চাই, কিন্তু টাকা কোথায় ?

যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি নিজে রান্না করে খেতেন, নিজেই নিজের বাসন মাজতেন। চন্দ্রশেখর আজাদ তো প্রায় অভুক্তই থাকতেন। শচীন বকসি কোথা থেকে কিছু পয়সা যোগাড় করত, রবীন্দ্রমোহন কর ছাতু খেতেন। মুকুন্দিলালের অবস্থাও সুবিধের নয়। বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেও আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নি কিন্তু আমার মতো ভাগ্যবান তো সবাই নয়।

সৌভাগ্যক্রমে তখন কাশীতে কিছু অন্নসত্র ছিল। যেখানে বিনা পয়সায় খেতে পাওয়া যেত। কিছু কর্মি অন্নসত্রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত কিন্তু সব কর্মীই তো আর কাশীতে থাকত না। অন্য শহরেও তো কর্মী ছিল।

বিপ্লবীরা দলের মুখ চেয়ে বসে থাকতে আগ্রহী নয়। ঠিকে কাজকর্ম যোগাড় করবার চেষ্টা করত কিন্তু কাজ কোথায়? তাও পাওয়া ছিল কঠিন। বিপ্লবীদের জীবন ছিল সাধুর মতো। নিজের জন্যে কিছু চাইবে না। পুবাকালে ধর্মের আকর্ষণে মানুষ যেমন দেবমন্দিরে আশ্রয় নিত, যুবকেরাও তেমনি বিপ্লবের আকর্ষণে দলে যোগদান করত। বিপ্লব করব, দেশ স্বাধীন করব, এই ছিল তাদের মন্ত্র।

দলের কর্মী ছাড়াও দলকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেও তো অর্থের প্রয়োজন। কর্মীদের যাতায়াতের খরচ, কিছু বই কেনা, কিছু প্রচার কাজ চালানো, ছাপাখানার খরচ, এসব তো আছেই কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যয় হল অস্ত্রসংগ্রহ।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি বিপ্লবীদের রিভলভার, রাইফেল, দান করত কিন্তু এখন তো কোনো যুদ্ধ চলছে না। অস্ত্র না কিনলে কে দেবে?

চাঁদা কিছু আদায় হত সভ্যদের কাছ থেকে কিন্তু তা যৎসামান্য বই কিনতে কুলোত না। অথচ বই কেনা খুবই দরকার।

শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ওপর শিবপ্রসাদ গুপ্তর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং দলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। শচীন সান্যাল তাঁর কাছে হাত পাতলেই তিনি ৫০০ টাকা করে দিতেন। কোনো প্রশ্ন করতেন না, হিসেবও চাইতেন না। রসিদ চাওয়ার তো প্রশ্নই নেই।

আরও কেউ কেউ মাঝে মাঝে টাকা দিতেন কিন্তু দলের খরচ চালাতে সে টাকা মোটেই যথেষ্ট ছিল না।

অতএব প্রস্তাব করা হল যে আইরিশ বিদ্রোহীদের মতো

'ফোর্সড কন্ট্রিবিউশন' ব্যবস্থা চালু করা হোক। বাংলার বিপ্লবীরা এই ফোর্সড কন্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা আগেই চালু করেছিল। আইরিশ বিদ্রোহীরা তো এই পদ্ধতি দ্বারা টাকা তুলত। রাশিয়াতে লেনিনের বলশেভিক পার্টি ভয় দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ করত তবে নিশ্চয় ধনীদের কাছ থেকে। শোনা যায় বাকুর কাছে কোনো স্থানে স্টালিন স্বয়ং ডাকাতি করে টাকা তুলেছিলেন।

ফোর্সড কন্ট্রিবিউশন কথাটির সোজা কথায় অর্থ হল ডাকাতি। বাংলায় যারা এইভাবে টাকা তুলত তাদের বলা হত স্বদেশী ডাকাত। পার্টির চরম দুর্দশার মুখে এই প্রস্তাব গৃহীত হল।

প্রস্তাব নিলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো যায় না। তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। আমাদের কারও অভিজ্ঞতা নেই। সৌভাগ্যক্রমে দলের যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জির এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। অতএব প্রথম ডাকাতি করার ভার তার ওপরেই দেওয়া হল। দলের ভিতরই কিছু যুবককে বেছে নিয়ে একটা এফ, সি, পার্টি তৈরি হল।

প্রথম ডাকাতির জন্যে আমার ও আমার বন্ধু রবীন্দ্রমোহন করের ডাক পড়লো। আমাদের ওপর আদেশ হল কোনো এক দিন মোগলসরাইয়ে এক বিশেষ ট্রেনে উঠব এবং খাগা স্টেশনে নামব। ফতেপুর জেলায় কোনো একটি গ্রামে ডাকাতি করা হবে। আমরা এর বেশি কিছু আর জানি না। খাগায় পৌঁছে কোথায় যাব, কি করব কিছুই জানি না। আদেশ পালন করাই আমাদের কাজ।

বারাণসী থেকে আমাদের দুজনেরই ডাক পড়েছিল। আর কোথা থেকে কে আসবে বা কি করবে জানি না। রবীন্দ্রমোহন একটা কাজের সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি। সে ধরে নিয়েছে যে এই কাজে তার মৃত্যু হবে। আনন্দে সে গাইতে আরম্ভ করল 'মরণরে' তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।' 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য আমার একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ দ্রুত শেষ করে যাত্রার পূর্বে ডাকে দিলুম। কে জানে

যদি না ফিরি। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হলে কত ভাল কাজ করতে পারতুম কিন্তু আমাদের এখন বাধ্য হয়ে একটা খারপ কাজ করতে যেতে হচ্ছে, আমি এই কথা রবিকে বললুম এবং আমার মনে হয় সেদিন যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদেব যারা খাগা স্টেশনে আসছিল তারা সকলেই এই কথা ভাবছিল।

খাগা স্টেশনে নামতেই আমরা আমাদের পরিচিত একটি হাসি মুখের দেখা পেলুম। কোনো কথা নয়। ইসারায় তিনি আমাদের অনুসরণ করতে বললেন। একজন স্থানীয় ব্যক্তি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমরা হাঁটছি তো হাঁটছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। মাঝে মাঝে বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়েও হেঁটে যাচ্ছি। একবার তো আমাদের ঝোপের আড়ালে লুকোতে হল। তখন অবিশ্যি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

তখন এই অঞ্চলে অনেক জায়গায় ডাকাতি হচ্ছিল। ডাকাতি দমন করবার জন্যে একটি স্পেশাল পুলিস গার্ড বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল ডাকাত ধরবার জন্যে তারা প্রকাশ্যে বড় রাস্তা দিয়ে লেফট রাইট করে এবং ভারি বুটের ধপ ধপ শব্দ করতে করতে মার্চ করে যেত।

সেই আওয়াজ পেয়ে সাধারণ ডাকাতরা সাবধান হয়ে যেত। আমরাও পুলিসের বুটের আওয়াজ শুনে লুকিয়ে পড়লুম। অতএব স্পেশাল গার্ড বাহিনী ডাকাত ধরতে পারত না। তবুও নাকি পুলিস কয়েকজন ডাকাত ধরে ফেলেছিল। মনে হয় সেই ডাকাতেরা পুলিসের চেয়েও মূর্খ ছিল।

আমরা একটা আমবাগানে পৌঁছলুম। এখানে আমাদের থামতে বলা হল। সেখানে মোট-পুঁটলি খোলবার আদেশ দেওয়া হল। আমার আর রবির সঙ্গে কোনো মোট ছিল না। অন্য কয়েক জনের সঙ্গে বেডিং ছিল। তারা বেডিং খুলতে ভেতর থেকে রাইফেল এবং রিভলভার বেরিয়ে পড়ল।

দলপতি ছিলেন যোগেশ চ্যাটার্জি। তিনি আমাদের অস্ত্র বিতরণ করে

দিয়ে বললেন যে আধ মাইল দূরে এক গ্রামে একজন অর্থ-পিশাচ মহাজন আছে। তারই বাড়িতে ডাকাতি করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্বন্ধে তিনি যথার্থ নির্দেশ দিলেন।

ভদ্রলোক সেজে ডাকাতি করা চলবে না। আমরা গ্রামবাসীদের মতো যথাসম্ভব ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। মাথা ও দাড়ি ঘিরে বেশ মজবুত করে পাগড়ি বাঁধলুম যাতে আমাদের মুখ অনেকটা ঢাকা পড়ে গেল। এরদ্বারা ডাকাতদের চিনতেও অসুবিধে হবে।

আমরা প্রত্যেকে পায়ে টাইট জুতো পরলুম যাতে পালাবার সময় কারও পা থেকে জুতো খুলে না যায় বা জুতো ফেলে পালিয়ে আসতে না হয়। জুতো ফেলে আসা মানে একটি সূত্র রেখে আসা।

আমাদের বলে দেওয়া হল আমরা যেন দেহাতি হিন্দিতে কথাবার্তা বলি, ভুলেও যেন ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ না করি। সোজা কথায় আমরা যেন এমন অভিনয় করি যাতে গ্রামবাসীরা আমাদের সাধারণ ডাকাত মনে করে, ভদ্র বা স্বদেশী ডাকাত বলে সন্দেহ করতে না পারে।

আমাদের সঙ্গে দুটো রাইফেল, বেশ কয়েকটা রিভলভার ও পিস্তল ছিল। আমি আগ্নেয়াস্ত্র পাই নি তবে আমাকে একটা ছোট তলোয়ার দেওয়া হয়েছিল। কারও কারও কাছে ধারালো নেপালী কুকরি ছিল।

আমরা যখন যাত্রা করতে উদ্যত হঠাৎ একটা বুলেটের আওয়াজে আমরা সবাই চমকে উঠলুম। পুলিস নাকি? আমরা সবাই মাটিতে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম।

পায়ের শব্দ পেলুম। অন্ধকারে একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি আমার তলোয়ারটা জোরে টিপে ধরলুম। কিন্তু লোকটি আমাদের পরিচিত। দলেরই একজন। আমরা সকলে উঠে পড়লুম। আমাদের দলপতি তাকে প্রশ্ন করলেন কি ব্যাপার?

লোকটিকে ভীষণ নার্ভাস মনে হল। রিভলভার হাতে পেয়ে

এবং আসন্ন অভিযানের উত্তেজনায় সে রিভলভারের ট্রিগার এত জোরে ধরেছিল যে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যায়।

ঐ একটি গুলির আওয়াজেই আমাদের সেদিনের অভিযান ব্যর্থ হল। সেদিনের ডাকাতি পরিত্যক্ত হল। কারণ গুলির আওয়াজ গ্রামের লোকেরাও শুনেছিল। তারা হাতে লাঠি সড়কি বল্লম ও লণ্ঠন নিয়ে ডাকাত খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে।

আমাদের সেই পথ প্রদর্শক একটু ঘুরে দেখে এসে রিপোর্ট করল গ্রামবাসীরা প্রস্তুত। আজ ডাকাতি করা নিরাপদ নয়। আমরা সকলে হতাশ হলুম। তাছাড়া যাতায়াত বাবদ কিছু টাকা মিছামিছি খরচ হয়ে গেল।

প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলেও কয়েকটি এফ সি পার্টি গঠিত হল এবং কাজও চলতে থাকল। ইতিমধ্যে যোগেশ চ্যাটার্জি পুলিসের হাতে গ্রেফতার হল। পুলিস তার দেহ সার্চ করে একটি মূল্যবান তথ্য পেল। তেইশটি স্থানে আমাদের কর্মকেন্দ্রের একটি তালিকা পুলিসের হস্তগত হল।

যোগেশ চ্যাটার্জির পব 'এফ সি' দলনেতা নির্বাচিত হল রাম-প্রসাদ বিসমিল। ফোর্সড কন্ট্রিবিউশন বা 'এফ সি' শব্দটা আমাদের পছন্দ ছিল না। আমরা নতুন শব্দ তৈরি করলুম। আমরা এফ সি না বলে বলতে আরম্ভ করলুম 'জ্ঞান'। দলের লোকেদের পদাধিকার অনুসারে ভক্ত, জ্ঞানী বা অবধূত বলে ডাকা হত। আমি একজন অবধূত ছিলুম। দলনেতাকে বলা হত পরমহংস।

একবার আমরা পুলিস সেজে ডাকাতি করেছিলুম। রামপ্রসাদ ছিল খুব ফর্সা। সে নিল ইংরেজ ইনস্পেক্টরের ছদ্মবেশ। মহাবীর সিং-এর দাড়ি ছিল। সে সাজল সাব-ইনস্পেক্টর আর বাকি সবাই কনস্টেবল।

আমরা একটা বড় বাড়ির কাছে যেতেই বাড়ির লোকজন পুলিস দেখেই বড় দরজা খুলে দিল। আমরা বললুম যে আমরা বাড়ি সার্চ করতে

এসেছি।

সার্চ করবার ছল করে আমরা কিছু টাকা, অলংকার এবং কিছু দামী সামগ্রী সংগ্রহ করলুম। বাড়ির লোকজন আমাদের সন্দেহ করে নি কিন্তু আমরা যখন বমাল চলে আসছি তখন তারা আমাদের সন্দেহ করে। যাই হোক শেষপর্যন্ত আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছিলুম তবে বেশ কিছু মালপত্র ফেলে আসতে হয়েছিল।

এইভাবে ডাকাতি করে এবং শিবপ্রসাদ গুপ্তর মতো ধনী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তির বদান্যতায় আমাদের খরচ কোনোমতে চলছিল।

রামপ্রসাদ নিঃসন্দেহে সাহসী কর্মী ছিল কিন্তু তার সাংগঠনিক ক্ষমতা কিছু দুর্বল ছিল।

শেষপর্যন্ত সাব্যস্ত হল যে গ্রামে আর ডাকাতি করা নয়। এবার ব্যাংক বা সরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদের লক্ষ্য হবে। তদনুসারে কাকোরির কাছে আমরা ট্রেন ডাকাতি করলুম।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল।

কলকাতায় চৌরঙ্গিতে পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টকে চিনতে ভুল করে কিলবার্ন কম্পানির সায়েব আর্নস্ট .ড কে গোপীনাথ সাহা গুলি করে হত্যা করল। গোপীনাথ ধরা পড়েছিল এবং তার ফাঁসিও হয়েছিল।

এই ঘটনার পরে সারা দেশে এক অর্ডিনান্স জারি হল যার ফলে পুলিস যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবে। এই অর্ডিনান্সের জোরে যোগেশ চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করা হল। দেওয়ালে পোস্টার সাঁটবার সময় রবিও গ্রেফতার হল।

ওদিকে হর্টন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের একটা তালিকা তৈরি করেছে। কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে। ট্রেনেও ডাকাতি হল। আসল লোকদের পুলিস এখনও গ্রেফতার করতে পারে নি। দেশে অর্ডিনান্স

জারি হয়েছে, এখন আর গ্রেফতার করতে কোনো অসুবিধে নেই। পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে হর্টন গ্রেফতারি পরোয়ানা বার করে নিয়ে, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ তারিখে ভোর রাত্রে বেনারস, কানপুর, এলাহাবাদ, লখনৌ প্রমুখ যুক্তপ্রদেশের শহরে গ্রেফতারি আরম্ভ করল।

সেদিন শেষ রাত্রে গ্রেফতার হল রামপ্রসাদ বিসমিল, রামদুলারি ত্রিবেদী, বিষ্ণুশরণ ডুবলিস, ডি এন চৌধুরী, রোশন সিং, মন্মথনাথ গুপ্ত, দামোদরস্বরূপ শেঠ, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বনারসী লাল, মুকুন্দিলাল, জ্যোতিশংকর দিক্ষিত এবং বীরবাহাদুর ত্রিবেদী। আসফাকউল্লা, এস এন বকসি এবং চন্দ্রশেখর আজাদের নামেও গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল কিন্তু পুলিস তাদের পায় নি।

এই সঙ্গে কিছু কংগ্রেসী নেতাও গ্রেফতার হয়েছিল। বিপ্লবীদের সকলের হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিপ্লবীদের গ্রেফতারের খবর কংগ্রেস নেতা গনেশশংকর বিদ্যার্থি সম্পাদিত প্রতাপ (কানপুর) কাগজ ফলাও করে ব্যানার হেড লাইন দিয়ে ছেপেছিল : দেশ কি নবরত্ন গিরফতার।

গ্রেফতার হওয়ার সাতদিনের মধ্যে বনারসীলাল অ্যাপ্রুভার হয়ে যায়। তার কাছ থেকে পুলিস কাকোরি ট্রেন ডাকাতির কোনো খবর না পেলেও অন্যান্য অনেক খবর পেয়েছিল। ট্রেন ডাকাতির দলে বনারসী ছিল না কিন্তু গ্রামে কয়েকটি ডাকাতিতে সে অংশগ্রহণ করেছিল।

বনারসীর মারফত খবর পেয়ে পুলিস রামনাথ পাণ্ডে, ইন্দুভূষণ মিত্র, রামকুমার সিং, শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বনওয়ারি লাল, হরগোবিন্দ, প্রেমকিশোর খান্না, প্রণবেশকুমার চ্যাটার্জি এবং রামকিষণ ক্ষেত্রীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ইন্দু মিত্র পরে রাজসাক্ষী হয়েছিল। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় ও লখনৌএ তাদের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয় :—

(১) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। শচীন্দ্রনাথ তখন রাজদ্রোহিতার অপরাধে বাঁকুড়ায় জেল খাটছে (২) যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, ১৯২৪-এর অর্ডিনান্স বলে তাকে তখন ডেটিনিউ হিসেবে আটক করে রাখা হয়েছে। (৩) ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, অন্য একটি মামলার জন্যে তাকে এলাহাবাদে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং (৪) রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। রাজেন্দ্রনাথও দক্ষিণেশ্বরে বোমাব কারখানায় ধরা পড়ে জেল খাটছিল।

গ্রেফতার করে এদের সকলকে লখনৌয়ে আনা হয়েছিল। হর্টন সায়েব কিন্তু তখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। হর্টন জানতে পারে যে বিপ্লবীরা দল গঠন করে দেশজুড়ে বিপ্লব প্রচার করেছিল এবং দলের খরচ চালাবার জন্যে ডাকাতি কবে টাকা তুলছিল। চারটি ডাকাতি লক্ষ্য করে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার উৎপত্তি হল।

বনারসীলাল আর ইন্দুভূষণ মিত্র আগেই তো রাজসাক্ষী হয়েছিল। আর একজন স্বীকারোক্তি করল। তার নাম বনওয়ারিলাল। পরে সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছিল।

উপরোক্ত তিনজনের স্বীকারোক্তি, যোগেশ চ্যাটার্জির কাছ থেকে পাওয়া বিপ্লব কেন্দ্রের তালিকা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিম্নোক্ত ২১ জনের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ সম্রাটকে ভারত থেকে উচ্ছেদ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হল। উপরোক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের বলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আইনুদ্দিন সকল আসামীকে দায়রা সোপর্দ করল :

১। বনওয়ারিলাল ওরফে 'তারা সিং' ওরফে 'রামদেওয়ান সিং'।

২। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

৩। গোবিন্দচন্দ্র কর ওরফে 'ডিন এন চৌধুরী'।

৪। হরগোবিন্দ।

৫। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি ওরফে 'রায়' ওরফে 'প্রফুল্লচন্দ্র রায়' ওরফে 'রায় মহাশয়'।

৬। মুকুন্দিলাল ওরফে 'মহারাজ ।

৭। মন্মথনাথ গুপ্ত ওরফে 'নবাব 'নবাবসাহেব'।

৮। প্রণবেশকুমার চ্যাটার্জি।

৯। প্রেমকিষণ খান্না।

১০। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ওরফে 'নিতাই' 'নিতাইচাঁদ' 'নিতাই মামা' 'চারু' 'যুগলকিশোব দিক্ষিত', 'মথুরা' 'মথুবাপ্রসাদ' 'জবাহিরলাল', 'কাশীনাথ বাজপেয়ি' কে পি শ্রীবাস্তব।

১১। রাজকুমার সিংহ।

১২। রামতুলারি ত্রিবেদী।

১৩। রামকৃষণ ক্ষেত্রী ওরফে 'নরীন্দ্র' 'গঙ্গারাম' ':গোবিন্দ প্রকাশ'।

১৪। রামনাথ পাণ্ডে।

১৫। রামপ্রসাদ বিসমিল ওরফে 'আনন্দ প্রকাশ 'রুদ্র' 'রাম, 'পরমহংস', 'মাস্টারমহাশয়' এবং 'মোহন্ত ।

১৬। রৌশন সিং।

১৭। শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

১৮। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

১৯। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

২০। বিষ্ণুশরণ ডুবলিস

২১। দামোদর স্বরূপ শেঠ ওরফে 'লালাজী'।

মহামান্য সম্রাটকে ভারত থেকে উচ্ছেদ করতে আসামীরা এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তদুদ্দেশ্যে তারা ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করত। উপরোক্ত সকলেব বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হল। এছাড়া রৌশন সিং, মন্মথ গুপ্ত, রামপ্রসাদ, রাম-কিষণ ক্ষেত্রী, রাজকুমার সিংহ, বনওয়ারিলাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মুকুন্দিলাল, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দামোদব স্বরূপ, রাজকুমার সিংহ, প্রেমকিষণ খান্না, গোবিন্দ কর এবং হরগোবিন্দর নামে বামরৌলি বিচপুরি বা কাকোরিতে ডাকাতি করাব জন্যে ইণ্ডিয়ান পেনাল

কোডের ৩৯৬ ধারা অনুসারে ডাকাতি ও নরহত্যারও অভিযোগ আনা হল।

সন্দেহভাজনদের মধ্যে আসফাকউল্লা খাঁ ওরফে 'কুনওয়ারজি' 'বার্সি' 'কৃষন' এবং শচীন্দ্রনাথ বকসি ওরফে 'বদ্রী' 'কানাইয়ালাল' 'বাগচী'কে কেস চলার সময় গ্রেফতার করা হয়েছিল।

কেবল চন্দ্রশেখর আজাদ ওরফে 'কুইকসিলভার'-এর কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় নি।

পুলিসের মতে ১৯২৩ সালে বাংলা থেকে বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জির এলাহাবাদে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটকে উচ্ছেদ করা ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি এলাহাবাদে এসে বই বা পুস্তিকা প্রচার করে বিপ্লবী যুবক সংগ্রহ করতে ও কেন্দ্র স্থাপন করতে সচেষ্ট হয় এবং সারা উত্তর ভারত জুড়ে একটা বিপ্লবী দল গঠনও করে।

এই সময়ে বনওয়ারিলাল, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং রাজেন লাহিড়ী চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগদান করে। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে যোগেশ চ্যাটার্জি সতীশচন্দ্র সিংহ নামে আর একজন বাঙালী বিপ্লবীকে সঙ্গে নিয়ে দল বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা বেনারসে আসে। বেনারসে ওরা ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছিল এবং তাদের বিপ্লবী দলের জন্যে অনেক যুবককে দলভুক্ত করে।

বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগেশ চ্যাটার্জি বেনারস থেকে এলাহাবাদ ও অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে যেত তাছাড়া যেখানে যেখানে দলগঠন করেছিল সেগুলির কাজকর্ম তদারক করাও তার উদ্দেশ্য ছিল।

বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, যিনি জাপানে নির্বাসিত, তাঁর অন্যতম প্রধান সহকারী ও বন্দীজীবনের লেখক শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে চ্যাটার্জির দেখা হয়। রাজেন লাহিড়ী ও বনওয়ারিকে নতুন সাংগঠনিক কাজের ভার দেওয়া হয়।

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন কানপুরে ছিলেন। সুরেশের সহযোগিতায় যোগেশ কানপুরের দলটিকে মজবুত করে গড়ে তোলেন। সুরেশ ছিলেন কানপুর 'প্রতাপ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

কানপুর থেকে যোগেশ আসেন ঝাঁসিতে। ঝাঁসির দলের ভার দেওয়া হয় এস, এন. বকসির ওপর। ঝাঁসি থেকে সাজাহানপুর। তখন বর্ষা নেমে গেছে। সঙ্গে ছিল রামদুলারি। দু জনে ওঠে রামপ্রসাদের বাড়ি। এই বাড়িতেই আসফাকউল্লা যোগেশের সঙ্গে বরানসীর পরিচয় করিয়ে দেয়। সাজাহানপুরের সংগঠনিক কাজের ভার দেওয়া হয় রামপ্রসাদের ওপর এবং আসফাফউল্লা হবে তার সহকারী। আরও ঠিক হল যে ইন্দুভূষণ মিত্র বিপ্লবীদেব মধ্যে লেটারবক্সের কাজ করবে। রামদুলারির বন্ধু আর একজন বিপ্লবী রৌশন সিং গোপীমোহনকে দলে নিয়ে আসে।
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক বিপ্লবী কাউনসিলের মিটিং-এ যোগদানেব উদ্দেশ্যে যোগেশ আবার কানপুরে আসে। এতদিনে যোগেশের উদ্দেশ্য বোধহয় সিদ্ধ হয়। যুক্ত প্রদেশে সাংগঠনিক কাজ সম্পূর্ণ করে যোগেশ ১৯২৪ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতা ফিরে যায়।
যোগেশ চ্যাটার্জি যখন গ্রেফতার হয় তখন ৩ অক্টোবর তারিখে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক বিপ্লবী কাউনসিলের মিটিংএর একটি বিবরণী তার সঙ্গে পাওয়া যায়। এই কাগজখানি থেকে জানা যায় যে বেনারস, এলাহাবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, লখনৌ ফতেপুর, মৈনপুরী, জৌনপুর, ঝাঁসি, হামিরপুর, ফরক্কাবাদ, এটোয়া, আগ্রা, আলিগড়, মথুরা, বুলন্দসর, মীরাট, দিল্লি, এটা, বেরিলি, পিলিভিট, সাজাহানপুর এবং মজঃফরনগরে জেলাভিত্তিক সাংগঠনিক কর্মীরা বিপ্লবের কাজ করছে, তারও একটা তালিকা পাওয়া যায় যথা—
১। বেনারস ঃ—মির্জাপুর, গাজিপুর বালিয়া, জৌনপুর, আজমগড়,

বস্তি, গোরখপুর এবং রাই বেরিলি।

২। ঝাঁসি ঃ—বান্দা

৩। কানপুর ঃ—রাই বেরিলি, গোরখপুর এবং উনাও।

৪। আলিগড় ঃ—অনুপসহব।

৫। মীরাট ঃ—সাজাহানপুর, ডেরাডুন, আলমোরা, বিজনর, বুদাউন এবং মোরাদাবাদ।

৬। সাজাহানপুর ঃ—নাইনিতাল, গাড়োয়াল, লখিমপুর, সীতাপুর এবং হরদই।

৭। ফৈজাবাদ ঃ—এই বিভাগে ফৈজাবাদ, বড়বাঁকি এবং সুলতানপুরের জন্যে তখনও কোনো লোক নিয়োগ করা যায় নি। যোগ্য লোক অনুসন্ধান করা হচ্ছিল।

কানপুরের উক্ত মিটিং-এ আরও স্থির হয় যে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে নিম্নলিখিতভাবে প্রচারকার্য চালাতে হবে ঃ—

ক। সি আই ডি-এর কর্মকলাপের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাতে হবে।

খ। দমনমূলক আইন ও বিধানের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালাতে হবে।

গ। কংগ্রেসের যেসব কাজ বিপ্লবীদের কাজে বাধা দিতে পারে সেগুলির সমালোচনা করতে হবে।

ঘ। বিপ্লবী আদর্শ ও কমিউনিস্ট নীতি প্রচার করতে হবে।

ঙ। প্রকাশনার জন্যে কাহিনী ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে হবে।

অর্থ সংগ্রহের জন্যও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে প্রভিনসিয়াল কাউনসিলের তদারক সাপেক্ষে ২, ৪ এবং ৬ নং বিভাগকে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আপাততঃ দুটি বিভাগের ওপর কাজের ভার দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীকেই বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে বিপ্লবী

অ্যাসোসিয়েশনের (বিরাট এই বিপ্লবীদলের নাম দেওয়া হয়েছিল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে এইচ আর এ) সমস্ত কাজকর্ম যেন কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়।

জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয় যে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ক্লাব ও সমিতিগুলিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করে এবং আসোসিয়েশনের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করে, গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের সহানুভূতিলাভের জন্য কর্মীরা যেন গ্রামে ও কারখানা অঞ্চলে গিয়ে গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। সাধারণ কর্মীদের যেন তিনভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়।

যথা, গ্রামের কাজ, গোপন কাজ এবং কোনো ক্লাব বা সমিতি আয়োজিত সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

উক্ত বিবরণী থেকে জানা যায় যে অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সভ্য সংখ্যা একশত জন।

যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জির কাছ থেকে পাওয়া এই বিবরণী যে খাঁটি তা পরে যাচাই করা গিয়েছিল। ইন্দুর লেটার বক্স মারফত 'জবাহিরলাল' একখানা চিঠি লিখেছিল রামপ্রসাদকে। চিঠির বক্তব্য ছিল ৭ নম্বর ফৈজাবাদ বিভাগে 'লালাজী' এর নিয়োগ সম্পর্কে।

এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল পাওয়া গিয়েছিল। সেটি হল হিন্দুস্তান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান যেটি ইয়োলো পেপার বা ইয়োলো লিফলেট নামে সভ্যদের মধ্যে পরিচিত ছিল। প্রচারের জন্যে এই সংবিধান হলদে কাগজে ছাপা হয়েছিল।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বাড়ি বা আস্তানা সার্চ করবার সময় নিষিদ্ধ বই পুস্তিকা প্রচারপত্র হাতে লেখা উত্তেজক প্রবন্ধ ছাড়া রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, কার্তুজ, বোমা, বোমা তৈরির মাল-মসলা ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল।

একখানি চিঠির সূত্র থেকে বেনারসে প্রহ্লাদ হসটেল থেকে

রাজকুমার সিংহের ঘরে একটি উইনচেস্টার এবং একটি শেরউড রাইফেল পাওয়া যায়। বনওয়ারিলালের ঘরে একটি ট্রাংক থেকে পাওয়া যায় একটি রিভলভার এবং একটি অটোম্যাটিক পিস্তল। বনওয়ারি স্বীকার করেছিল ও দুটি তাকে নাকি রাজেন লাহিড়ী দিয়েছিল।

প্রেমকিষণ খান্নার বাড়ি সার্চ করবার সময় একটি মাউজার পিস্তল পাওয়া যায়। পিস্তলটির লাইসেনস ছিল। পিস্তলটি প্রেমকিষণের বাবার। বাবা ছিলেন বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ার, কোনো অফিসে বড় সাহেব ছিলেন। রামপ্রসাদকে তিনি অর্থ ও কার্তুজ দিয়ে সাহায্য করতেন।

পুলিস সন্দেহ করেছিল যে বিপ্লবীরা ডাকাতি করার সময় এইমাউজার পিস্তল ব্যবহার করেছিল। বাবার লাইসেন্স দেখিয়ে প্রেমকিষণ দোকান থেকে কার্তুজ কিনে আনত এবং রামপ্রসাদকে কার্তুজ দিত।

কলকাতায় রাজেন লাহিড়ী ও অন্যান্যদের গ্রেফতার করার সময় দক্ষিণেশ্বরে একটি বাড়ি সার্চ করার সময় একটি তাজা বোমা, পিস্তল, রিভলভার, কার্তুজ, বোমা তৈরির মালমসলা যথা পিকরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, গানপাউডার এবং পেলেট পাওয়া যায়।

শোভাবাজারে একটি বাড়িতে পাঁচ-ঘরা একটি রিভলভার এবং ছ বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছিল।

পুলিস অনেক বই তুলে নিয়ে যায়। যথা হাউ কর্ডাইট ইজ মেড, থারমিট ওয়েলডিং, এ ট্রিটিজ অন এক্সপ্লোসিভস, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্ট্রি, মডার্ন ডেমোক্রেসি, বিপ্লববাদ, ফরমেশন অফ ইয়ং ইণ্ডিয়া, হাউ টু রাইজ, বন্দীজীবন এবং কানাইলাল।

এছাড়া পুলিস যেসব কাগজপত্র পায় তা থেকে অনুমান করে যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার একটা আয়োজন চলছে।

দক্ষিনেশ্বর এবং বেনারসে রামনাথ পাণ্ডের বাড়িতে রাজেন লাহিড়ীর হাতে লেখা চিঠি পাওয়া যায়। রামনাথ ছিল বেনারসে রাজেন লাহিড়ীর লেটারবক্স।

রাজেনের হাতে লেখা এই চিঠিখানি ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবীদের প্রতি বারো দফা কর্মসূচী ছিল ঐ চিঠির বিষয়বস্তু। বারো দফা কর্মসূচীর তালিকা নীচে দেওয়া হল। বিপ্লবীরা কি করবে এটি হল তারই একটি তালিকা :—

১। বিপ্লবীদের প্রতি অসহযোগী ও বর্তমানে তাদের মনোভাব, এই সকল ব্যক্তির নামের তালিকা।

২। জেলার একটি মানচিত্র, গ্রামের সংখ্যা, প্রতি গ্রামের জনসংখ্যা, স্কুল, ধনী ব্যক্তির সংখ্যা ও তাদের পেশা, তহসিল, থানা, রাস্তা, কোন রাস্তা কোথায় গেছে, নদী, রেললাইন, রেল স্টেশন, বেলপুল, নদীর পুল, হাসপাতাল ও তাদের অবস্থান।

৩। প্রতি থানা ও চৌকিতে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র পুলিসম্যানের নাম ও সংখ্যা এবং তাদের ব্যবহারের জন্যে কি পরিমাণ কার্তুজ মজুত থাকে।

৪। জেলায় যদি সৈন্যদল থাকে তাহলে তাদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির পরিমাণ, ইংরেজ না ভারতীয়, তাদের আবাসস্থান এবং ভারতীয় সৈনিকদের নাম ও বাড়ির ঠিকানা।

৫। জেলায় যেসব ব্যক্তির বন্দুক বা রিভলভার, পিস্তল আছে তাদের নাম ঠিকানা। বন্দুকের দোকান থাকলে দোকানের ও মালিকের বাড়ির ঠিকানা।

৬। সি আই ডি অফিসার, ইনফরমার, স্পাইদের নাম ঠিকানা ও তাদের ক্রিয়াকলাপের খোঁজখবর।

৭। সমিতিগুলির সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা, তারা কাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদের কাজকর্ম, সভ্যসংখ্যা ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিবরণী।

৮। স্কুল, কলেজের সংখ্যা ও নাম এবং প্রতিটির ছাত্রসংখ্যা।

ঐ সমস্ত স্কুল কলেজের প্রকৃতি কি রকম ? সরকারী, স্বাধীন, বা কি প্রকার।

৯। কারখানা থাকলে কি উৎপন্ন হয়, শ্রমিকসংখ্যা কত ?

১০। ডাকঘর ও তার অফিসের অবস্থান, অফিস, ব্যাংক, মহাজনী কারবারের নাম ঠিকানা এবং প্রতিটিতে কত লোক চাকরি বা কাজ করে।

১১। মোটরগাড়ি, নৌকা, বয়েল গাড়ি এবং অন্যান্য যানের সংখ্যা, তাদের মালিকের নাম ও ঠিকানা।

১২। ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী অফিসারদের নাম, পদের নাম ও ঠিকানা এবং বসবাসকারী ইংরেজ যদি কেউ থাকে, তাদের নাম ঠিকানা।

এই তালিকা পড়ে নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছিলেন যে একমাত্র যুদ্ধের সময়েই এই সকল তথ্যের দরকার হয় অতএব এই তালিকা পড়ে অনুমান করা যায় যে বিপ্লবীরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলি সারা যুক্ত প্রদেশ জুড়ে তাদের কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে যাচ্ছিল। যেমন সাজাহানপুরে রামপ্রসাদ ছিল প্রধান। নানারকম বিপ্লবী বই ও পুস্তিকা ভারতীয়দের মধ্যে সে প্রচার করত।

নিজেও লেখক ছিল। লিটল গ্র্যাণ্ডমাদার অফ দি রাশিয়ান রিভলিউশন বইখানি সে হিন্দিতে অনুবাদ করেছিল, নাম দিয়েছিল ক্যাথারিন। ইন্দু মিত্রর সাহায্যে সে প্রতাপদল নামে বালকদের একটি ক্লাব স্থাপন করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের বিপ্লবী তৈরি করা।

বনারসী রাজসাক্ষী হয়েছিল। তার একটা কাজ ছিল সাজাহানপুরে বাইরে থেকে কোনো বিপ্লবী এলে তার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, এজন্যে তার হাতে সব সময়ে টাকা থাকত।

রামপ্রসাদের বাড়িতে পাওয়া আর একটি কাগজ থেকে 'ঠাকুর' ওরফে 'রৌশন সিং' 'বদ্রী' 'জবাহির' ওরফে রাজেন লাহিড়ী 'নরেন' ওরফে

রামকিষণ ক্ষেত্রীর নামে যে অর্থ খরচ করা হচ্ছিল তার মোটামুটি একটা হিসেব পাওয়া যায়।

ঐ কাগজেই একটা ঠিকানা ছিল, 'আত্মস্বরূপ, গুরুমণ্ডল, হরিদ্বার'। ছদ্মনামটাই ছিল, আসল নাম ছিল না। ডাকে পাঠান চিঠি পরীক্ষা করবার সময় জানা যায় যে রামপ্রসাদের নেতৃত্বে কনখলে একটা ডাকাতি সম্পর্কে চিঠিখানা লেখা হয়েছিল। তবে সেই ডাকাতি করা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। সন্দেহভাজন সকলকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।

রামপ্রসাদ ছিল ডাকাতদলের প্রধান এজন্যে তাকে প্রায়ই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। রামপ্রসাদের বাড়ি সার্চ করবার সময় দেখা গিয়েছিল যে সে তার সাকরেদদের সঙ্গে নিজের বাড়ির ভেতরেই পিস্তল ছোঁড়া বা লক্ষ্যভেদ করা অভ্যাস করত।

'ডি এন চৌধুরী' নামে একখানা চিঠি পাওয়া গেল। ডি, এন, চৌধুরী কে? সে নাম পরে জানা গেল। গোবিন্দচন্দ্র কর-ই হল ডি এন চৌধুরী! চিঠিখানা ছিল একটা পরিচিত পত্র, শচীন বিশ্বাস লিখছে ভূপেন সান্যালকে। এই চিঠির সাহায্যেই শচীন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা গিয়েছিল। আরও জানা গিয়েছিল যে লখনৌ-এ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্যে 'ডি, এন, চৌধুরী' অর্থাৎ গোবিন্দকে পাঠান হয়েছিল। এ কাজ গোবিন্দ আরম্ভ করেওছিল।

বিপ্লবীরা চুপ করে কেউ বসে নেই। ভূপেন সান্যাল এলাহাবাদে কাজ করছে। ঝাঁসিতে বকসি একটা বাড়ি নিয়েছে। সেই বাড়িতে থাকে বকসি নিজে আর মুকুন্দি। তারা ঝাঁসিতে সংগঠন কাজে লেগে আছে। তারপর বকসি হঠাৎ কোথায় চলে যায়! তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

বকসি যে সংগঠন কাজে লিপ্ত ছিল তা পুলিস জানত না! কিন্তু মন্মথ গুপ্ত একখানা চিঠি লেখে প্রণবেশ চ্যাটার্জিকে। সেই চিঠির নকল পুলিসের হাতে পড়ে। সেই চিঠি থেকেই বকসির পরিচয়

জানা যায়।

কয়েকজন আসামী কাশী বিদ্যাপীঠের সঙ্গে জড়িত ছিল। দামোদর স্বরূপ এই বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষক ছিলেন। মন্মথনাথ গুপ্ত, বনওয়ারি এবং চন্দ্রশেখর আজাদ এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র। এই বিদ্যাপীঠে স্বদেশী বই পড়ানো হত। দুখানা বই-ই সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। লেখক শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল এবং বই দুখানির নাম 'বন্দীজীবন' ও 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন।'

বারানসী ষড়যন্ত্র মামলায় দামোদর ও শচীন বিশ্বাস দুজনেই অভিযুক্ত হয়েছিল এবং দণ্ড ভোগ করেছিল। দুজনেই পুরাতন বিপ্লবী এবং দুজনের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল।

১৯২৪ সালের জুন মাসে শচীন সান্যাল এলাহাবাদ থেকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু ধরা পড়ে গেল কলকাতায়, ১৯২৫ সালের ফেবরুয়ারি মাসে। এই আট ন মাস সে কোথায় ছিল কি করছিল জানা যায় নি।

১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ দেখা গেল যে দি রিভলিউশনারি নামে একটি পত্রিকা সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত হচ্ছে। ঐ পত্রিকা ঐ সময়ে বাংলাদেশে বাঁকুড়াতেও দেখা যেতে লাগল।

পুলিস ইনকুয়ারি আরম্ভ হল এবং জানা গেল সেগুলি শচীন সান্যাল ডাকে দিচ্ছে। মাদ্রাজে দুটি প্যাকেট ধরা পড়ল।' একটি প্যাকেটে ছিল দশ খানা রিভলিউশনারি আর অপর প্যাকেটে ছিল দশখানা 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন'। প্যাকেটের ওপর ঠিকানা লেখা আছে রাসবিহারী বোস, টোকিও, জাপান। হস্তাক্ষর শচীন সান্যালের।

শচীন সান্যাল স্বয়ং উত্তর ভারতের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা এবং রিভলিউশনারি ও দেশবাসীর প্রতি নিবেদন-এর লেখক। হিন্দুস্তান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের 'হলদে কাগজ' অর্থাৎ সংবিধানেরও লেখক তিনি।

নিষিদ্ধ পত্রিকা প্রচার ও প্রেরণের ফলে বাঁকুড়ায় তাঁর দু বছর সশ্রম

কারাদণ্ড হয়ে গেল। পুলিস সন্দেহ করে, শচীন সান্যাল ছিলেন দলের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার।

বিপ্লবী নেতারা মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে মিটিং করতেন। বিষ্ণু-শরণ ডুবলিস রামপ্রসাদকে চিঠি লিখে একটা মিটিং-এর খবর দিয়েছিল। যাতায়াতের পথে চিঠিখানা হর্টন পড়ে' মিটিং-এর খবর জানতে পারে।

মিটিং-এর স্থান নির্ধারিত হয়েছিল মীরাটে বৈশ অরফানেজ-এ, তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৫। কারা এই মিটিং-এ আসবে জানবার জন্যে মীরাটের একজন সাব ইনস্পেক্টর ব্রহ্ম সিংকে হর্টন গোপনে পাঠিয়েছিল। ঐ মিটিং-এ রামপ্রসাদ, রাজেন লাহিড়ী, সুরেশ ভট্টাচার্য, দামোদরস্বরূপ এবং বিষ্ণুশরণ ডুবলিস হাজির ছিল। ডুবলিস ছিল অরফানেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মিটিং-এর পর রাজেন লাহিড়ী কলকাতা যাত্রা করে। খবরটা হর্টন জানতে পারে রাজেন কর্তৃক রামপ্রসাদকে লেখা ইন্দু মিত্রের হেডমাস্টারের মারফত দুখানা চিঠির নকল হাতে পেয়ে।

প্রথম চিঠিরতারিখ ১৭-৯-২৫। রাজেন লিখছে: যে অনাথ ছেলেটিকে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ শেখবার জন্যে আমি পাঠাব বলে মনস্থ করেছিলুম, বাড়িতে কাজ থাকার জন্যে সে এখন যেতে পারছে না। আমাকে বা তোমাকে কারখানায় যেতে হবে। কারখানার মালিক কালী বাবুর কোনো চিঠি এখনও পাই নি। তাঁর চিঠি পেলেই আমাদের একজনকে যেতে হবে। যা হয় স্থির করে আমাকে শীঘ্র জানাবে। তোমার যদি সময় না থাকে তাহলে আমি যাব কারণ সামনে দীর্ঘ ছুটি, আমার হাতে সময় আছে।

দ্বিতীয় চিঠিখানার তারিখ ২২-৯-২৫। রাজেন লাহিড়ী লিখছেন, তোমার চিঠি আজ রাত্রে পেলুম। কালীবাবুর চিঠিও একই সঙ্গে এসেছে। তিনি ২৬ তারিখে যেতে বলেছেন। তুমি আমার এই চিঠি ২৪ তারিখে পেয়ে যাবে, তুমি যদি ঐ দিনই মেল ট্রেনে যাত্রা কর তাহলে এখানে ঐ দিনই পৌঁছে যাবে। আমার কাছ থেকে ঠিকানা ইত্যাদি

জেনে নিয়ে তুমি যদি ২৫ তারিখে যাত্রা কর তাহলে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে···ব্যাপারটা জরুরী। আমি তোমার জন্যে ২৪শে রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তুমি যদি ঐ তারিখে আসতে না পার তাহলে আমি ২৫শে ভোরবেলায় যাত্রা করব। তা না হলে আমরা এই ব্যাপার থেকে কিছু লাভ করতে পারব না। পনেরো কুড়ি দিন পরে ফিরে এসে খাতাপত্তর অডিট করা যাবে। ইতিমধ্যে তুমি যদি এখানে এসে পড় তাহালে 'লালাজী' 'নবাব' আর 'কুইকসিলভার'-এর সঙ্গে দেখা করে এখানকার সবকিছু দেখো।

পুলিসের ব্যাখ্যা অনুসারে ছুতোর মিস্ত্রির কারখানা হল বোমার কারখানা যা নাকি 'কালীবাবু' কলকাতায় স্থাপন করেছেন। হিসেবের খাতাঅডিট করার অর্থ বোমা তৈরির কৌশল আয়ত্ত করা। রামপ্রসাদ যেতে না পারলে রাজেন লাহিড়ী নিজে কলকাতায় যেয়ে বোমা তৈরি শিখবে। সে বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির ছাত্র। সামনে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ, হাতে অনেক সময়।

মীরাটে বৈশ অরফানেজে যে মিটিং হয়েছিল তাতে নিশ্চয় স্থির হয়েছে যে বোমা তৈরি শেখবার জন্যে কলকাতায় একজনকে পাঠান হবে। নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিসের এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ ও রাজেনের মধ্যে লেখা চিঠি পুলিসের হস্তগত হয়। তা থেকে ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছু জানা যায়। লাহিড়ী যখন রাই বেরিলিতে ছিল তখন সে রাজসাক্ষী বনওয়ারিকে বলেছিল এক জায়গায় ডাকাতি করতে যেতে হবে। কোনো কারণে বনওয়ারি যেতে পারে নি। রাজেন তখন 'যুগল কিশোর' ছদ্মনামে 'আনন্দ প্রকাশ'কে (অর্থাৎ রামপ্রসাদকে) একখানা টেলিগ্রাম করে 'ম্যারেজ পোস্টপনড আনটিল ফারদার নিউজ', আপাততঃ বিবাহ বন্ধ। বোঝাই যাচ্ছে বিবাহ অর্থাৎ ডাকাতি। টেলিগ্রামে ডাকাতি কথাটা ব্যবহার করা হয় নি।

টেলিগ্রামের উৎস সম্বন্ধে পুলিস তখন খোঁজ-খবর করছে টের পেয়ে

রাজেন সাবধান হয়ে যায়। ৪-৯-২৫ তারিখে সে রামপ্রসাদকে চিঠি লেখে, তুমি যে নামে আমাকে বা অপরকে চিঠি লেখ সে নামটা বদলে ফেল। উৎসুক ব্যক্তিরা নামটা জানতে পেরেছে। চিঠিব নীচে নাম ছিল 'জবাহিরলাল'।

'উৎসুক ব্যক্তি' অর্থে পুলিসেব সি আই ডি বোঝাচ্ছে।

রাজেনের লেখা আরও চারখানি চিঠির বিষয় সি আই ডি জানতে পারে। চিঠিগুলির তারিখ হল ২-৮-২৫, ২-৯-২৫, ৪-৯-২৫ এবং ৭-৯-২৫ এবং চিঠিগুলি, 'নিতাই, 'নিতাইমামা' ছদ্মনামে লেখা।

প্রথম চিঠিখানি হরদইতে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল ঃ এখানে বাজার খুব মন্দা! আমাদের মাল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিক্রি করবার চেষ্টা করছি···আমরা যদি ঠিকভাবে ব্যবসা করতে চাই তাহলে যেভাবে হক মাল আমদানি কবতে হবে···তবে আশা করছি শীগগির কিছু মাল কাটাতে পারব তবে কবে তা বলতে পারছি না···তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি আর বৌদিদি মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে রয়েছি···তুমি আমার বাড়ির ঠিকানায় যে চিঠি দিয়েছ সে চিঠি বাড়িতেই পড়ে আছে, আমি কিছু পাইনি। ফিরে গেলে চিঠিগুলি পাব।

পুলিসের ব্যাখ্যা ঃ 'মাল' অর্থাৎ অস্ত্র, 'ব্যবসা' অর্থাৎ ডাকাতি, 'মাস্টারমশাই' হল বামপ্রসাদ, মাল কাটান হল ট্রেন ডাকাতি।

দ্বিতীয় চিঠিখানা বেনারসের দশাশ্বমেধ ডাকঘরে পোস্ট করা হয়েছিল। এই চিঠিতে বলা হয়েছে যে 'মাসির' অবস্থা সংকটাপন্ন এবং যাকে চিঠি লেখা হয়েছে তাকে অথবা 'কামিনীকাকাকে' শীঘ্র আসতে বলা হয়েছে। 'শাড়ি', 'ওষুধের নমুনার শিশি' এবং 'টেক্সট বই সঙ্গে আনতে বা অবিলম্বে পাঠাতে বলা হয়েছে।

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে বেনারস থেকে তৃতীয় চিঠি পাঠান হয়। চিঠির প্রাপক অথবা কামিনীকাকাকে বলা হয়েছে যে তিনি যেন ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যেন নিশ্চয় আসেন। আগের চিঠিতে যেসব জিনিষগুলি আনতে বলা হয়েছে যথা আমার ছেলের জন্যে টেক্সট বই,

আমার স্ত্রীর জন্যে শাড়ি এবং ওষুধের নমুনা শিশিগুলি আনতে যেন ভুলে না যান।

চতুর্থ চিঠিখানা পাঠাবার আগে ২-৯-২৫ তারিখের চিঠির উত্তর এসে যায়। নিতাই লিখছেঃ দুঃখের বিষয় যে তুমি আমার চিঠির মর্ম বুঝতে পার নি। আমি তোমাকে আরও একখানা চিঠি লিখেছি তারপরেও তুমি আমার চিঠির উদ্দেশ্য যদি বুঝতে না পেরে থাক এইজন্যে আমি আবার লিখছি। আপাততঃ 'শাড়ি' না হলেও চলবে কিন্তু তুমি বা কাকা ১০ তারিখে নিশ্চয় পৌছবে। একটা মিটিং হবে, সেই মিটিং-এ তুমি বা কাকা থাকা দরকার। মিটিং-এ অনেক জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে! তোমাদের মধ্যে একজনের নিশ্চয় আসা চাই···

এই মিটিং বোধহয় ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ তারিখে মীরাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মিটিং-এ ঠিক হয়েছিল যে একজন নেতা কলকাতা যেয়ে বোমা তৈরি শিখে আসবে। দক্ষিণেশ্বরে পরে যে কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল তাই থেকে এইরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় "বর্তমান কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল নেতাদের হাতে কোনো বিস্ফোরক পদার্থ তুলে দেওয়া, যা সময়ে ব্যবহার করা যাবে।

বলাবাহুল্য যে বিপ্লবীরা চিঠিপত্রে সাংকেতিক নাম ব্যবহার করত। একই ঠিকানায় বেশি দিন চিঠি লিখত না এবং ছদ্মনাম তো ব্যবহার করতই। কয়েকটি ছদ্মনামের আড়ালে আসল মানুষের পরিচয় জানা যায় নি যেমন, 'কালীবাবু', 'বিদ্যার্থী', 'অনুরাগজী', 'স্বতন্ত্র','বিশ্বাসবাবু' বৌদিদি', 'ব্রিজকিশোর', মূলরাম' এবং 'কামিনীকাকা'।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবার সময় সরকারি উকিল আরও বললেন যে প্রেমকিষণের যে ডায়েরি পুলিস হস্তগত করেছে তা থেকেও ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। ডায়েরির একটি পাতায় এক লাইন একটা লেখা দেখা যায়, লেখাটি হল 'আলমনগর ২০৫, কানাইয়ালাল।' ২০৫ সংখ্যাটি কি ? ট্রেনটি থামানো হয়েছিল আলমনগর এবং কাকোরির মাঝে এবং কাছেই যে টেলিগ্রাফ পোস্টটি

ছিল তার নম্বর ১০৫। এখানেই ট্রেন থামিয়ে ডাকাতি করা হয়েছিল। আর কানাইয়ালাল ছদ্মনামটি হল এস এন বকসির। বকসিও একজন আসামী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

সরকারি উকিল বলেন যে ষড়যন্ত্রের প্রমাণস্বরূপ সাক্ষ্যগুলি থেকে আমরা এখন ডাকাতিগুলির দিকে মনোযোগ দেব। মহামান্য সম্রাটকে উচ্ছেদ করার জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাকাতির ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তারও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বামরাউলিতে ডাকাতি হয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪ তারিখে রাজসাক্ষী বনারসীলালের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে যোগেশ আসবার কয়েক মাস পরে মন্মথ গুপ্ত, রামকিষণ ক্ষেত্রী, এস এন বকসি এবং আরও কয়েকজন বামরাউলিতে এসেছিল। ঐ সময়ে বনারসীকে রামপ্রসাদ কিছু সোনার অলংকার দেয়। অলংকারগুলি গলিয়ে প্রাপ্ত সোনা বিক্রি করে বনারসী ৫০০ টাকা রামপ্রসাদকে দিয়েছিল। অন্যতম ষডযন্ত্রকারী ও আসামী আসফাকউল্লাব কাছ থেকে রাজসাক্ষী বনাবসী জানতে পারে যে ঐ সোনার অলংকারগুলি ডাকাতি করেই পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে পুলিস মাউজার পিস্তলের সাতটি কার্তুজ, রিভলভারের আটটি কার্তুজ এবং ব্রাউনিং অটোম্যাটিক পিস্তলের একটি কার্তুজ উদ্ধার করেছিল।

বিচপুরিতে ডাকাতি হয়েছিল ৯ ও ১০ মার্চের রাত্রে, ১৯২৫ সালে। ১ নম্বর রাজসাক্ষী বনারসী সেই ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিল। তার কাছ থেকে জানতে পারা যায় যে রামপ্রসাদের নির্দেশে সে বিকেল ৪টের সময় সেরগঞ্জ স্টেশনে আসে। মোটমাট বাইশ জন লোক ছিল কিন্তু বনারসীর মনে হয় যে তার মধ্যে দশ বারোজন আসল দস্যু ছিল। দলে অন্যান্যদের মধ্যে রামপ্রসাদ, 'নবাব' (মন্মথ গুপ্ত)' 'গঙ্গারাম' (রামকিষণ ক্ষেত্রী), 'কুইকসিলভার' (চন্দ্রশেখর আজাদ), কাশীর সেই বাঙালী বাবু যার বাবা কাশীতেই থাকেন আর ভাই বম্বেতে চাকরি করেন (বকসি) এবং আসফাকউল্লাও ছিল।

সমবেত দলটি রেললাইন ধরে পিলিভিতের দিকে যেতে থাকে এবং মাইল দুই যাবার পর সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। অন্ধকার হবার পর পেশাদার দস্যুরা বেডিং খুলে ছুটো বন্দুক বার করে। অন্য একটা বেডিং খুলে রামপ্রসাদ আর আসফাকউল্লা ছুটো রাইফেল, চার পাঁচটা রিভলভার ও পিস্তল, এবং কুকরি ছুটো বার করে।

রামপ্রসাদ আর আসফাকউল্লা একটা করে রাইফেল নেয়, মন্মথ গুপ্ত বকসি এবং আর কেউ কেউ রিভলভার বা পিস্তল নিয়েছিল, রামকিষণ, ক্ষেত্রী এবং আজাদ প্রত্যেকে একটা করে কুকরি আর বনারসী একটা বড় ছোরা নিয়েছিল।

ছুজন দস্যুর হাতে ছুটো বন্দুক ছিল আর বাকি সকলের হাতে লাঠি ছিল। হাতে হাতে অস্ত্র দেবার পর ওরা সকলে উলটো পথে নারায়নপুর গ্রামের দিকে চলল। ঐ গ্রামেই ডাকাতি করা হবে। গ্রামের কাছে এসে লাইন ক্লিয়ার কিনা দেখবার জন্যে রামপ্রসাদ ছুজন দস্যুকে গ্রামে পাঠাল। কিছুক্ষণ পরেই তারা ফিরে এসে বলল যে গ্রামের সব লোক একজায়গায় জড়ো হয়ে হোলির গান গাইছে। রামপ্রসাদ স্থির করল এই অবস্থায় ডাকাতি করতে যাওয়া নিরাপদ নয় অতএব ফিরে যাওয়া যাক।

কিন্তু দস্যুরা রাজি নয়। তারা বলল, এসেছি যখন তখন শুধু হাতে ফিরে যাব না। অতএব মাইল ছুই দূরে আর একটা গ্রামে যাওয়া গেল! কিছু মালকড়ি পাওয়া যেতে পারে এমন একটা বাড়ি দস্যুদের জানা ছিল।

রাত্রি তখন দশটা। বাড়িটার ওপর চড়াও হওয়া গেল। রামপ্রসাদ আর আসফাকউল্লা ছাদে উঠে গেল আর একজন দস্যু পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজা খুলে দিল। যে ছুজন দস্যুর হাতে বন্দুক ছিল তারা বাইরে পাহারা দিতে লাগল আর বাকি সব দস্যু ভেতরে ঢুকে পড়ল। ইতিমধ্যে রামপ্রসাদ ও আসফাকউল্লা তাদের রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

এই সময়ে বাড়ির লোকজনদের মারধোর করে লুটপাট আরম্ভ হয়ে গেছে। বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে গ্রামের লোকের জড়ো হয়ে ডাকাতদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে।

বাইরে যে দুজন দস্যু বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল, রামপ্রসাদ তাদের আদেশ দিল কাছে লোক এলেই গুলি করবে। গুলি চালাতে হল, রামপ্রসাদ ও আসফাকউল্লাও গুলি চালিয়েছিল। গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

রামপ্রসাদ তখন একটা বাঁশি বাজায়। সকলে ফিরে আসে এবং যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে যেতে থাকে। মাইলখানেক হাঁটবার পর পেশাদার দস্যুরা বিশালপুরের রাস্তা ধবল আর বিপ্লবী দলের সকলে রেললাইন ধরে পিলিভিতের দিকে চলল। ভোর রাত্রে পিলিভিত পোঁছে রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা আর বকসি বেরিলি গেল, বনারসী এবং অন্যান্যরা অন্যদিকে গেল। ঘটনাস্থলে পুলিস উইনচেস্টার রাইফেলের তিনটি কার্তুজ পেয়েছিল। এই ডাকাতির জন্যে ষড়যন্ত্রকারীদের কাউকে অভিযুক্ত করা হয় নি।

তৃতীয় ডাকাতি হয়েছিল দ্বারকাপুরে। ঘটনাস্থলে পুলিস গুলি ভরা একটি রিভলভার, মাটি খোঁড়ার একটা যন্ত্র, কিছু নিঃশেষিত বুলেট ও কার্তুজ এবং কার্তুজের একটি খালি কেস পেয়েছিল কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো পাত্তা পায় নি।

হর্টন বলে যে এইসব ডাকাতিগুলির ঘটনাস্থলে মাউজার পিস্তল এবং উইনচেস্টার রাইফেল ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়া ৪৫০ বোরের একটি রিভলভারও ব্যবহৃত হয়েছিল। সাধারণের পক্ষে এই বোর ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিচপুরিতে ৩৮ বোরের কিন্তু বর্তমানে বাতিল একটি উইনচেস্টার রাইফেল ব্যবহৃত হয়েছিল। এই রাইফেলের কার্তুজ দুষ্প্রাপ্য তবে কলকাতায় পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে রাইলেফ, রিভলভার বা পিস্তলের যেসব কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি যে ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট প্রাপ্ত রাইফেল রিভলভার বা পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বনওয়ারির

কাছ থেকে পাওয়া গেছে ৪৫০ বোরের রিভলভার এবং ৭৬৫ অটোম্যাটিক পিস্তল, বেনারসে রাজকুমার সিংহের ঘরে পাওয়া গেছে শেরউড এবং উইনচেস্টার রাইফেল, প্রেমকিষণ খান্নার কাছ থেকে পাওয়া গেছে ৩০০ বোরের জার্মান মাউজার পিস্তল। এটির লাইসেনস ছিল। বেনারসে প্রহ্লাদ হসটেলে রাজকুমার সিংহর ঘরে একটি কাঠের হ্যাণ্ডেলও পাওয়া গিয়েছিল। ঐ হ্যাণ্ডেলটি মাটি খোঁড়া যন্ত্রটিতে ঠিক ঠিক ফিট করে। যন্ত্রটি পাওয়া গিয়েছিল দ্বারকাপুরে ডাকাতির ঘটনাস্থলে।

কাকোরি ট্রেন ডাকাতি সম্বন্ধে বনওয়ারিলালের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় এই সকল বিপ্লবীরাই ডাকাতি করেছিল। বনওয়ারিলাল পরে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলেও তাই থেকে জানা যায় সে নিজেও ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেছিল।

ডাকাতির এক পক্ষকাল আগে রাজেন লাহিড়ী তাকে বেনারসে ডেকে আনে। রাজেন লাহিড়ীর সঙ্গে সে বেনারস থেকে সাজাহানপুরে যায়। ওরা থাকত টিকাসরে। টিকাসরে এস, এন, বকসি আর চন্দ্রশেখর আজাদও থাকত। টিকাসর থেকে ওরা একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে যায়, সেখানে মুকুন্দিলাল ছিল।

এক নম্বর রাজসাক্ষী বনারসী বলে যে ডাকাতির দশ বারো দিন আগে রামপ্রসাদ তাকে ডেকে বলে যে আরও কিছু লোক এসেছে, তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন সাত আট জন লোক এসে গেছে অথচ আর ঘর নেই অতএব রামপ্রসাদের পরামর্শে আর একটা বাড়ি ভাড়া করা হল। ঐ সাত আট জনের মধ্যে ছিল মন্মথ গুপ্ত চন্দ্রশেখর আজাদ, বনওয়ারিলাল, মুকুন্দিলাল, রাজেন লাহিড়ী, এস· এন বকসি এবং আরও একটি যুবক যে অসুস্থতার জন্যে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি।

বনারসী বলে যে ডাকাতির দু তিন দিন পরে ওরা সবাই চলে যায় এবং ডাকাতির পর দিন সে জানতে পারে যে কাকোরির কাছে ট্রেন ডাকাতি করা হয়েছে। আরও দু তিন দিন পরে আসফাকউল্লার

কাছ থেকে ডাকাতি সম্বন্ধে কিছু বিবরণ শোনে।

প্রথম দিন ডাকাতি করা যায় নি কারণ, ট্রেনে তাদের সঙ্গে কিছু পরিচিত লোকের দেখা হয়ে যায়। পরদিন বা তারও পরদিন ডাকাতি হয়।

স্থির হয়েছিল যে আলিমনগরে ডাকাতি করা হবে কিন্তু লখনৌ থেকে হাঁটাপথে যাদের আসবার কথা ছিল তারা পৌছল অনেক দেরিতে অতএব সেদিন লখনৌ ফিরে যেতে হল। লখনৌতে ওরা উঠল ছেদিলাল ধরমশালায়।

পরদিন ওরা আবার ট্রেনে উঠে বালামৌ-এর দিকে চলল। আসফাকাউল্ল, এস এন বকসি এবং আর একজন কাকোরিতে নেমে গেল। বাকি সবাই চলতে থাকল, আর কেউ নামল না। ওরা সাজাহানপুর পর্যন্ত যেয়ে দুপুরের ট্রেনে আবার ফিরে এল।

এদিকে আসফাকউল্লা, এস এন বকসি এবং আর কেউ সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে কাকোরিতে এসে ট্রেনে উঠল। ট্রেন ছাড়ল এবং কিছু দূর যেতে না যেতেই অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন থামাল।

একজন যুবক প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে ওরা বলল, আগের স্টেশনে মানে কাকোরিতে গহনার বাক্স ফেলে এসেছে। ওরা সকলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অন্যান্য কম্পার্টমেণ্টেও ওদের লোক ছিল। তারাও নেমে পড়ল।

কয়েকজন ট্রেনের দুদিকে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়তে থাকল এবং কয়েকজন গিয়ে গার্ডের গাড়িতে উঠে পিস্তল দেখিয়ে গার্ডকে বলল, চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে নইলে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর কেউ ব্রেকভ্যানে ঢুকে সিন্দুক ভেঙে টাকার থলি বার করে নিল। রাস্তায় থলি থেকে টাকা বার করে নিয়ে থলিগুলি ওরা ফেলে দিয়েছিল। পরদিন সকালে ওরা লখনৌ ফিরে এসে শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। রামপ্রসাদ টাকা নিয়ে কাশ্মীর হোটেলে উঠেছিল।

হর্টন বলেছিল, রেললাইনে যেসব কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি সব মাউজার পিস্তলের কার্তুজ। বামরাউলি বা দ্বারকাপুরেও একই ধরনের কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল।

আসামীদের সনাক্ত করবার জন্যে প্রচুর সাক্ষী জড়ো করা হয়েছিল আর দাখিল করা হয়েছিল অসংখ্য চিঠি তবে সবই নকল। আসল চিঠি পাওয়া যায় নি বললেই হয়।

দায়রা আদালতে চারজন অ্যাসেসর ছিলেন। মন্মথ গুপ্ত, রামপ্রসাদ এবং রাজেন লাহিড়ী ছাড়া আর কেউ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে তিন জন অ্যাসেসর স্যব্যস্ত করতে পারেন নি। ডাকাতির জন্যে ষড়যন্ত্রও তাঁরা মেনে নিতে পারেন নি।

বিশেষ দায়রা জজ মিঃ এ হ্যামিলটন প্রায় সমস্ত সাক্ষ্য বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। তিনি কেবল হরগোবিন্দ ও শচীন বিশ্বাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সকলকে সাজা দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং রৌশন সিং-এর ফাঁসির হুকুম হল এবং বাকি সকলের ১৪ বৎসর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। আপিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করা হয়। রামপ্রসাদ, রাজেন রৌশনের ফাঁসি হয়ে গেল। ফাঁসির আগে রামপ্রসাদের ওজন বেড়ে গিয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক মামলার অন্যতম আসামী মন্মথ গুপ্ত লিখেছেন ঃ

১৯২৭ সালের ৮ এপ্রিল তারিখ রায় দেওয়া হবে। মন্মথ গুপ্ত জানতেন তাঁর ফাঁসি হবে। জেলখানার ওয়ার্ডারদের কাছ থেকে তিনি জেনে নিতেন কি ভাবেফাঁসি দেওয়া হয়। নানা কাহিনী ও পদ্ধতি শুনে তিনি মনকে প্রস্তুত করলেন।

রাজেন লাহিড়ী তাঁকে 'মধুছন্দার মন্ত্রমালা' নামে একটি বই পড়তে দিলেন। বইখানি হল বেদের স্তোত্র সংগ্রহ। অন্যান্য আসামীরাও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। রৌশন সিং তো বাংলা শিখছিল এবং ফাঁসির আদেশ হওয়ার পরও সে থামে নি।

যাইহক রায় দেবার দিন আমরা যতদূর সম্ভব ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়

পরলুম। বাইরে থেকে কিছু ভাল খাবার ও জেল কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় নিজেরাও কিছু মিষ্টি তৈরি করে খেলুম।

রৌশন সিং-এর কাছে এক শিশি আতর ছিল। সে সকলকে একটু করে আতর মাখিয়ে দিল। বলল ঃ আমরা সব বরযাত্রী।

সবই তো হল কিন্তু তার ওপর আসামীদের ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। কুছপরোয়া নেই। আসামীরা ডাণ্ডাবেড়ি পরেই চলল।

দুখানা ভ্যানে করে আসামীদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। ভ্যান থেকে নেমে কয়েকশ' গজ হেঁটে যেতে হয়। রাস্তার দু পাশে দর্শকেব সারি। বেশির ভাগ উকিল, মোক্তার এবং আদালতের বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি হলেও ওদের মধ্যে অনেক ছাত্র ও যুবক কর্মীও ছিল এমন কি বিখ্যাত উর্দু লেখক মুনসী প্রেমচাঁদকেও দেখা গিয়েছিল।

ভ্যান থেকে নেমে আসামীরা একটি বিখ্যাত উর্দু গান গাইতে গাইতে চলল। গানখানির প্রথম লাইন হল ঃ সবফরোশি কি তমান্না অব হামারে দিল মে হ্যায়। বিয়াল্লিশের আন্দোলনেব প্রথম শহীদ রাজ-নারায়ণ এইগানটি গাইতে গাইতে ফাঁসির মঞ্চে আবোহণ করেছিলেন।

আদালতে প্রবেশ করে বন্দীদের মনে হল আদালতে যেসব উকিল ব্যারিস্টার ও অন্যান্য যারা হাজির রয়েছেন তাঁরাই যেন অপরাধী, তাঁরাই যেন আসামী। সকলেরই মুখ গম্ভীর।

রাজসাক্ষী বনারসী ও ইন্দুভূষণকেও দেখা গেল। বিচার চলার সময় বনারসীকে বেশ উৎফুল্ল মনে হত কিন্তু সেদিন সে রীতিমতো গম্ভীর। ইন্দুভূষণ অবিশ্যি বরাবরই অনুতপ্ত ছিল। সেদিন দেখা গেল তার চোখ ছলছল করছে।

বিচারপতি হ্যামিলটন রায় লিখতে পনোরো দিন সময় নিয়েছিলেন এবং পনেরো দিনে তিনি ১১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী রায় লিখেছেন। তিনি আদালতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। আসামীরা তাদের

বেঞ্চিতেই বসে রইল।

কালো স্যুট পরে জজ সাহেব আদালতে ঢুকে কোনোদিকে না চেয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। কালো পোশাক, অর্থাৎ জন কতককে তিনি নিশ্চিত ফাঁসিতে লটকে দেবেন। কতজনকে কে জানে!

কোনো ভূমিকা না করে তিনি রায় পড়লেন। মন্মথ গুপ্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজেন লাহিড়ীর পাশে। রাজেন লাহিড়ী অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। মৃত্যু দণ্ডাদেশ শুনে তিনি মাতৃভাষাতেই বললেন 'দুনিয়াটা যেন বদলে গেল!'

এই মামলায় পশ্চাৎপট থেকে আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্যে নানাভাবে বহু প্রকারে সাহায্য করেছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং প্রতাপ পত্রিকার সম্পাদক গনেশশংকর বিদ্যার্থী। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মোহনলাল সাকসেনা, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, চন্দ্রভান গুপ্ত, আর সি হাজেলা আসামী পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কলকাতার ব্যারিস্টাব বি, কে, চৌধুরী মাসিক মাত্র ৫০০ টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলেন। কিন্তু কারও দণ্ড মকুব বা কমান যায় নি।

আলিপুর বোমা মামলা সারা উত্তর ভারতে এক নতুন জোয়ার আনে। বাংলার বিপ্লবী কর্মীরা সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং সংগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করে। তারা বিপ্লবী দল গঠন করতে থাকে।

এইসব নবীন বিপ্লবীরা বিশ্বাস করত যে চরকা কেটে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না। ইংরেজদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে হবে সন্ত্রাশ সৃষ্টি করতে হবে।

যারা বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচার করছে, তাদের বিপ্লবীরা সাজা দিচ্ছে। আগে সেই সব ইংরেজদের শেষ কর তারপর আছে বিশ্বাসঘাতকের দল যারা পুলিসের গুপ্তচরের কাজ করে, বিপ্লবীদের কাজে বাধা দেয়, জেলের ভেতর বন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে, তাদের রেহাই দিলে চলবে না।

আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজ সরকার পুলিসের গুপ্তচরের কাজ করবার জন্যে একজনও আইরিশকে রাজি করাতে পারে নি। দেশের স্বার্থে আইরিশরা যদি পুলিসের সহায়তা করতে রাজি না হয় তাহলে এদেশের লোকেরাই বা তা পরবে না কেন?

ইংরেজ সরকারও উঠে পড়ে লাগল, সন্ত্রাশবাদ দমন করতেই হবে কিন্তু দমন দূরের কথা ওদের অত্যাচার যত বাড়তে লাগল বিপ্লবীদলের সংখ্যাও যেন তত বাড়তে লাগল। দেশের ছেলেরা যেন ক্ষেপে গেল। তারা মরতে ভয় পায় না, বেতের আঘাত হজম করে।

ব্যায়ামের আখড়ায় কত যুবক বেত খাওয়া অভ্যাস করত। বন্ধুদের বলতঃ আমি মাসল (পেশী) ফুলিয়ে দাঁড়াই, তুই আমাকে চাবুক পেটা কর। তারপর তোর হলে আমি তোকে মারব!

এইরকমভাবেই চলছিল প্রস্তুতি।

১৯২৮ সাল এল। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। দেশের দাবি।

ইংরেজ সরকার কি মনে করে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতে এক কমিশন পাঠাল। তারা সারা ভারত ঘুরে দেখবে ভারতবাসীরা দেশ শাসনের উপযোগী হয়েছে কি না তারপর না হয় তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা দেওয়া যাবে। কিন্তু সেই কমিশনে একজনও ভারতীয় সভ্য ছিল না।

সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল এবং স্থির হল যেখানে যেখানে কমিশন যাবে সেখানে কমিশনকে বয়কট করা হবে এবং হরতাল ডাকা হবে। শূন্য শহর যেন কমিশনকে অভ্যর্থনা জানায়। লাহোরে কমিশনের বিরুদ্ধে ৩০ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখে এক প্রতিবাদ মিছিল বার করা হল। মিছিলের পুরোভোগে ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় এবং পণ্ডিত মদনমোহন মলব্য। পুলিস মিছিলকে বাধা দিল এবং লালাজী আহত হলেন। স্কট নামে একজন ইংরেজ পুলিস অফিসার বেটন দিয়ে লালাজীর বুকে বার বার সজোরে আঘাত করেছিল যার ফলে মাত্র কয়েকদিন পরে ১৭ নভেম্বর তারিখে লালাজী মারা যান।

বিপ্লবী যুবকেরা ক্ষেপে উঠল। লালাজীকে যে মেরেছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

লালাজীর মৃত্যুর ঠিক এক এক মাস পরে ১৭ ডিসেম্বর বিকেল চারটের সময় অ্যাসিট্যান্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্স সায়েব লাহোর ডিস্ট্রিক্ট পুলিস অফিস থেকে মোটর সাইকেলে চেপে বেরিয়ে এল, কাজের শেষে বাড়ি ফিরবে। পিছনে একজন রক্ষী, হেড কনস্টেবল চন্নন সিং।

কিছুদূর যাবার পরই সণ্ডার্স গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে তার দেহে আরও কয়েকটা গুলি করল। গুলির আওয়াজ পেয়ে থানা থেকে কেউ কেউ ছুটে এসেছিল, তারা এবং চন্নন সিং আততায়ীদের তাড়া করল। চন্নন সিং ছিল আগে, সে একজনকে প্রায় ধরে ফেলেছিল কিন্তু গুলিবিদ্ধ হয়ে আর এগোতে পারল না। হাসপাতালে সে মারা যায়।

চন্নন সিং-এর দেহ থেকে মাউজার পিস্তলের ৩০ বোরের একটি বুলেট এবং ঘটনাস্থলে মাউজার পিস্তলের ৩০ বোরের একটি কার্তুজ কেস পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া আর কোনো সূত্রই পাওয়া যায় নি। হত্যাকারীদের পুলিস কোনো সন্ধান করতে পারল না।

অচিরে লাহোরের দেওয়ালে দেওয়ালে একটা পোস্টার পড়ল। রাত্রির অন্ধকারে কারা সেগুলি সেঁটে দিয়ে গেছে। তাতে লেখা : সণ্ডার্স ইজ ডেড, লালাজী অ্যাভেঞ্জড। সণ্ডার্স মরেছে : লালাজী হত্যার প্রতিশোধ।

সণ্ডার্স-হত্যা রহস্য রয়েই গেল।

চার মাস পরে পুলিস যেন একটা সূত্র পেল। সণ্ডার্স হত্যা রহস্যের বুঝি সমাধান করা যাবে।

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে দিল্লিতে যখন সেণ্ট্রাল লেজিস-লেটিভ অ্যাসেমব্লির অধিবেশন চলছে তখন সেখানে একটি বোমা ফাটলো। লং লিভ রিভলিউশন, ডাউন উইথ ইমপিরিয়ালিজম ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, ধ্বনি দিয়ে ওঠে ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত। বোমাটি নিক্ষেপ করে ভগত সিং। কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নয়, শুধু একটা প্রতিবাদ। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যেদিন তাদের বিচার আরম্ভ হয়েছিল সেদিনও তারা এই ধ্বনি দিয়েছিল।

বোমা ছোঁড়ার অপরাধে ভগত সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয় কিন্তু তারা লাহোরেও যে গভীর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল সেটা ক্রমে জানা যায়।

দিল্লিতে ভগত সিংকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তার দেহ খানাতল্লাশি করবার সময় ৩০ বোরের একটি মাউজার পিস্তল পাওয়া যায়। সণ্ডার্স হত্যার পর লাহোরের দেওয়ালে যে পোস্টার পড়েছিল সেগুলি ভগত সিং-এর হাতের লেখা বলে প্রমাণিত হয়।

এই দুটি সূত্র ধরে পুলিস তদন্ত চালাতে থাকে যার ফলে ভগত সিং-এর বিচার বা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্য বড়লাট ১৯৩০ সালে ১১১ নং অর্ডিনান্স জারি করলেন, যা দ্বারা একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠিত হল।

সরকার কেস দাঁড় করালেন মূলতঃ সাতজন অ্যাপ্রুভারের বিবৃতি ও তিনজন আসামীর স্বীকারোক্তি, বহু ব্যক্তির সাক্ষ্যের ওপর যারা নাকি আসামীদের বিশেষ স্থানে বা সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত থাকতে দেখেছে, প্রিন্টিং, হ্যাণ্ডরাইটিং আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, গুলি, বিস্ফোরক ইত্যাদির বিশেষজ্ঞের এবং পুলিস বা ম্যাজিস্ট্রেটের বিবৃতি, খানাতল্লাসি এবং প্রাপ্ত সামগ্রীর ওপর নির্ভর করে।

অ্যাপ্রুভারগণ যে বিবৃতি দিয়েছিল সেগুলি প্রমাণিত করবার জন্যে সরকার পক্ষ থেকে অনেক সাক্ষী হাজির করা হয়েছিল কিন্তু কোনো সাক্ষী আসামীদের সনাক্ত করতে পারে নি।

৫ মে ১৯৩০ তারিখে ট্রাইবুন্যালের বিচার আরম্ভ হল। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারা যথা—১২১, ১২১-এ, ১২২ এবং ১২৩ অনুসারে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অন্যান্য অভিযোগ উত্থাপন করলেন মিঃ হ্যামিলটন হার্ডিং। ভগত সিং, শিবরাম রাজগুরু এবং শুকদেবের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা (নরহত্যা) অনুসারে অতিরিক্ত অভিযোগ।

আসামীরা প্রথম কয়েকদিন আদালতে হাজির হলেও তাঁরা জেলে বিভিন্ন সময়ে অনশন করছিলেন এজন্যে তাঁরা আদালতে হাজির হতেন না। এজন্যে বিচারে বিলম্ব হতে থাকে।

মোট আসামীর সংখ্যা ২৪ কিন্তু কিছু পলাতক। হিয়ারিং-এর সময় কাউকে মুক্তি দেওয়া হয়। আদালতে যাদের হাজির করা গিয়েছিল তাদের নাম ঃ—

ভগত সিং

শিবরাম রাজগুরু ওরফে 'এম'

শুকদেব ওরফে 'দয়াল' 'স্বামী' ভিলেজার'

কিশোরীলাল রতন ওরফে 'দেওদত্ত রতন' 'মস্তরাম শাস্ত্রী,
গয়াপ্রসাদ ওরফে 'ডাঃ বি এস নিগম' 'রামলাল' 'রামনাথ' 'দেশভক্ত'
শিউবর্মা ওরফে 'প্রভাত' 'হরনারায়ণ', 'রামনারায়ণ' কাপুর'
কুন্দনলাল ওরফে 'প্রতাপ' ওরফে 'নাম্বার ওয়ান'
বিজয়কুমার সিংহ ওরফে 'বাচ্চু'
অজয়কুমার ঘোষ ওরফে 'নিগ্রো জেনারেল'
যতীন্দ্রনাথ সান্যাল (জিতেন ?)
কুনোয়ালনাথ ত্রিবেদী ওরফে 'কুনোয়ালনাথ তেওয়াড়ি'
মহাবীর সিং ওরফে 'প্রতাপ' ও জয়দেব ওরফে 'হরিশচন্দ্র'
প্রেমদত্ত ওরফে 'মাস্টার' ওরফে 'অমৃতলাল'
দেশরাজ

সরকার পক্ষের মামলা সংক্ষেপে হল এই যে ছোট ছোট বিপ্লবী দল একত্রিত হয়ে ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে সারা উত্তর ভারতে পাঞ্জাব থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিপ্লব কার্য চালিয়ে যাওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করেছিল। সরকার নিজের সুবিধার জন্য সময়কাল দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগ ১৯২৮-এর আগস্টের পূর্ববর্তী কাল এবং অপর ভাগ ১৯২৮-এর আগস্টের পরবর্তীকাল।

পূর্ববর্তীকালের ঘটনা জানা যায় অন্যতম অ্যাপ্রুভার বেতিয়ার ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের বিবৃতি থেকে। ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ বলে যে অনুশীলন পার্টিতে যোগদান করা ইস্তক ১৯১৬ সাল থেকে সে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট আইন অনুসারে ১৯১৮ সালে সে এক বৎসরের জন্যে কারাদণ্ড ভোগ করে। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিন বছর ১৯২২ সাল পর্যন্ত বিহারে সে বিপ্লবী দল গঠন করতে থাকে। ১৯২৩ সালে মনমোহন ব্যানার্জিকে এবং ১৯২৭ সালে সহপাঠী কুনোয়ালনাথ তেওয়াড়িকে সে দলভুক্ত করে।

বর্তমান মামলায় মনমোহন একজন অ্যাপ্রুভার এবং কুনোয়াল একজন

আসামী।

রাজনীতিক কাজকর্মের জন্যে ১৯২৫ সালে ফণী ঘোষ হিন্দুস্থান সেবাদল নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলে। পরের বছর গোড়ার দিকে যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার উদ্দেশ্যে ফণী বেনারসে যায় কিন্তু নামী বিপ্লবীরা তখন কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়েছে। যুক্ত প্রদেশের পার্টি তখন দুর্বল।

এলাহাবাদে সেই বছরেই কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার দুই ভাই আসামী শচীন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের ভাই যতীন সান্যালের সঙ্গে ফণী ঘোষ দেখা করে। যুক্ত প্রদেশ পার্টি ও বিহার পার্টির মধ্যে একটা যোগাযোগ ও বোঝাপড়া হয়।

১৯২৭ সাল থেকে যুক্ত প্রদেশ পার্টি ফণীন্দ্রনাথ ঘোষকে রিভলভার সরবরাহ করতে থাকে। বছরের শেষ দিকে যতীন্দ্র সান্যাল এবং বর্তমান অন্যতম আসামী বিজয়কুমার সিংহ বেতিয়াতে ফণী ঘোষের কাছে বর্তমান মামলার আর একজন আসামী শিউবর্মাকে পাঠায়। উদ্দেশ্য, বিশেষ একটি রিভলভার যেটি নাকি ফণীকে দেওয়া হয়েছে সেটি ফিরিয়ে আনতে। রিভলভারটি শিউবর্মাকে না দিয়ে ফণী সেটি নিজেই বেনারসে নিয়ে আসে। ১৯২৮ সালের ১৩ ফেবরুয়ারি তারিখে রায়বাহাদুর জিতেন ব্যানার্জিকে হত্যার জন্য এই রিভলভারটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৮-এর জানুয়ারি থেকে জুন বা জুলাই মাস পর্যন্ত ফণী কলকাতায় ছিল এবং বেতিয়া হাইস্কুলে তার সহপাঠী কুনোয়ালনাথ তেওয়াড়ির সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হত, তবে তারা কোনো বিপ্লবী কাজ চালাত কিনা জানা যায় নি।

উল্লেখযোগ্য যে যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার বিপ্লবী দলের মধ্যে যোগাযোগ বা বোঝাপড়া থাকলেও দুই দল তখনও একত্রিত হয় নি।

ওদিকে তখন পাঞ্জাবে কি হচ্ছে দেখা যাক। এ হল ১৯২৬ সালের

কথা। বর্তমান মামলার আসামী শুকদেব দলের জন্য সভ্য সংগ্রহ করছে। লাহোর তার হেডকোয়ার্টার। শুকদেব তিনজনকে দলভুক্ত করেছিল। একজন ছিল যশপাল, লাহোরে ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক। আর একজন হল জয়গোপাল, ঐ স্কুলের ছাত্র। স্কুলটি বছরের শেষে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু স্কুল বন্ধ হবার আগে স্কুল থেকে জয়গোপাল ম্যানুফ্যাকচার অ্যাণ্ড ইউজেস অফ এক্সপ্লোসিভস নামে একটি বই, ছুটি ব্যাটারি, ছুটি থারমোমিটার এবং কিছু পরিমাণ মারকারি চুরি করে এনে শুকদেবকে দিয়েছিল। তৃতীয় জন সভ্য হল হংসরাজ ভোরা। এই তিনজনের মধ্যে যশপাল পলাতক।

হংসরাজ ভোরা হল শুকদেবের আত্মীয়। শুকদেব তার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করত। শুকদেব একদিন তাকে তাদের দল হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের হলদে কাগজ অর্থাৎ সংবিধান পড়তে দিয়েছিল এছাড়া শুকদেব ওদের প্রত্যেককে বৈপ্লবিক বইপত্তর পড়তে দিত।

১৯২৭ সাল থেকে ভগত সিং-এর সঙ্গে শুকদেবের যোগাযোগ। সেই বছরে লাহোরে গোয়ালমণ্ডিতে শুকদেব জনৈক কানাইয়ালালের একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। এই বাড়িতে ছুজনের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হত। এ বাড়ি পরে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কাছেই লছমন গলিতে স্থন্দর নিবাস নামে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। এই বাড়িতে শুকদেব আর জয়গোপাল বাস করত।

হংসরাজ ভোরা অন্যত্র ছিল। এই বছরেই সে লাহোরে ফিরে আসে এবং রাজনীতিক প্রচারের জন্যে লাহোর স্টুডেন্টস ইউনিয়ম নামে একটি সমিতি গঠন করে। শুকদেবের সঙ্গে কাজ করা অপেক্ষা হংসরাজ ভোরা তখন ছাত্র সংগঠন কাজে ব্যস্ত ছিল।

১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবী দল কিছুটা নিস্ক্রিয় ছিল কারণ বোধহয় বেশির ভাগ নেতা তখন কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিল। এই সময় পাঞ্জাব বা বিহার দলেরও বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। পাঞ্জাব সংগঠন কাজে ব্যস্ত ছিল এবং

বিহারের নেতা যতীন্দ্র ঘোষ তখন কলকাতায় ছিল।

বর্তমান মামলার অন্যতম অ্যাপ্রুভার ললিতকুমার মুখার্জি যিনি ১৯২৫ সাল থেকে বিপ্লবের কাজ করে আসছেন তিনি অজয়কুমার ঘোষ, যতীন সান্যাল এবং ভূপেন সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুক্ত প্রদেশে কিছু কাজ করা যায় কিনা তার জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। বিপ্লবীরা চঞ্চল, তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

যুক্ত প্রদেশের কর্মীরা যেন নড়েচড়ে বসল। প্রথমেই তারা কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করল। ফতেগড় জেলে তখন ছিলেন যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শিউবর্মা এবং বিজয় সিংহ আবেদন করলেন। জেলখানার সুপারিমেণ্টেণ্ডেণ্ট চক্রান্তের গন্ধ পেলেন বোধহয়। তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না কিন্তু সাক্ষাতপ্রার্থী শিউবর্মা ও বিজয়কে অনুসরণ করবাব জন্যে সাদা পোশাকে একজন কনস্টেবলকে পাঠালেন।

কনস্টেবল ফিরে এসে রিপোর্ট করল সাক্ষাতপ্রার্থী দুজন গয়াপ্রসাদের বাড়িতে ঢুকল। গয়াপ্রসাদও বর্তমান মামলার একজন আসামী। সে জালালাবাদে ডাক্তারী করে। এই গয়াপ্রসাদ পরে শুকদেবের পরামর্শে ডাঃ বি এস নিগম নামে ফিরোজপুরে একটা ডাক্তারখানা খুলল।

ডাক্তারখানা মানে বিপ্লবীদের একটা স্টেশন। মফঃস্বল বা অন্য শহর থেকে যাতায়াতের পথে বিপ্লবীরা এই ডাক্তারখানায় বিশ্রাম নিতে পারবে, জামাকাপড় বদলাতে পারবে, বিস্ফোরক পদার্থ মজুত রাখতে বা সংগ্রহ করতেও পারবে এবং ডাক্তারখানা থেকে যা আয় হবে তা পার্টির কাজে লাগবে। তাছাড়া দলে একজন ডাক্তার থাকা ভাল।

৯ সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লির ফিরোজশা তুগলক কেল্লায় একটা মিটিং হয়। অনেক যুবকের সমাবেশ দেখে কেল্লার একজন চাপরাশি ভগত সিংকে প্রশ্ন করেছিল, এরা কারা? ভগত সিং উত্তর দিয়েছিল

এরা সব কলেজের ছাত্র, সামনে পরীক্ষা তাই এক সঙ্গে মিলেমিশে পড়ার বিষয় জেনে নিচ্ছে।

এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিল ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, মনমোহন ব্যানার্জি কুন্দনলাল, শিউবর্মা, কুমার সিং, শুকদেব, জয়দেব, ভগত সিং। হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি নামে নতুন একটি দল গঠিত হল। ভগত সিং, শুকদেব, চন্দ্রশেখর আজাদ, কুন্দনলাল, বিজয় কুমার সিংহ, শিউবর্মা এবং ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ সেন্ট্রাল কমিটির সভ্য মনোনীত হলেন। এদের মধ্যে পাঞ্জাব শাখার ভার দেওয়া হল শুকদেবকে, যুক্তপ্রদেশের ভার দেওয়া হল শিউবর্মাকে এবং বিহারের ভার ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের ওপর। এই তিন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন ভগত সিং। চন্দ্রশেখর আজাদ ওরফে পণ্ডিতজীকে ভার দেওয়া হল মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের, ঝাঁসিতে সেন্ট্রাল অফিসের ভার রইল কুন্দনলালের ওপর।

উল্লেখযোগ্য যে এই মিটিং-এ বাংলার কোনো প্রতিনিধি ছিল না বা বাংলা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি কারণ এই দলের সন্ত্রাশবাদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীরা একমত হতে পারে নি। তাছাড়া বিপ্লবের ক্ষেত্রে বাংলার ছেলেরা তখন রীতিমতো সক্রিয়। তাবা যেকোনো প্রদেশ অপেক্ষা অনেক এগিয়ে গেছে।

এই মিটিং-এ আরও ঠিক হল যে ডাকাতি, হত্যা এবং সন্ত্রাশ সৃষ্টির কাজ ব্যতীত সেন্ট্রাল কমিটির পরামর্শ বিনা প্রদেশ প্রধানরা নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারবে এবং সেন্ট্রাল কমিটিও প্রদেশ প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাদের এলাকার কোনো কাজ করবে না।

সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সেন্ট্রাল কমিটির হেফাজতে থাকবে তবে ব্যবহারের জন্য প্রদেশ কমিটি অস্ত্র চাইতে ও ব্যবহার করতে পারবে।

আরও কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যথা ঃ ১। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার দুজন আসামী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে জেলখানা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যোগেশ চ্যাটার্জিকে শীঘ্র আগ্রা

জেল থেকে কানপুর জেলে বদলি করা হবে। ২। কাকোরি মামলার অ্যাপ্রুভারদের হত্যা করতে হবে। ৩। বাংলা থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আনিয়ে বোমা তৈরি শিখতে হবে এবং ৪। বিহারে স্থানে স্থানে ডাকাতি করার জন্যে পরামর্শ করার নিমিত্ত ভগত সিংকে ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে পাঠান হবে। তবে বিহারে ফণী ঘোষের কাছে বেতিয়াতে যাবার আগে ভগত সিংকে মাথার চুল ছাঁটতে হবে ও দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে।

বিহারে যাবার আগে শুকদেবের সঙ্গে ভগত সিং ফিরোজপুরে যেয়ে ক্ষৌরকর্মটি সেরে ফেলে। এরপর ভগত সিং আর দাড়ি রাখেন নি। কিন্তু গোঁফ রেখেছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ভগত সিং বেতিয়া যাত্রা করলেন। পূর্ব ব্যবস্থা অনুয়ায়ী পথে এলাহাবাদে নামলেন। সেখানে অজয় ঘোষের বাড়িতে বিজয়কুমার সিংহ ও ললিতকুমার মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলেন।

বেতিয়াতে ভগত সিং একা আসেন নি, সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ ওরফে পণ্ডিতজী। ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং মনমোহন ব্যানার্জির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল কিন্তু তখন বিহারে ডাকাতি করার ক্ষেত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

আগ্রা জেল থেকে যোগেশ চ্যাটার্জিকে তখন উদ্ধার করবার চেষ্টা চলছিল। সেই উদ্দেশ্যে ফণী ঘোষের কাছ থেকে ভগত সিং কয়েকটা রিভলভার চেয়ে নিলেন। ওরই মধ্যে একটা রিভলভার শুকদেবের কাছে থাকত।

স্কটের বেটন চার্জের ফলে ১৭ নভেম্বর ১৯২৮ তারিখে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হল। সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে লাহোরে ৩০ অক্টোবর তারিখে লালাজী শোভাযাত্রা পরিচালনা করছিলেন। পুলিস শোভাযাত্রার গতিরোধ করে এবং লাঠি চার্জ করে। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্কট তার বেটন দিয়ে লালাজীকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ফলে, লালাজীর মৃত্যু হয়।

লালাজীর মৃত্যুর পর কুন্দনলাল, শিবরাম রাজগুরু, শুকদেব, ভগত সিং কিশোরীলাল, জয়গোপাল, মহাবীর সিং, হংসরাজ ভোরা, বিজয়-কুমার সিংহ ইত্যাদি বিপ্লবীরা বিভিন্ন স্থান থেকে লাহোরে এসে মিলিত হতে থাকেন। অনেকেই সঙ্গে রিভলভার বা পিস্তল এনেছিলেন।

চন্দ্রশেখর আজাদ একটা স্যুটকেসে করে একটা মাউজার পিস্তল এবং চারটে রিভলভার এনেছিল। ভগত সিং-এর কাছে ছিল একটা অটোম্যাটিক পিস্তল।

লালাজীর শোচনীয় মৃত্যুতে বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত। এই মৃত্যু, যাকে হত্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, তা বিনা প্রতিবাদে হজম করে নেওয়া যায় না। প্রতিশোধ নিতেই হবে।

কিন্তু একটা বড় কাজে নামতে হলে অর্থ চাই। পার্টিতে তখন অর্থের ঘাটতি ছিল। লাহোরে মোজাং হাউসে মিলিত হয়ে বিপ্লবীরা মিটিং করলেন। ঠিক হল পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাংক লুট করা হবে।

ব্যাংক লুটে যারা অংশ গ্রহণ করবে, তাদের রিভলভার লোড ও আনলোড করতে শেখানো হল। ৪ ডিসেম্বর ব্যাংক লুটের তারিখ ধার্য হল। প্ল্যানটা ছিল এই রকম : কালিচরণ টেলিফোনের তার কেটে দেবে ঠিক বেলা ৩টের সময়, ব্যাংকের গার্ডের হাত থেকে তার বন্দুকটা ছিনিয়ে নেবে শুকদেব, সেক্রেটারির ঘরের সামনে যে চাপরাশিটা বসে থাকে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে হংজরাজ ভোরা এবং জয়গোপাল কাউন্টার থেকে টাকা ও নোট তুলে নিয়ে ব্যাগ ভর্তি করবে। ওদিকে বাইরে ট্যাকসি নিয়ে ভগত সিং ও মহাবীর সিং অপেক্ষা করবে।

প্ল্যান অনুসারে ৪ ডিসেম্বর বেলা তিনটের আগে বিপ্লবীরা নির্ধারিত স্থানে মিলিত হল কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চেষ্টা করেও সেদিন একটা ট্যাকসি পাওয়া গেল না। ব্যাংক লুটের প্ল্যান আপাততঃ পরিত্যক্ত হল।

৯ ও ১০ ডিসেম্বর তারিখে মোজাং হাউসে বিপ্লবীরা আবার মিলিত

হলেন। মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন শুকদেব, ভগত সিং, কিশোরীলাল, শিবরাম রাজগুরু, মহাবীর সিং এবং জয়গোপাল। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কট নিধন নিয়ে আলোচনা হল। স্কটকে মরতে হবে।

স্কটের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে জয়গোপালকে ভার দেওয়া হল।

স্কটের গতিবিধির ওপর জয়গোলাপ নজর রাখতে লাগল। পরপর পাঁচদিন নজরে রেখে স্কটের রুটিনের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া গেল। ১৫ ডিসেম্বর তারিখে জয়গোপাল তার রিপোর্ট পেশ করল চন্দ্রশেখর আজদকে।

চন্দ্রশেখর আজাদ তখনই তারিখ ঠিক করে ফেললেন, ১৭ ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় স্কটকে হত্যা করা হবে।

বিপ্লবীরা তাদের সাফল্য সম্বন্ধে এবার এতদূর নিশ্চিত হলেন যে তাঁরা গোলাপী রঙের কাগজে কয়েকটা পোস্টার লিখে ফেললেন।

হংসরাজ ভোরা এবং জয়গোপাল ১৫ ডিসেম্বর তারিখে দেখেছিল যে ভগত সিং নিজেই পোস্টার লিখছেন। পোস্টারে লেখা ছিলঃ 'স্কট নিহত, লালাজীর মৃত্যুর প্রতিশোধ, হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আরমি।' পরে হংসরাজ ভোরাও কিছু পোস্টার লিখেছিল। পরে বাড়ি সার্চ করার সময় যে কয়েকখানা পোস্টার পাওয়া গিয়েছিল, তাতে স্কটের পরিবর্তে সণ্ডার্স-এর নাম লেখা ছিল।

স্কট নিধনের নির্ধারিত তারিখ ১৭ ডিসেম্বর।

সকাল থেকে থানার ওপর জয়গোপাল নজর রেখেছিল।

বেলা ১০টার সময় জয়গোপাল দেখল,

লাল মোটর সাইকেল চেপে একজন থানায় ঢুকলেন।

জয়গোপাল ধরে নিল স্কট আজ গাড়ি করে না এসে মোটর সাইকেলে এসেছে। সে তখনি তার সাইকেলে চেপে মোজাং হাউসে যেয়ে বন্ধুদের খবর দিল, থানায় স্কট এসে গেছে।

বেলা দুটোর সময় জরুরী মিটিং হল। রিভলভার পিস্তল বিলি হয়ে গেল। অ্যাকশন নেবার জন্যে নির্বাচিত তিনজনের মধ্যে ভগত সিং নিল একটা অটোম্যাটিক পিস্তল, রাজগুরু একটা রিভলভার এবং চন্দ্রশেখর আজাদ একটা মাউজার পিস্তল।

জয়গোপালকে কোনো অস্ত্র দেওয়া হল না, সে শুধু নজর রাখবে আর থানা থেকে বেরোলে স্কটকে চিনিয়ে দেবে। তার নিজের ও বন্ধুদের সাইকেলগুলি যথাস্থানে রেখে দিয়ে সেগুলি তদারক করবে। স্কট নিধনে শুকদেবকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় নি।

প্ল্যান অনুসারে চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগত সিং আর জয়গোপাল সাইকেলে ঘটনাস্থলে গেল, রাজগুরু গেল পায়ে হেঁটে। তিনখানা সাইকেলের মধ্যে ভগত সিং-এর সাইকেলটা জয়গোপালের কাছে রইল। প্রথম গুলি ফসকালে ভগত সিং সাইকেলে স্কটকে অনুসরণ করে আবার গুলি করবে। বাকি দুটো সাইকেল থানার উলটো দিকে ডি এ ভি কলেজের ল্যাটিনের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রইল। যাতে চট করে সাইকেল চেপে পালানো যায়, এই ভাবে তার ব্যবস্থা করা হল।

চারজনের মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদ কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে পজিশন নিল কিন্তু রাস্তার ধারে, রাজগুরু আর ভগত সিং থানার সামনে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল। জয়গোপাল কাছেই কোর্ট স্ট্রিটের মোড়ে সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিকেল চারটের আগে জয়গোপাল সিগন্যাল দিল, সকালের সেই সায়েব লাল মোটরসাইকেলে চেপে বেরোচ্ছে, রেডি। থানার গেট দিয়ে মোটরসাইকেলে সায়েব বেরোচ্ছে, পেছনে একজন কনস্টেবল। চন্নন সিং। জয়গোপাল রাজগুরুকে সতর্ক করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজগুরু তাক করে সায়বকে গুলি করল। অব্যর্থ লক্ষ্য। সায়েব একটা হাত তুলে মোটর সাইকেল থেকে রাস্তায় পড়ে গেল, মোটর সাইকেলটাও হেলে গিয়ে তার একটা পায়ের ওপর পড়ল।

সায়েব পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগত সিং ছুটে গিয়ে তার

অটোম্যাটিক পিস্তল থেকে সায়েবের দেহে পর পর কয়েকটা গুলি করল।

জয়গোপাল তার সাইকেলে চেপে ওদের কাছে এগিয়ে আসছে, ভগত সিং আর রাজগুরু তখন ছুটছে, কনস্টেবল চন্নন সিং তাদের অনুসরণ করছে। ফার্ন নামে একজন ট্রাফিক ইনস্পেক্টরও চন্নন সিং-এর সঙ্গে যোগ দিল।

ফার্ন খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। ভগত সিং ঘুরে দাঁড়িয়েই তাকে গুলি করল কিন্তু ফার্ন বোধহয় সম্ভাব্য বিপদের জন্যে প্রস্তুত ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। সে আর অনুসরণ করল না, রণে ভঙ্গ দিল।

ভগত সিং আর রাজগুরু তখন ডি এ ভি কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, চন্নন সিং তখনও তাদের অনুসরণ করছে। কোথা থেকে একটা বুলেট এসে তার কোমরে বিদ্ধ হল। এই বুলেট তার দেহ থেকে বার করা হয়েছিল। বুলেটটা ছিল মাউজার অটোম্যাটিক পিস্তলের। অনুমান করা হয়েছিল যে চন্নন সিংকে চন্দ্রশেখর আজাদ গুলি করেছিল।

ওরা ছুটতে ছুটতে তখন বোর্ডিং হাউসেরই ব্লকে ঢুকে বি ব্লকের নীচতলায় বেরিয়ে এল। ওখানে ২৮ নম্বর ঘরে আসামী দেশরাজ থাকত। ওদিকে জয়গোপালও এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

এবার ওরা একটু অসুবিধেয় পড়ল। সাইকেল তো মোটে দুখানা। ল্যাটরিনের দেওয়াল থেকে দেশরাজ একটা সাইকেল সরিয়ে নিয়েছে আর অপরটা কাছেই কিচেনের কাছে রেখেছে।

কি আর করা যায়! আজাদ আর রাজগুরু উঠল জয়গোপালের সাইকেলে আর অপর সাইকেলখানা নিল ভগত সিং। সাইকেলে ওঠবার আগে ভগত সিং তার মাথার টুপিটা সরিয়ে জয়গোপালের লুঙ্গি দিয়ে পাগড়ি বাঁধবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে সুবিধে হল না। ভগত সিং লুঙ্গিটা সেইখানে ফেলে দিয়ে সাইকেল

চালিয়ে চলে গেল। লুঙ্গিটা পরে কনস্টেবল তালে মান্দ কুড়িয়ে পেয়েছিল।

ওরা তিনজন ডি এ ডি কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে দেব সমাজ রোডে পড়ল। এই রাস্তায় তিনজন ছাত্র ছিল তার মধ্যে আজমির সিং এর একটা সাইকেল ছিল। সাইকেলখানা ওরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই ছাত্র তিনজন বাধা দেয়। নতুন ঝামেলা এড়াবার জন্যে ওরা চেষ্টা ছেড়ে দেয়।

কাছে ছিল আতা মহম্মদের সাইকেলের দোকান। দোকান থেকে আজাদ অথবা রাজগুরু একটা সাইকেল নিয়ে তাতে উঠে পড়ে। আতা মহম্মদ আর একটা সাইকেল নিয়ে ওদের অনুসরণ করতে থাকে। ওরা তখন আতা মহম্মদের সাইকেলটা রাস্তায় ফেলে রেখে রাস্তার ধারে বেড়া ডিঙিয়ে সেক্রেটারিয়েটের রাস্তা ধরে সরে পড়ে। ওদের আর দেখতে পাওয়া যায় নি।

ওদিকে জয়গোপাল কোথায় একটা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘোরাপথে এসে ভেটেরিনারি কলেজ ঘুরে সুইমিং বাথের কাছে এসে যায়। এইখানে ডি এস পি মরিস সায়েব আততায়ীদের সন্ধান করছিল। জয়গোপালকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে সে কাউকে পালাতে দেখেছে কি না। জয়গোপাল বেমালুম উত্তর দিল ঃ কেউ পালাচ্ছে নাকি ? কই সে তো কিছু জানে না।

সাড়ে পাঁচটার সময় জয়গোপাল মোজাং হাউসে ফিরে যায়, মহাবীর সিং ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আজাদ, রাজগুরু এবং ভগত সিং আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। রিভলভার ও পিস্তলগুলি শুকদেব অন্যত্র সরিয়ে ফেলল।

জয়গোপালকে দেখে ভগত সিং বলল স্কট মরে নি, মরেছে অ্যাসি-স্ট্যাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্স। জয়গোপাল চিনতে ভুল করেছিল।

থানার সামনে যখন গুলি চলছিল তখন ঐখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল আবদুল্লা। কোর্ট স্ট্রিটের মোড়ে সে গাড়ি থামায়। ঐ গাড়ি

করেই সণ্ডার্সের লাস তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

জয়গোপাল আর মহাবীর সিং মোজাং হাউসে রয়ে গেল। আজাদ, শিবরাম রাজগুরু এবং ভগত সিংকে রাত্রি ৯টা আন্দাজ সময় কৃপারাম স্ট্রিটের বাড়িতে শুকদেব ওদের নিয়ে গেল।

এই হল সরকার পক্ষের কেস। আসামীকে নিজেদের জন্যে উকিল ব্যারিস্টার দাঁড় করায়নি এমন কি তারা আদালতেও হাজির হত না, হয় নানাভাবে বাধা দিত অথবা তারা জেলখানায় মাঝে মাঝে যে অনশন করত তার জন্যে দুর্বল হয়ে পড়ত অতএব আদালতে হাজির হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। একমাত্র বিজয়কুমার সিংহ ও অজয়কুমার ঘোষ শুধু একজন উকিল দিয়েছিলেন। তাঁর নাম আমলোকরাম কাপুর।

আসামীরা আদালতে হাজির হচ্ছেন না অথচ বিচার চালু রাখতে হবে এজন্যে অর্ডিনান্সের বিশেষ বিশেষ ধারা অনুসারে আদালতকে অর্ডার ইস্যু করতে হত।

১৯৩০ সালের ৫মে তারিখে বিচার আরম্ভ হয়েছিল, ৭ অক্টোবর তারিখে ট্রাইবুনাল জানিয়ে দিল যে অভিযুক্ত আসামীদের অপরাধ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ভগত সিং, শিবরাম রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হল। দেশরাজ, যতীন সান্যাল এবং অজয়কুমার ঘোষকে মুক্তি দেওয়া হল। অন্যান্যদের দ্বীপান্তর বা জেলে পাঠান হল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা

১৮৮৩ সালে কলকাতার হাইকোর্টে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল।

সেদিন সেই মামলা সারা দেশে যে কি বিপুল প্রতিক্রিয়া আর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তা আজ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আজকাল আমরা এই ধরনেব শত শত মামলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু তখন এমন কঠোর ভাষায়, ইংরেজ বিচারপতিদের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে কেউ সাহস করত না এবং সেজন্য আদালত অবমাননার মামলাও বিরল ঘটনা ছিল।

বলতে কি সুরেন্দ্রনাথের এই সমালোচনা শাসকদেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সমতুল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। তখককাব জনসংখ্যার অনুপাতে আদালতে বিপুল জনসমাগম হত।

রাজনীতিক চেতনা তখন সবেমাত্র দেশবাসীব মনে জাগরুক হচ্ছে অতএব সুরেন্দ্রনাথের ধারালো কলমের সমালোচনা দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং যখন তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হল তখন তো দেশ প্রায় জেগে উঠল।

সুরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে আদালত অবমাননার এই মামলা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিদের মধ্যে একত্ববোধ জাগিয়ে তুলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন বেঙ্গলী নামে ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক। ১৮৮৩ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে বেঙ্গলীতে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের কিছু সারাংশ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে :

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এতদিন ধরে আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছিলেন। অবিশ্যি মাঝে মাঝে তাঁরা ভুল করেছেন এবং কর্তব্য কর্মসাধনে মাঝে মাঝে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু

উত্তেজনা বা ধৈর্যচ্যুতির বশে তাঁরা ভুল করেন নি। বর্তমানে আমাদের হাইকোর্টে এমন একজন বিচারপতি এসেছেন যিনি বস্তুতঃ পক্ষে কুখ্যাত বিচারপতিদ্বয় জেফ্রিস ও স্ত্রগের নাম মনে পড়িয়ে না দিলেও তিনি এই ঐতিহ্যশালী ও ন্যায়াধীশের আসন অলংকৃত করবার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। আমরা এই পত্রিকাতে বিচারপতি নরিসের আদালতের মামলার বিবরণী প্রকাশ করেছি ও তাঁর সঙ্গে একমত হইনি কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আমাদের সহযোগী 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংবাদটি এইরূপ : বিচারপতি নরিস গঙ্গা নদীতে আগুন লাগাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি যে কিরকম জবরদস্ত জজ সায়েব তা দেখুন। সনাক্তকরণের জন্যে তিনি আদালতে শালগ্রাম শিলা হাজির করিয়ে ছেড়েছেন। হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে হাইকোর্টে এবং তদানিন্তন সুপ্রিমকোর্টে অনেক মামলা হয়ে গেছে কিন্তু হাইকোর্টের ভেতরে হিন্দুর কোনো গৃহদেবতার প্রবেশ করার সৌভাগ্য হয় নি। বিচারপতি নরিসের কৃপায় সে সৌভাগ্যও হল। দেখা যাচ্ছে যে বিচারপতি নরিস আইন ও চিকিৎসাবিদ্যাতেই পণ্ডিত নন তিনি হিন্দু দেবমূর্তিরও সমজদার। তিনি যে কি নন তা বলা খুব শক্ত। গৃহদেবতাকে আদালতে হাজির করার ব্যাপারটা গোঁড়া হিন্দু পরিবার কিভাবে মেনে নেবে জানি না কিন্তু এই একরোখা ও অস্থিরমতি ছোকরা বিচারপতির কার্যাবলীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের সচেতন হওয়া উচিত।

হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান অনুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই শুদ্ধভাবে পূজার যে শিলাকে স্পর্শ করবার অধিকারী সেই শিলাকে আদালতে টেনে আনা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন যে বিচারপতি করুন না কেন তা আমরা সহ্য করতে পারি না। এই ব্যাপারে ভারত সরকার কি নীরব থাকবেন? মানুষের ধর্মভাবের প্রতি সরকার সর্বদাই সহনশীল বলে আমরা জানি।

কিন্তু আমরা এমন একজন বিচারপতির দর্শন পাচ্ছি যিনি বিচারের

নামে ধর্মপরায়ণ হিন্দুদের মনে আঘাত দিয়েছেন। এই মামলার প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই বিচারপতির আচরণ সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

বেঙ্গলীতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরই পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক রামকুমার দে র নামে হাইকোর্ট থেকে নোটিস জারি করে কৈফিয়ত দাবি করা হল। আদালত অবমাননা ও বিচারপতির বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্যে তাঁদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে না কেন অথবা আইনানুসারে তাঁদের অন্য দণ্ড দেওয়া হবে না কেন ; পরদিনই কারণ দর্শাবার আদেশ দেওয়া হল।

৫ মে ১৮৮৩ তারিখে হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে মামলা উঠল। পাঁচজন বিচারপতি বিচার করবেন, প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ, বিচারপতি কানিংহাম, ম্যাককনেল, নরিস স্বয়ং এবং স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট ডব্লু. সি বনার্জি তখন হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদের পুরোধা। তিনি সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থনে রাজি হলেন কিন্তু এক শর্তে যে সুরেন্দ্রনাথ আদালতের কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং বিচারপতি ফ্রিম্যান নরিসের বিরুদ্ধে ক্রগ ও জেফ্রিসের সঙ্গে তুলনা করে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা উত্তেজনার বশে লেখা বলে তিনি স্বীকার করবেন।

বিচারের দিন আদালত কক্ষের ভেতরে ও বাইরে প্রচণ্ড ভিড়, এমন ভিড় সে সময়ে কোনো আদালতে দেখা যায় নি।

আদালত বেলা ১০টায় আরম্ভ হওয়ার কথা কিন্তু বিচারপতিরা বেলা সাড়ে এগারোটায় আসন গ্রহণ করলেন। বিলম্বের কারণ পরে জানা গিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথকে কি শাস্তি দেওয়া হবে এ বিষয়ে বিচার বসবার আগে বিচারপতিরা নাকি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে জেলে পাঠানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন

চারজন সায়েব বিচারপতি কিন্তু রমেশচন্দ্র মিত্রর ইচ্ছা হালকা কোনো সাজা যথা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হক।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতমূলক "এ নেশন ইন মেকিং" গ্রন্থে লিখেছেন: শোনা গিয়েছিল যে পূর্বদিন প্রধান বিচারপতি তাঁর বাড়ি (রমেশ মিত্রের) গিয়েছিলেন এবং অধিকাংশের মতে মত দেবার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হল, বিচারপতি মিত্র রাজি হলেন না।

সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে একটি এফিডেভিট দাখিল করলেন। তিনি বললেন: প্রবন্ধটি প্রকাশ করার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করছেন, তাঁর মুদ্রক রামকুমার দে নন কারণ রামকুমার ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ। সম্পাদকীয় কোনো লেখায় তাঁর কোনো হাত নেই। তিনি যা লিখেছেন তা জনসাধারণের স্বার্থে এবং এই বিশ্বাসে যে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য। পরে তিনি জেনেছিলেন যে আদালতে শালগ্রাম শিলা আনয়ন ব্যাপারটি সম্বন্ধে পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা ভ্রমাত্মক ও ত্রুটি-পূর্ণ। বিচারপতি নরিস জবরদস্তি করে শালগ্রাম শিলা আনিয়েছিলেন বলে প্রকাশ কিন্তু মামলাটির দুই পক্ষই ছিলেন হিন্দু এবং অপর পক্ষের চাপে পড়ে বিচারপতি শালগ্রাম শিলাটি আদালতে হাজির করার আদেশ দিতে বাধ্য হন। অতএব মাননীয় বিচারপতিব প্রতি তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার জন্যে দুঃখিত এবং এজন্য তিনি সময় প্রার্থনা করছেন কারণ তিনি মনে করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে যে নোটিস জারি করা হয়েছে তা এই আদালতের ক্ষমতার বাইরে। এই প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ প্রদর্শনের জন্যে উঠে সুরেন্দ্রনাথের কৌসুলি ডব্লু সি বনার্জি ক্ষমাভিক্ষা সমেত অংশ সম্বলিত এফিডেভিট আদালতে পাঠ করেন এবং মন্তব্য করেন যে আসামী যা বলেছেন তা সরল বিশ্বাসে বলেছেন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। তবে আবেদনকারী মামলা মুলতুবি রাখবার জন্যে যে প্রার্থনা করেছেন তা তিনি চান না কারণ নোটিস

জারি করার ক্ষমতা এই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত কি না সে বিষয়ে তিনি তর্কে প্রবৃত্ত হতে চান না। অতএব শুনানির এখানেই সমাপ্তি।

ওদিকে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। একজন ভাষ্যকারের মতে এস, এন ব্যানার্জি বেডিং ও টুথব্রাস নিয়ে কোর্টে এসেছিলেন। তখনও অবিশ্যি টুথব্রাস প্রচলিত হয় নি।

প্রধান বিচারপতি তখন নিজের বিচারপতি নরিস, কানিংহ্যাম ও ম্যাকডোনেলের পক্ষে রায় দিলেন। রায়দান প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বললেন: সমর্থন করা যায় না এমন একটা বেআইনী কাজ আপনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা না করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন এবং এই আদালতের এক্তিয়ার সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলে আপনার কৌসুলিও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আপনার মতো একজন সুযোগ্য ব্যক্তি যিনি একদা ভারতীয় সিবিল সারভিসে ছিলেন এবং বর্তমানে একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে হাই-কোর্টের একজন বিচারপতিকে অপমান ও সাধারণের বিদ্রূপের পাত্র রূপে দেখাবার জন্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করবেন এবং আমরা মনে করি যে আপনার দেশবাসীও আপনার এই কাজ সমর্থন করবেন না

আপনি আপনার এফিডেভিটে বলেছেন যে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপি-নিয়নে প্রকাশিত বিবরণের ওপর নির্ভর করে আপনি বিচারপতি নরিসের সমালোচনা করেছেন। অথচ তা অযৌক্তিক ও অন্যায়। কারণ ওপিনিয়নে প্রকাশিত ঐ বিবরণী পাঠ করে ভুল বোঝবার অবকাশ আছে।

সরল বিশ্বাসের বশবর্তি হয়ে লিখিত এরকম মানহানিকর একটি প্রবন্ধ আপনার সংবাদপত্রে কিভাবে প্রকাশিত হতে পারে বিচার-পতিরা তা বুঝতে পারছেন না। বিচারপতিরা বিশ্বাস করতে

পারছেন না যে আপনার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত এবং সংবাদপত্রের একজন সম্পাদক মানহানির আইন সম্বন্ধে এতদূর অনভিজ্ঞ হতে পারেন এবং যা লিখেছেন তাও অন্য একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ওপর নির্ভর করে।

প্রেসিডেন্সি জেলের দেওয়ানি বিভাগ দু মাস কারাদণ্ড ভোগ করবার আদেশ আদালত কর্তৃক আপনার প্রতি প্রদত্ত হল।

বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র অন্যান্য বিচারপতির সঙ্গে দণ্ড সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। তিনি তাঁর পৃথক রায়ে বলেন যে আদালতকে চূড়ান্ত ভাবে অপমান করা হয়েছে কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানাই যথেষ্ট ছিল। এ বিষয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে পিকার্ড মামলা এবং টেলরস মামলার নজির দেখান।

বিচারপতি আরও বলেন যে এই উভয় মামলাতেই আসামীরা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নি কিন্তু বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবার পর তারা ক্ষমা ভিক্ষা করে।

বর্তমান মামলায় আসামী আগেই অপরাধ স্বীকাব করেছেন এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

প্রথম মামলার প্রধান বিচারপতি স্যার বারনেস পিকক আসামীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। আদালত মনে করেছিল দোষ স্বীকার ও ক্ষমা ভিক্ষাই যথেষ্ট। তবে দ্বিতীয় আসামীকে জরিমানা দিতে হয়েছিল, কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় নি।

টেলর সাহেব যে অপরাধ করেছিলেন তার গুরুত্ব সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ অপেক্ষা যখন লঘু নয় তখন জরিমানা করাই যথেষ্ট ছিল বলেই আমি মনে করি।

সুরেন্দ্রনাথকে দণ্ডবিধান করার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। দারুন গোলমাল ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলেজের ছাত্র। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রচণ্ড হৈ চৈ করেছিলেন।

তখন কি এই যুবক আশুতোষ জানতেন যে তিনি নিজে

একদিন এই হাইকোর্টের বিচারপতি হবেন এবং প্রধান বিচারপতির আসনও অলংকৃত করবেন ?

ক্রমশ এই শাস্তির বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠল এবং বলতে কি গঙ্গায় আগুন সুরেন্দ্রনাথই লাগিয়েছিলেন।

লণ্ডন টাইমস-এর কলকাতার সংবাদদাতা ৪ জুন তারিখে তাঁর কাগজে তারবার্তায় লিখেছিলেনঃ গত তিন সপ্তাহ ধরে আন্দোলন ও প্রতিবাদ যেভাবে চলছে সেই ভাবে চলতে থাকলে সরকারকে এই আন্দোলন ও প্রতিবাদ বেকায়দায় ফেলবে ।

এই মামলা যেমন একাধারে দেশের লোককে জাগিয়ে তুলেছিল তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ক্রমে মুকুটহীন রাজার আসনে বসিয়েছিল। এই মামলাই হল স্যার সুরেন্দ্রনাথের জীবনে নেতৃত্বের প্রথম সোপান।

শহীদগঞ্জ মসজিদ মামলা

ইংরেজি ১৭২২ সালে ফলাক বেগ খাঁ লাহোরের নওলাখা বাজারে আল্লার দুয়ারে প্রর্থনা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মাত্র তিন কানাল পনেরো মারাল জমি যখন দান করেছিলেন তখন তিনি একবারও কল্পনা করতে পারেন নি যে ভবিষ্যতে এই জমির ওপর নির্মিত মসজিদ সারা উত্তর ভারতে আগুন জ্বালাবে।

সম্পত্তি দান করে এবং তা তদারক করবার জন্য ফলাক বেগ খাঁ বংশপরম্পরায় শেখ দিন মহম্মদকে মতোয়ালি নিযুক্ত করলেন। উক্ত জমি, একটি মক্তব এবং একটি ফলের বাগান ঐ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সত্য মিথ্যা জানা নেই তবে জনশ্রুতি এই যে বহুদিন পূর্বে তদানিন্তন লাহোরের শাসনকর্তার তরবারির আঘাতে অনেক নারী ও শিশু সমেত ভাই তরু সিং ঐ মসজিদ সংলগ্ন জমিতে শহীদ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল
সুহীদগঞ্জে রক্তবরণ
হইল ধরণীতল।

সেই জমির ওপর ভাই তরু সিং এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি গুরুদ্বার নির্মিত হয়েছিল। এই পবিত্র স্থানটি শহীদগঞ্জ এবং ফলাক বেগ খাঁ প্রদত্ত জমির ওপর নির্মিত মসজিদ শহীদগঞ্জ মসজিদ নামে পরিচিত ছিল।

মসজিদের বয়স চল্লিশ বছর হতে না হতে ১৭৬২ সালে ভাঙ্গি

সর্দাররা লাহোর দখল করেছিলেন এবং পাঞ্জাবে শিখ শাসন কায়েম করলেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর মৃত্যুর পর ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশরা পাঞ্জাব দখলের পূর্ব পর্যন্ত পাঞ্জাব শিখদের অধিকারে ছিল।

শিখ শাসনকালে শহীদগঞ্জ মসজিদে প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে। পাশেই শহীদগঞ্জ গুরুদ্বার থাকায় তাদের বোধহয় অসুবিধে হত। মসজিদের প্রতি আর কোনো মনোযোগ নেই, মসজিদ মেরামত হয় না, বিবর্ণ মসজিদ ভেঙ্গে পড়তে লাগল, মিনারে ও গম্বুজে ফাটল ধরল।

এমন কি শেখ দিন মহম্মদের উত্তরাধিকারীরা এই সম্পত্তির প্রতি আর মনোযোগ না দেওয়ায় তারা সম্পত্তির ওপর অধিকার হারাতে বসল।

একদা তৈমুর বা গজনির সুলতান বা ঔরংজীব যদি হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করে থাকেন তাহলে ভাঙ্গি সর্দারও যে সমস্ত মসজিদকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবে তা হয়তো আশা করা যায় না। যেমন ঔরংজীব নির্মিত লাহোরের গর্ব 'শাহী' মসজিদটি নাকি লাহোরের শাসনকর্তা আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করতেন।

শহীদগঞ্জ মসজিদও নাকি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। মসজিদের ভেতরে আড়তদাররা ভূষির বস্তা মজুত রাখত।

পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৮৫০ সালে শেখ দিন মহম্মদের একজন উত্তরাধিকারী নুর আমেদ মতওয়ালির দাবিতে শহীদগঞ্জ মসজিদ ও সংলগ্ন সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন। শহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের মহান্তরা তখন উক্ত মসজিদ ও সংলগ্ন সম্পত্তি দখল করে নিজেদের মতওয়ালি বলে দাবি করছেন। নুর আমেদ মহান্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আনলেন।

এই মামলাতে নুর আমেদের সুবিধে হল না এবং তিন বছর পরে একটি সেটেলমেণ্ট কেসেও সুবিধে করতে পারলেন না নুর আমেদ। তবুও নুর আমেদ ছাড়লেন না।

২৫ জুন ১৮৫৫ তারিখে নুর আমেদ লাহোরে ডেপুটি কমিশনারের আদালতে মামলা রুজু করলেন, অভিযোগ যে শিখ সমপ্রদায় তার জমি ও সম্পত্তি দখল করেছে।

নুর আমেদ আবার হেরে গেলেন। ডেপুটি কমিশনার তাঁর অভিযোগ অগ্রাহ্য করলেন। ঐ জমি ও সম্পত্তি অতি দীর্ঘ দিন নুর আমেদের বেদখলে রয়েছে।

ঐ একই যুক্তিতে ১৮৫৬ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে কমিশনার এবং ঐ বছরেই ১৭ জুন তারিখে জুডিসিয়াল কমিশনার তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করলেন অর্থাৎ শহীদগঞ্জ মসজিদের জমি ও সম্পত্তি শহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের মহান্তদের দখলেই রয়ে গেল।

দখলদার যেই হক এবং সেটি মুসলিমদের বা শিখেদের প্রার্থনা-ভবন যাই হক না কেন, ইমারতটি অবহেলিত হতে থাকল। ভাঙাচোরা ইমারতটিও যার যেমন ভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করতে লাগল, যেন বেওয়ারিস সম্পত্তি। আগেই তো মিনার ও গম্বুজে ফাটল ধরেছিল, কিছু অংশ ভেঙে পড়তে লাগল এবং দরজা জানালাও কে কোথায় খুলে নিয়ে গেল।

হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি পরিচালনার জন্যে যেমন সরকারি আইন আছে এবার তেমনি শিখ গুরুদ্বার পরিচালনার ব্যাপারে শিখ গুরুদ্বার অ্যাক্ট ১৯২৫ সালে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হল।

এতদিন বিভিন্ন শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পরিচালনা নিয়ে নানা বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছিল কিন্তু এখন আইন হওয়ার ফলে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হল। গোলমাল দেখা দিলে আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে।

সমস্ত গুরুদ্বার, গুরুদ্বারভুক্ত সম্পত্তি ও পরিচালকমণ্ডলী রেজিস্টারভুক্ত করবার জন্যে উক্ত আইনের বলে শিখ গুরুদ্বার ট্রাইবুনাল গঠিত হল। এই ট্রাইবুনাল গুরুদ্বার সম্পত্তি এবং পরিচালকদের তালিকা প্রস্তুত করবেন।

শহীদগঞ্জ মসজিদ নিয়ে নানা গোলমাল দেখা দিল। সভেরোজন

বিভিন্ন ব্যক্তি ঐ মসজিদের সম্পত্তি দাবি করল। তার মধ্যে প্রধান ছিল দুটি পক্ষ।

৮ মার্চ ১৯২৮ তারিখে জনৈক হরনাম সিং উক্ত সম্পত্তি তার ব্যক্তিগত অধিকারে আছে বলে দাবি করলেন। তিনি বললেন ঐ সম্পত্তির মালিক গুরুদ্বারের মালিকরা নয়।

অপর পক্ষ হলেন আঞ্জুমান ইসলামিয়া। ১৬ মার্চ ১৯২৮ তারিখে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়ে, তাঁরা ঐ-মসজিদ ও সম্পত্তি দাবি করল।

২২ ডিসেম্বর ১৯২৮ তারিখে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হল। ঐ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শহীদগঞ্জ মসজিদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন শিখ গুরুদ্বার শহীদগঞ্জ ভাই তরু সিং।

আঞ্জুমান ইসলামিয়া এবং হরনাম সিং হেরে গেলেন। পূর্বের নজির বলে আঞ্জুমানের দাবি নাকচ করা হল। তারা আর কোনো আপিল করল না। হরনাম অবশ্য হাইকোর্টে গিয়েছিল কিন্তু তার আপিল ডিসমিস করে দেওয়া হল। ১৯৩৪ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে হাইকোর্ট রায় দিলেন, গুরুদ্বারের মহান্তদের হাতেই সম্পত্তির দখল ও পরিচালনভার দেওয়া হল।

অতএব মসজিদ শহীদগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন জমি ও সম্পত্তির দখল ও পরিচালন ভার গ্রহণ করলেন শ্রোমানি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি। এই কমিটি গুরুদ্বার ভাই তরু সিং-এরও পরিচালক।

সরকারি ঘোষণা তো আগেই জানানো হয়েছিল এখন হরনাম সিং-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায় যখন জানানো হলো, তখন পাঞ্জাব নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত অতএব উক্ত রায় কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। পরবর্তী ছ মাস শহীদগঞ্জ মসজিদ সম্বন্ধে কিছু শোনা গেল না।

তারপর শীত কেটে গেল, গ্রীষ্ম এল। পাঞ্জাববাসীরাও গরম হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর অনশনের ফলে বিলেতের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর ঐতিহাসিক কমিউনাল অ্যাওআর্ড বা

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবা ঘোষণা করেছেন কিন্তু তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয় নি।

এরপর করাচিতে ফায়াবিং সারা ভাবতে মুসলিম জনচিত্তকে বিচলিত করল। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলিমরা শহীদগঞ্জ মসজিদ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শুরু করল। আইন শিখদের অনুকূল হতে পারে কিন্তু আল্লা জানেন এ মসজিদ কাদেব।

১৯৩৫ সালেব জুলাই মাসে কোয়েটায সর্বনাশা ভূকিমম্প হয় এবং সারা দেশ যখন নিহত ও আহতদেব প্রতি সহানুভূতিশীল তখন পাঞ্জাবে দুই সম্প্রদায়েব মধ্যে মন কষাকষি চলছে। মোটেই ভাল লক্ষণ নয়।

গুজব ছড়িয়ে পডল যে শ্রোমানি গুরুদ্বাব প্রবন্ধক কমিটি নাকি শহীদ-গঞ্জ মসজিদ ভেঙে জমি সমভূমি করে সেই জায়গায় একটি গুরুদ্বাব নির্মাণ কববে কাবণ আইন তাদেব অনুকূলে।

এদিকে প্রদেশেব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিখ জাঠা দলে দলে লাহোবে এসে জমায়েত হতে লাগল। পবিস্থিতি দেখে মনে হল প্রবন্ধক কমিটি আইনবলে প্রাপ্ত তাদের অধিকাব অক্ষুণ্ণ বাখবার জন্যে একটা কিছু কবতে চলেছে। ১ জুলাই তাবিখে ডেবা সাহেব গুরুদ্বাবে চাব হাজাব সশস্ত্র খালসাব বেশ বড একটা মিটিং হয়ে গেল। অনেকেই জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বলা বহুল্য, শহবেব মুসলমানেবা প্রচণ্ড চঞ্চল হযে উঠল। শহীদগঞ্জ মসজিদেব ওপব তাদেব সমপ্রদায়েব একটা নৈতিক দাবি আছে। সেইদিনই তাঁদেব কযেকজন নেতা ডেপুটি কমিশনার এস প্রতাপের সঙ্গে দেখা কবে পবিস্থিতিব গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে দিলেন।

ডেপুটি কমিশনাব প্রতাপ মুসলমানদের আশ্বাস দিলেন যে মসজিদ তিনি ভাঙতে দেবেন না। এই সংবাদ ১৯৩৫ সালের ৩ জুলাই তারিখে সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটাবি গেজেটে ছাপা হল।

শহরে চাপা উত্তেজনা। ডেপুটি কমিশনার শহরে ঢোল পিটিয়ে দুই

সম্প্রদায়ের লোককে সতর্ক করে দিলেন। ঢোল পিটিয়ে বলে দেওয়া হল ঃ

'লাণ্ডা বাজারে শহীদগঞ্জ গুরুদ্বার সীমানার মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন একটি মসজিদের অংশ ভেঙে ফেলা হবে বলে গুজব উঠেছে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেকেই গুরুদ্বারের সম্মুখে জমায়েত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ওদিকে গুরুদ্বারের বিপদ আশঙ্কা করে বাইরে থেকে বহু 'শিখ জাঠা' শহরে প্রবেশ করছে।

মসজিদ এবং গুরুদ্বার নিরাপদে আছে এবং এই দুটি রক্ষা করতে কর্তৃপক্ষ কৃতসঙ্কল্প। বিবাদের মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ ও গুরুদ্বার রক্ষা করবার সকল প্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

দাঙ্গা বা গুণ্ডামি দমনের যে কোনো প্রচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে।

শহরে উত্তেজনা কিন্তু কমল না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও উত্তেজনা কমাবার নানা চেষ্টা করা হল কিন্তু কোনো দলই কোনো কথা শুনতে চায় না বরঞ্চ অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকল।

শহর আরও শিখ জাঠা আসতে লাগল। শোনা গেল যে শিখরা যদি 'মোর্চা' করে তাহলে সর্দার বাহাদুর মেহতাব সিং এক লক্ষ টাকা চাঁদা দেবেন ও এক হাজার 'সেবাদার' এবং আরও হাজার বস্তা ময়দা দেবেন। একথা তিনি নাকি নিজে গোপন মিটিং-এ ঘোষণ করেছেন।

মুসলমানেরাও চুপ করে বসে নেই। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় হাজার মুসলমানের এক মিছিল দিল্লি গেট থেকে বেরিয়ে শহীদগঞ্জের দিকে অগ্রসর হল।

লাহোরের সিটি ম্যাজিস্ট্রেট সর্দার নিরন্দর সিং মিছিলের গতি অবরোধ করে ছত্রভঙ্গ হতে আদেশ করলেন। মিছিল আদেশ

শুনল না অতএব পুলিস বেটন চার্জ করল। এবার জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

জনতা ছত্রভঙ্গ হলেও উত্তেজনা তো কমল না, জনতা যেকোনো সময় ফেটে পড়তে পারে। তখন কয়েকজন শান্তিকামী ব্যক্তি পরদিন ৪জুলাই এক বৈঠকে মিলিত হলেন। তাঁরা শান্তির জন্য আবেদন করলেন। এজন্যে তাঁদের প্রচণ্ড কঠিন পরিশ্রম ও অশেষ অনুনয় বিনয় করতে হয়েছিল।

ঐ মিটিং-এ মুসলমানদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন 'জমিদার' কাগজের সম্পাদক মৌলানা জাফর আলি খাঁ, 'সিয়াসত' কাগজের সম্পাদক সৈয়দ হাবিব, অরহরদের পক্ষে মৌলানা দাউদ গজনভি এবং স্থানীয় একজন নেতা কে এস আমির-উদ-দিন।

শিখদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সম্প্রদায়ের নেতা মাস্টার তারা সিং, সর্দার ঈশর সিং মাঝাইল, জ্ঞানী গুরমুখ সিং এবং সর্দার মঙ্গল সিং। শেষের তিনজন সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির মেম্বার।

বৈঠকে কোনো গোলমাল, তর্কবিতর্ক বা দোষারোপ, কিছুই দেখা গেল না। শান্ত পরিবেশেই মিটিং শেষ হল। বৈঠকে স্থির হল যে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্যে মুসলমানেরা তাদের দাবি লিখিতভাবে পেশ করবে। নেতারা সন্তুষ্টচিত্তে যে যাব ঘরে ফিরলেন। দাবির খসড়া প্রস্তুত করবার জন্যে ব্যারিস্টার মিঞা আবদুল আজিজের নেতৃত্বে মুসলমান নেতারা বরকত আলি ইসলামিয়া হলে মিলিত হলেন। শিখসম্প্রদায়কে অনুরোধ করা হল যে শহীদগঞ্জ মসজিদ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হক এবং মসজিদ পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে মসজিদ ও গুরুদ্বারের মধ্যে একটি পাঁচ ফুট করিডর দেওয়া হক।

পরদিন কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটল। শহীদগঞ্জ গুরুদ্বারের দিকে তিন হাজার মুসলমানের এক বিরাট মিছিল এগিয়ে চলল। পুলিস আগেই খবর পেয়েছিল। গুরুদ্বারের ফটক থেকে এক-শ' গজ

দূরে পুলিস মিছিলের গতি অবরোধ করল। প্রায় পাঁচ-শ পুলিস আনা হয়েছিল।

পুলিস করল লাঠিচার্জ আর অপর পক্ষ ছুঁড়তে লাগল ইট পাটকেল। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট সর্দার নিরন্দর সিং এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর মহম্মদ বকির আহত হলেন।

ট্রেন, লরি ও বাসে চেপে শিখ জাঠা কিন্তু শহরে আসতেই থাকল, সরকারও তাদের আসা বন্ধ করল না। এদিকে ওদিকে শিখ ও মুসলমানেরা জমায়েত হয়ে মিটিং করতে লাগল।

একটা মিটিং-এ চার হাজার শিখ জমায়েত হল। তাদের হাতে কৃপাণ তো ছিলই, অনেকের হাতে তরবারিও ছিল। শিখ মহিলাদের-ও একটা জাঠা শহরে প্রবেশ করল। শহরের বাইরে পাঁচিলের ধারে মুসলমানদের বিরাট এক মিটিং হল, পঁচিশ হাজার মুসলমান সেই মিটিং-এ জমায়েত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, দুই পক্ষের নেতারাই গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে আকাশ বাতাস গরম করে তুলছিলেন।

শহরের পুলিস বাহিনীর ওপর ম্যাজিস্ট্রেট ভরসা রাখতে পারলেন না। মিলিটারি ডাকলেন। রয়েল স্কটস এবং ফোরটিনথ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট শহরে টহল দিতে লাগল। সিক্সথ আরমারড কার কম্পানির বর্মাবৃত গাড়িও শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বার করা হল। তখন ঘন ঘন বা একেবারেই কারফু জারি করার রেওয়াজ ছিল না।

পাঞ্জাবের গভরনর স্যার হার্বার্ট এমারসন তখন ছিলেন সিমলায়। তিনি আর সেখানে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। পরিস্থিতি গুরুতর। ৬ জুলাই তিনি লাহোরে নেমে এলেন।

গভর্নমেণ্ট হাউসে পৌঁছেই গভরনর মুসলিম ও শিখ নেতাদের ডেকে পাঠালেন। বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত মুসলিম নেতাদের সঙ্গে এবং বিকেলে তিন ঘণ্টাধরে শিখ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হল না।

ইতিমধ্যে শহরে গুজবের প্রতিবাদে সরকার একটি বিবৃতি প্রচার

করলেন। এক নম্বর গুজব শহীদগঞ্জ মসজিদের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সরকার বললেন প্রাচীর ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে।

দু নম্বর গুজব, শহরে অপর সম্প্রদায়ের লোকজনদের ধবে নির্বিচারে মারধোর করা হচ্ছে। সরকার প্রতিবাদে বললেন, মোটে দুটি ক্ষেত্রে মারামারির রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

তিন নম্বর গুজব, সেটা পরে প্রচারিত হয়েছিল, শহীদগঞ্জের মসজিদ এবার সত্যিই শিখরা ভেঙ্গে ফেলছে। সরকার এবারও বলল যে গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সরকারের এই ইস্তাহার পরদিন সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। গভরনর তখন স্বয়ং পরিস্থিতির ভার নিয়েছেন এই সংবাদে জনসাধারণ কিছু আশ্বস্ত হল এবং আন্দোলনকারীদের উত্তেজনাও কিছু প্রশমিত হল।

পরদিন সোমবার ৮ জুলাই আবার অন্যরকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল। সরকারী ইস্তাহারে নাকি ভুল খবর প্রচারিত হয়েছে। শহীদগঞ্জ মসজিদ নাকি ভাঙা শুরু হয়ে গেছে এবং অনেকটাই নাকি ভাঙা হয়ে গেছে। সাবল গাঁইতি তো সমানে চলছে এমন কি ডিনামাইটও নাকি ব্যবহার করা হয়েছে। একদিনের মধ্যেই নাকি শহীদগঞ্জ মসজিদ সমভূমি হয়ে গেছে। মসজিদের চিহ্নও নাকি আর নেই।

আবার একটা ইস্তাহাব প্রচারিত হল। রবিবার রাত্রেই একটি মিটিং হয়, সেই মিটিং-এ স্থির হয় যে গোলমালের দরকার কি, মসজিদ ভেঙে ফেলা হক এবং সোমবাব সকাল থেকেই ভাঙার কাজ শুরু হয়ে যায়।

ভাঙা আরম্ভ হতেই সরকার খবর পায় এবং ঠিক করে যে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কিছুই করা হয় নি।

সরকার কি করলেন? না, শহীদগঞ্জ মসজিদ যাবার পথে একদল গোরা সৈন্য মোতায়েন করে রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। মানুষ চলাচল ও গাড়ি ঘোড়া যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। অবস্থা পর্যবেক্ষণের

জন্যে আকাশে দু একখানা প্লেন উড়তে লাগল।

আর ওদিকে মসজিদ ভাঙা চলতে লাগল। শিখ সমপ্রদায়ের এই কাজ জানতে পেরে সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। কি সিদ্ধান্ত? শিখদের আইনগত অধিকারে বাধা দিতে সরকার অক্ষম। রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে মুসলিমদের মসজিদের পথে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। অর্থাৎ সরকার যখন দেখলেন যে শিখরা যখন মসজিদ ভাঙবেই এবং ভাঙবার তাদের অধিকার আছে এবং ভাঙতে আরম্ভ করেছে তখন সেই সময়ে মুসলমানেরা স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে শিখদেব কাজে যদি বাধা দেয় তাহলে তো রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যাবে। অতএব ঘটনাস্থলে মুসলমানেরা যাতে যেতে না পারে সেজন্যে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু গভরনর যেখানে পরিস্থিতির ভার নিয়ে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছিলেন সে স্থলে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত তো মসজিদ ভাঙা বন্ধ করতে পারতেন। নাকি সেখানে শিখদের কাজে বাধা দিতে গেলে রক্তপাতের সম্ভাবনা ছিল?

রাস্তার মোড়ে মোড়ে মুসলমানেরা জমায়েত হয়েছিল। তারা ঘটনাস্থলে যেয়ে শিখদের কাজে যে কোন প্রকারে বাধা দেবেই। বেলা ১১টার সময় লাঠি চার্জ করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হল। মুসলমানেরা সঙ্গে সঙ্গে হরতালের ডাক দিল। মুসলমানদের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল।

বিকেলে আবার একটি সরকারি ইস্তাহার প্রচারিত হল। শিখ সমপ্রদায়ের এই হঠকারিতাপূর্ণ কাজে সরকার গভীরভাবে দুঃখিত। তাদের এই কাজ দ্বারা মীমাংসার সব পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে এক শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবিশ্যি এসঙ্গে সম্পত্তির ওপর শিখদের ১৭৫ বৎসরব্যাপী আইনগত অধিকারের কথাও জানিয়ে দেওয়া হল।

এই তো মাত্র গত সপ্তাহে ডেপুটি কমিশনার মিঃ প্রতাপ জানিয়ে দিয়েছিলেন একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মসজিদ ও গুরুদ্বারকে

সর্বতোভাবে রক্ষা করা হবে অথচ দেখা গেল যে শিখরা মসজিদ ভাঙল এবং সবকার আইনের প্রশ্ন তুলে সে কাজে সহায়তা করলেন। অতএব সরকার যা প্রচার করেছিলেন তার আড়ালে কিছু ছিল। খোলাখুলিভাবেই বলা হতে লাগল শিখ সমপ্রদায়কে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে গভরনর স্যার হার্বাট এমারসনের হাত আছে। সাধারণের এই সন্দেহ সরকারের কানে উঠল। সরকার কোনো প্রেস নোট জারি করলেন না বা প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতিও দিলেন না।

ব্যাপারটা এখন আর লাহোর শহরের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সারা পাঞ্জাবেই ঘটনার বিবরণ নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাব সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা।

তাই সকল কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারকে লাহোর সেক্রেটারিয়েট থেকে টেলিগ্রাম করে নিম্নরূপ জানিয়ে দেওয়া হল ঃ

যদি কাবও এমন ধাবণা হয় যে, শিখরা যে কাজ করেছে, তাতে সরকারেব অনুমোদন বা সমর্থন আছে তাহলে জানতে হবে যে এরূপ ধারণা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সরকার এজন্যে শিখ সমপ্রদায়কে নৈতিকভাবে দায়ি করছেন।

শিখদেব সরকার নৈতিকভাবে অথবা যেভাবেই দায়ী করুন না কেন শিখদের এই কাজের জন্য মুসলিম সমপ্রদায় সরকারকে এবং বিশেষ ভাবে গভরনরকে নৈতিকভাবেই দায়ী করলেন।

শহীদগঞ্জের মসজিদ যতক্ষণ ডেপুটি কমিশনার মিঃ প্রতাপের দায়ীত্বে ছিল ততক্ষণ কিন্তু মসজিদের কোন ক্ষতি হয় নি। মিঃ প্রতাপ মসজিদটিকে রক্ষা করেছিলেন তাই গভরর্নর স্বয়ং যখন শান্তির আবেদন করে পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ কাউনসিলে ১৭ জুলাই নিম্নলিখিত রিবৃতি দিলেন তখন তো সকলে হতবাক। বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভরনর বললেন ঃ

অতএব আমি এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে ডেপুটি কমিশনার যিনি এই বিপর্যয়ের মধ্যে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন, কখনও প্রতিজ্ঞা করেন নি যে কোনো

ক্রমেই ইমারতটি ভেঙে ফেলা হবে না। তিনি প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন যে আইনগত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করে যে-পর্যন্ত না পাঞ্জাব সরকার মীমাংসায় উপনীত হতে পারছেন সে-পর্যন্ত তিনি এই কাজ হতে দেবেন না অর্থাৎ মসজিদ ভাঙতে দেবেন না। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম : গভর্নরও একটা বোঝাপড়া অস্বীকার করতে পারেন, সরকার নিজ ইচ্ছানুসারে মসজিদ ভাঙা বন্ধ রাখতে পেরেছিলেন এবং আইনগত প্রশ্ন বিবেচনা করে তাঁরা স্থির করলেন যে শিখদের পথে তাঁরা বাধা হবেন না।

তাহলে আর শিখদের নৈতিকভাবে দায়ী করার অর্থ কি? লাহোর তখন উত্তাল। এখানে ওখানে কিছু ঘটনা ঘটছে। কিন্তু মুসলিমরা মিলিতভাবে কিছু করে উঠতে পারছে না যদিও নানা দিক থেকে নানা প্রস্তাব, নানা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

পাঞ্জাব সরকারের মন্ত্রীসভায় তখন দুজন মুসলিম মন্ত্রী ছিলেন। একজন শিক্ষা মন্ত্রী স্যার ফিরোজ খাঁ নুন অপরজন রাজস্বমন্ত্রী নবাব মজঃফর খাঁ। শহীদগঞ্জের ব্যাপারে তাঁরা কেউ গদি ছাড়তে রাজি নন।

আসল ব্যাপার হল কি তখন শহীদগঞ্জের ঘটনায় পাঞ্জাবে মুসল-মানদের নেতৃত্ব দেবার কেউ ছিল না। তখন পাঞ্জাবে অরহর পার্টি বেশ সক্রিয় ছিল কিন্তু শহীদগঞ্জ মসজিদের জন্যে তারা এগিয়ে এল না। তাদের এই নিষ্ক্রিয়তাই বোধহয় তাদের পার্টির অপমৃত্যু ঘটাল। রাতারাতি একটা নতুন দল এগিয়ে এল। তাদের নাম 'ব্লু শার্ট', তাজা জোয়ান। এরা সব শহীদগঞ্জের ব্যাপারে অরহর পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছে! এদের নেতা মৌলানা জাফর আলি এবং সৈয়দ হাবিব। শহীদগঞ্জের সম্পত্তি উদ্ধার করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাইরে থেকে শিখ জাঠ আসারও বিরাম নেই তবে পুলিস তাদের পথরোধ করছে। তারা আর অগ্রসর হতে পারছে না।

মুসলিমদের ক্ষান্ত করবার জন্যে সরকার বললেন তাঁরা শাহ

চিরাগ মসজিদটি মুসলিমদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেবেন কিন্তু মুসলমানরা তাতে রাজি নয়। শহীদগঞ্জ তাদের চাই।

ব্লু শার্ট দল তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চারজন নেতা মৌলানা জাফর আলি খাঁ, সৈয়দ হাবিব, মিঞা ফিরোজ উদ-দিন এবং মালিক লাল খাঁ এবং আরও কয়েকজনকে সরকার লাহোর থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। পার্টি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ল। নতুন নেতারা তেমন যোগ্য নয়।

১৬ জুলাই লাহোরে ১৪৪ ধারা জারি করা হল। মিছিল বা মিটিং বন্ধ। বারোজন গ্রেফতার হল।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বেরোতে থাকল, মিটিংও হতে লাগল। নমাজের সময় বাদশাহী মসজিদে বিরাট এক মিটিং হল, অনেকে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে সমবেত ব্যক্তিদের গরম করে দিল।

রবিবার অবস্থার অবনতি ঘটল। সৈনিকরা গুলি চালাল। মিছিলে কয়েকজন বালকের মৃত্যু হল।

তবুও মুসলমান নেতাদের মনে সাড়া জাগল না। যারা দু কথা বলতে পারতেন, যাদের কথার গুরুত্ব আছে তারা কিছু বললেন না। ব্লু শার্টের নেতাদের তো বার করে দেওয়া হয়েছে।

স্যার ফজল-ই-হুসেন অসুস্থ, তিনি আবোটাবাদে বিশ্রাম নিচ্ছেন। লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির কোনো সদস্য বা কোনো মুসলিম মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিছু করতে বা বলতে নারাজ। কংগ্রেস ও অরহর পার্টি নিরপেক্ষ।

আন্দোলন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ল। সংবাদপত্রেও খবরের পরিমাণ কমে গেল। আপাততঃ শা চিরাগ মসজিদ নিয়েমুসলমানরা সন্তুষ্ট কিন্তু তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল।

গভর্নর ইতিমধ্যে সিমলা ফিরে গেছেন।

মনে হল যেন পাঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় শহীদগঞ্জ মসজিদের কথা ভুলে গেছে, তারা আর ঐ মসজিদ নিয়ে আন্দোলন করবে না। কিন্তু ভুল। তারা ভোলে নি।

প্রদেশের একজন শ্রদ্ধেয় পীর সাহেব যাঁর নাম পীর সৈয়দ জমাত আলি শা, তিনি তাঁর কয়েক হাজার অনুগামীকে নিয়ে রাওয়াল-পিণ্ডিতে এক বিরাট মিটিং করে ঘোষণা করলেন যে তিনি শহীদগঞ্জ মসজিদ মুসলমানদের জন্যে ফিরিয়ে আনবেন কিন্তু কিভাবে ফিরিয়ে আনবেন সে বিষয়ে কিছু বললেন না।

ইতিমধ্যে কৃপাণ বা তলোয়ার নিয়ে রাস্তায় বেরোন পাঞ্জাবে নিষিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু পীর জামাত আলি শা প্রদেশের বিভিন্ন শহরে যেসব মিটিং করতেন সেইসব মিটিং-এ মুসলমানেরা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে আসত এমন কি লাহোরের রাস্তায় তারা তরবারি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। অতএব শহীদগঞ্জ মসজিদ নিয়ে পরিস্থিতি আবার গরম হয়ে উঠল।

ক্রমশঃ মনে হল যে শিখ মুসলমান যুদ্ধ ব্যতীত শহীদগঞ্জ মসজিদ উদ্ধারের আশা ক্ষীণ অথচ সত্য সত্য যুদ্ধ করবার জন্য বেশি মুসলমান আগ্রহী নয়।

লাহোর হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ডাঃ মহম্মদ আলম, পীর সায়েব সাধারণভাবে মুসলমানদের বললেন শহীদগঞ্জ মসজিদের সম্পত্তির ওপর শিখদের অধিকারের স্বত্ত্ব মোটেই জোরদার নয়। তিনি আবার আদালতে মামলা করে ডিক্রি জারি করিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যে মসজিদ ফিরিয়ে আনবেন।

শহীদগঞ্জ মসজিদ নিযে পাঞ্জাব আবার সরগরম হয়ে উঠল। অবস্থা শান্ত করা দরকার।

মারামারি বা মামলাকরবার আগে সিমলায় বড়লাটের কাছে একটা ডেপুটেশন পাঠান হল।

বড়লাট একটা কনফারেন্স ডাকলেন। যাঁরা ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন তাঁরা ব্যতীত পাঞ্জাবের গভরনর, গভরনরের চিফ সেক্রেটারি মিঃ এফ এইচ পাকল এবং ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের প্রধান স্যার হেনরি ক্রেক হাজির ছিলেন।

ডেপুটেশনিস্টদের শান্ত করবার জন্যে এমারসন এবং পাকল

কয়েক দফা প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু ভবিষ্যতে সেগুলি তাঁরা পালন করলেন না।

আর অপেক্ষা করা গেল না। আদালতে মামলা রুজু করা হল। লাহোরের জেলা আদালতে বিচারপতি মিঃ এস এল সালের এজলাসে ৩০ অকটোবর ১৯৩৫ সালে মামলা উঠল। ওয়াকফ সম্পত্তি রূপে এক নম্বর বাদী হলেন শহীদগঞ্জ মসজিদ স্বয়ং এবং কয়েকজন নাবালক ও পর্দানশিন মহিলা সমেত আরও সতেরোজন ব্যক্তি।

বাদীপক্ষ দাবি করল যে ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসের ৭ ও ৮ তারিখে শ্রোমানি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি মসজিদটি ধুলিসাৎ করে অন্যায় করেছে। যে জমিতে মসজিদ ছিল সেটি পবিত্র স্থান। নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে সেই জমি ব্যবহার করা উচিত নয় অতএব মুসলমানদের ঐ জমিতে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হক এবং এজন্য তাদের যেন কোনো বাধা দেওয়া না হয়। এই উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্যে বাদীপক্ষকে অনুমতি দেওয়া হক।

প্রতিবাদীপক্ষ বলল ঐ জমি গত ১৭০ বৎসর তাদের দখলে আছে এবং ঐ জমির ওপর কোনো মসাজদ ছিল না।

দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলল। মসজিদের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া গেল না তবে ১৭৫২ সাল থেকে উক্ত সম্পত্তি শিখ সম্প্রদায়ের দখলে ছিল ইত্যাদি যুক্তিতে ৪ মার্চ ১৯৩৭ তারিখে জেলা জজ মামলা খারিজ করে দিলেন।

ডাঃ আলম প্রমুখেরা হাইকোর্টে আপিল করলেন। ২৯ নভেম্বর ১৯৩৭ তারিখে লাহোর হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি স্যার ডগলাস ইয়ং বিচারপতি ভিদে এবং বিচারপতি দিন মহম্মদের এজলাসে আপিলের শুনানি আরম্ভ হল। আদালতে প্রচণ্ড ভিড়।

ডাঃ আলম কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। আপীল-কারীদের পক্ষে মুখ্য উকিল রইলেন মালিক বরকত আলি। শহীদগঞ্জ সম্পত্তি যদি মুসলমানদের অধিকারে ফিরে আসে তা যেন মুসলিম লীগের মাধ্যমেই ফিরে আসে। মুসলমানদের মনোভাব তখন সেইরকম।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও হাইকোর্টে আপিল টিকল না। বাকি রইল প্রিভি কাউনসিল। শিখ সম্প্রদায় ঠিক করল তারা মসজিদের স্থানে গুরুদ্বার নির্মাণ করবে কিন্তু প্রিভি কাউনসিলের রায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা যাবে না।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে লিগ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহীদগঞ্জ যদি এই সুযোগে মুসলমানদের অধিকারে না আসে তবে আর কবে আসবে? হাইকোর্টের রায় যাই হক পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে মেজরিটি মুসলিম ভোটের বলে আইন সংশোধন করে শহীদগঞ্জ মসজিদের সম্পত্তির দখল নিয়ে ওটি আবার মুসলমানদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে এবং সেখানে আবার মসজিদ নির্মাণ করা যাবে।

জনৈক সৈয়দ এন এ উদ্যোগী হয়ে লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির দু'জন মেম্বারকে অনুরোধ করলেন অ্যাসেমব্লির আগামী বাজেট অধিবেশনে বিল উত্থাপন করতে। মেম্বার দুজনের নাম হল মালিক বরকত আলি এবং কে এল গৌবা কিন্তু তিনি এই দুজনের একজনকেও বললেন না যে বিল উত্থাপন করবার জন্যে অপরজনকেও অনুরোধ করেছেন। তখন পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী (সেই সময়ে প্রধান মন্ত্রীকেই বলা হত, প্রাইম মিনিস্টার) ছিলেন স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ। শহীদগঞ্জের মসজিদের বিল নিয়ে, অনেক জল ঘোলা হল, মুসলিম লিগের অধিবেশনেও আলোচনা হল, সাব্যস্ত হল যে মসজিদ সম্পত্তি মুসলমানদের ফিরিয়ে দেবার ভার দেওয়া হক স্যার সেকেন্দারের ওপর। যেকারণেই হক স্যার সেকেন্দার তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন নি এবং সম্পত্তি শিখদের অধিকারেই রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বিলেতের প্রিভি কাউনসিলও লাহোর হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার

দিল্লির লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক বিচার আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কিন্তু তার আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের পটভূমি জেনে রাখলে বিচার-কাহিনী অনুসরণ করতে সুবিধা হবে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে অন্যতম নাটকীয় বা ঐতিহাসিক ঘটনা হল ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি রাত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' দেখিয়ে কলকাতার বাড়ি থেকে পলায়ন এবং পরে গোমো রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে পেশোয়ার।

দশ সপ্তাহ পরে পৌঁছলেন বার্লিন।

শিশিরকুমার বসু লিখছেন : "গোমো স্টেশনের কাছাকাছি রাস্তাটা আরো খারাপ। স্টেশন-চত্বরে যখন পৌঁছলাম ট্রেন আসার সময় প্রায় হয়েছে। দাদা (অশোকনাথ বসু) আর আমি মালপত্র হোল্ডঅল, স্যুটকেস আর অ্যাটাচি কেস নামিয়ে নিয়ে কুলির জন্য হাঁকাহাঁকি করতে লাগলাম। একজন ঘুমন্ত চেহারার কুলি এসে মালগুলো তুলে নিল।

'আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও'—বিদায় মুহূর্তে এই ছিল তাঁর শেষ কথা। আমি কেমন যেন নির্বাক ও নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রণাম করার কথাও মনে এল না। রাত্রের গোমো স্টেশনের নির্জন ওভারব্রিজ দিয়ে রাঙাকাকাবাবু (সুভাষচন্দ্র) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত ধীর ভঙ্গীতে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, আগে আগে চলেছে কুলি, তার মাথায় মালপত্র—চিরদিনের মত এই ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রইল। ওপারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাঙা-কাকাবাবু প্লাটফরমের দিকে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে মেল ট্রেনের গুমগুম ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমরা গাড়ি নিয়ে একটু দূরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হুস হুস শব্দে ট্রেন এসে থামলো আবার ছেড়ে দিল। আমরা কান পেতে ট্রেনের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। তারপর ট্রেনের চাকার ছন্দোময় ঝঙ্কারের সঙ্গে অন্ধকারের বুকে একটা আলোর মালা দুলে দুলে দূরে চলে গেল দেখতে পেলাম।"

১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র জেলে। তিনি হুমকি দিলেন যে তিনি আমরণ অনশন করবেন। ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন।

এলগিন রোডের বাড়িতে একটি ঘরে তিনি আশ্রয় নিলেন, বলে দিলেন তিনি নিভৃতে ধর্মচর্চা করবেন, কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। ইতিমধ্যে তিনি দাড়িগোঁফ রাখতে আরম্ভ করলেন। চোখে চশমা না থাকলে তাঁকে চেনা যাবে না।

ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেও তাঁর বাড়ির ওপর সি, আই, ডি, কর্মীরা যাতে চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখে তার ব্যবস্থা করেছিল। তবুও সুভাষচন্দ্র তাদের চোখে ধুলো দিয়ে মৌলবির বেশে বাড়ি থেকে চলে গেলেন।

তাঁর ভাইপো শিশিরকুমার গাড়ি চালিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন প্রায় ২০০ মাইল দূরে বারারিতে যেখানে তাঁর আর এক ভাইপো শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকনাথ থাকতেন। বারারি থেকে গোমো। গোমো রেলস্টেশনে ট্রেনে চেপে সুভাষচন্দ্র ইনসিওরেন্স এজেন্ট সেজে পেশোয়ার যাত্রা করলেন।

পেশোয়ারে তিনি নিরাপদে পৌঁছলেন। পেশোয়ার থেকে পাঠান সেজে ভগৎরামের সঙ্গে কাবুল। কাবুলে পৌঁছে তিনি আফগানদের পোশাক পরতেন। ভগৎরাম ঘোষণা করল যে, সঙ্গীটি তার দাদা, তিনি মূক-বধির, তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছেন।

কাবুলে সুভাষচন্দ্র দু' মাস ছিলেন। এই দু' মাস তাঁকে প্রচুর দৈহিক কষ্ট ও মানসিক দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়েছিল। অবশেষে মসকো

হয়ে ১৯৪১-এর এপ্রিলে বারলিন পৌঁছলেন।

১৭-১-৪১ তারিখে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর সর্বপ্রথম আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ

গত রবিবার অপরাহ্ন হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তি-লাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতে ছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েক দিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমন কি আত্মীয়-স্বজনের সহিতও দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্মচর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন্। তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোনো ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।

সুভাষচন্দ্রের এই চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবেদন নিবেদনে ইংরেজরা এমন সুন্দর জমিদারি ছেড়ে দেবে না। তাদের মেরে তাড়াতে হবে এবং সেজন্যে সামরিক শক্তি সঞ্চার করতে হবে, দরকার হলে বিদেশ থেকে সাহায্য আনতে হবে।

প্রথমে স্থির করেছিলেন যে মস্কোতেই কাজ আরম্ভ করবেন কিন্তু তা হল না। তিনি গেলেন বার্লিন। বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার খোলা হল এবং জার্মানিতে তিনি একটি ফ্রি ইণ্ডিয়া আর্মি গঠন

করলেন। পূর্ব এশিয়ায় যে আজাদ হিন্দ বাহিনী পরে গঠিত হয়েছিল এই হল তার বীজ।

বার্লিন থেকে ডুবোজাহাজে ডুবে ৯০ দিন পরে জাপান পৌঁছলেন ১৯৪৩ সালে। জাপান সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তারও আগে কিছু জানবার আছে।

১৯২৮ সালে কলকতার পার্ক সারকাস ময়দানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন। মূল সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর জি, ও, সি, সুভাষচন্দ্র বসু।

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ বাধল। গান্ধীজি বললেন ১৯২৯-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে ডমিনিয়ন স্টেটাস না দিলে কংগ্রেস দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনে নামবে।

সুভাষচন্দ্র প্রমুখরা দাবি করলেন পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, ডমিনিয়ন স্টেটাস নয়। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হল না। প্রস্তাবের পক্ষে পড়ল ৯৭৩ ভোট আর বিপক্ষে ১৩৫০ ভোট।

সুভাষচন্দ্র বুঝলেন ঐ ১৩৫০টি ভোট প্রস্তাবকে দেওয়া হয় নি, দেওয়া হয়েছে গান্ধীজিকে।

পরবর্তী অধিবেশন লাহোরে। এবার সভাপতি মতিলাল পুত্র জওহর-লাল নেহরু। লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। সুভাষচন্দ্র অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হল।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। সারা ভারতের ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল।

বিদেশীদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্যে বামপন্থী তরুণেরা ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগল।

১৯২৭ সালে মান্দালয় জেলে থাকবার সময় বোধহয় তাঁর দেহে

যক্ষার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার জন্যে ইয়োরোপে যান। ইয়োরোপে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় সর্দার বল্লভভাইয়ের দাদা বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে। একবার কলকাতায় ফিরে আসেন, পরে একটি বড় অপারেশনের জন্যে আবার ইয়োরোপ যান। এবার ভিয়েনাতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ইয়োরোপিয়ান সোসাইটির সভায় যোগদান, রোমে এশিয়ান স্টুডেন্টস কনফারেন্সে ভাষণ দেন। আয়ারল্যাণ্ড সফর।
দেশে ফিরে বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নামবার আগেই গ্রেফতার, বিনাশর্তে মুক্তি এবং আবার ইয়োরোপে যাত্রা। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি তখন থেকেই বিদেশে সংগঠন কাজে ব্যস্ত। সেই সময়ে ইয়োরোপে যাঁদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ হয়েছিল, কি বিদেশী কি ভারতীয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে ভারতে বা ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিন পৌঁছলেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। নাৎসী জার্মানি তীব্রগতিতে ইয়োরোপ ও আফ্রিকা ফ্রণ্টে, এগিয়ে চলেছে।
ইয়োরোপে সুভাষচন্দ্র তখন ইটালিয়ান নাম নিয়েছিলেন, অরলাণ্ডো মাজ্জোটা। আফগানিস্থান থেকে রাশিয়া হয়ে জার্মানি যাবার জন্যে এই নামে তাঁর পাসপোর্ট তৈরি হয়েছিল।
তখন জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রকে ভারতের জন্যে একটা বিশেষ বিভাগ ছিল, স্পেশাল ইণ্ডিয়া ডিভিসন। এই বিভাগে কয়েকজন সহানুভূতিশীল জার্মানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং তাঁদেরই সহায়তায় তিনি প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।
এই কয়েকজন জার্মান সরকারী চাকরী করলেও এবং প্রকাশ্যে হলেও অন্তরে নাৎসীদের সমর্থক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ফন ট্রট সুলজ। একদা তিনি রোডস স্কলার ছিলেন। দুঃখের বিষয় যে সেই বিখ্যাত জুলাই প্লটে হিটলারকে

হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তিন বছর পরে ফন ট্রট্‌ সুলজের ফাঁসি হয়।

সুলজের সহকারী ছিলেন ডঃ অ্যালেকজাণ্ডার ভের্থ। ভারত জার্মান মৈত্রীর জন্য তিনি এখনও আক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। ১৯৭০ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর ৭৩ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তিনি কলকতায় এসেছিলেন এবং বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

জার্মানদের এই ক্ষুদ্র দলটি সুভাষের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন এবং নাৎসী পার্টি বা সরকারি দিক থেকে তিনি তেমন কোনো বাধা পান নি।

মাত্র কুড়ি জনকে নিয়ে সুভাষ প্রথমেই বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার স্থাপন করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এ, সি, এন, নাম্বিয়ার, ডঃ গিরিজা মুখার্জি এবং ডঃ এম, আর, ব্যাস। নাম্বিয়ার পরে জার্মানিতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডঃ ব্যাসের কাজ ছিল আজাদ হিন্দ রেডিও, আজাদ মসলিম রেডিও এবং ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও কর্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ তদারক করা।

তারপর ইয়োরোপে ও উত্তর আফ্রিকায় যেসব ভারতীয় সৈন্য জার্মানির হাতে বন্দী হয়েছিল সেই সব যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সুভাষ ইয়োরোপে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করলেন!

দু বছর পরে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র যে আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষণা করলেন, এই ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার হল তারই অগ্রদূত। তার তিন বছর পরে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব নিয়ে সুভাষচন্দ্র বর্মার ভেতর দিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই ফৌজের অগ্রদূত হিসেবে ইয়োরোপের এই ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের নাম করা যায়।

ফন ট্রট সুলজের অধীনে সুভাষের সমর্থনকারী ঐ কার্যকরী দলটির প্রতি জার্মান ফরেন অফিসের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

এই ডিভিসনটির প্রধান ছিলেন ডঃ মেলসার্শ। তাঁর নাম এখানে উল্লেখ করা হল এইজন্য যে স্বাধীন ভারতে তিনি জার্মানির রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তখন জার্মানিতে যেসব নিরপেক্ষ দেশ কূটনীতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন, বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত এই ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারও তাদের মতো অনেক সুবিধা ভোগ করত। নাৎসী পার্টি সঙ্গে যোগাযোগ না করেও সুভাষ জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন।

গোড়া থেকেই জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রকের সঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট করে নিয়েছিলেন যে জার্মান তথা নাৎসী রাজনীতি থেকে ভারতীয়রা নিজেদের মুক্ত রাখবে, মিত্র শক্তির বিবাদে ভারতীয়রা অংশগ্রহণ করবে না। এমন কি আজাদ হিন্দ রেডিও কোনো সময়ে জার্মানদের কোনো কার্যকলাপ প্রচার করে নি। নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্যেই ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার কাজ চালিয়ে যাবে। নাৎসী পার্টির মতবাদ সম্বন্ধে সেণ্টার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে।

কাবুল থেকে সুভাষ যখন মসকো গেলেন তখন সোভিয়েট সরকারের সমর্থন পেলে সুভাষ হয়তো মসকোতেই তাঁর হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করতেন কিন্তু তা হয় নি।

ব্যক্তিগতভাবে সুভাষ রোম পছন্দ করেছিলেন কিন্তু জার্মান-ইটালি সন্ধিসুত্রের আলোকে তিনি বার্লিনই বেছে নিয়েছিলেন।

এই পটভূমিতেই গঠিত হল ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার এবং ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন, প্রতিষ্ঠিত হল রেডিও স্টেশন।

ইয়োরোপে যেদিন তিনি ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন (ফ্রি ইণ্ডিয়া আর্মি) গঠন করলেন সেইদিন থেকে লিজিয়নের সৈনিকরা তাঁকে নেতাজী নামে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলেন।

বার্লিনে পৌঁছে কয়েক দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র জার্মান নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলেন। প্রথমেই দেখা করলেন বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে কিন্তু হিটলারের সঙ্গে দেখা

হয় না। হিটলার তখন খুব ব্যস্ত।

হিটলারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল পরের বছর, ১৯৪২ সালে ২৮ মে তারিখে।

রিবেনট্রপের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর কাজকর্মে জার্মান সরকার কোনো বাধা দেবে না আর তাঁকে যে অর্থসাহায্য করা হবে তা তিনি ঋণ বলেই গ্রহণ করবেন। যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলে সেই অর্থ পরিশোধ করা হবে এবং জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রক ও সুপ্রিম মিলিটারি কমাণ্ড প্রযুক্তি বিদ্যায় সেণ্টার ও লিজিয়নকে সাহায্য করবে।

জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রীর স্পেশাল ফাণ্ড থেকে সুভাষচন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করা হতে লাগল এবং বলা হল সেণ্টার বা লিজিয়নের প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের পরিমাণও বাড়ানো হবে। জার্মানরা অবিশ্যি তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছিল।

দু বছর পরে টোকিয়োতে জার্মান রাষ্ট্রদূতের হাতে আংশিক ঋণ পরিশোধ হিসেবে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের পক্ষ থেকে নেতাজী পাঁচ লক্ষ ইয়েন দিয়েছিলেন। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা নেতাজীর যুদ্ধ ফাণ্ডে যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা থেকেই উক্ত টাকা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। যাইহক জার্মানরা নীতিগতভাবে সুভাষচন্দ্রের কাজকর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার তথা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এবং জার্মান ফরেন মিনিস্টার, (রিবেনট্রপ), চ্যানসেলর (হিটলার) এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের যোগাযোগ রক্ষা করতেন সেক্রেটারি অফ স্টেট উইল-হেলম কেপলার। সংগঠনের দিক থেকে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর ভারতীয় সহযোগী ও জার্মান তরফের স্পেশাল ইণ্ডিয়ান ডিভিসনের সঙ্গে সমঝোতার অভাব হচ্ছিল না, কাজ বেশ ভালই চলছিল। সুভাষ-চন্দ্রের সহযোগীর সংখ্যা এখন ৩৫ জন, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের উদ্বোধন হল ১৯৪১ সালের ২ নভেম্বর তারিখে। বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

প্রাক্তন সভ্য এন, জি, গনপুলে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে যোগদান, করলেন এবং তিনি নাম্বিয়ারকে সাহায্য করতে লাগলেন। পরের বছর সুভাষচন্দ্র নাম্বিয়ারকে তাঁর ডেপুটি এবং উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন।

ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বেতার প্রচারে মনোযোগ দিলেন এবং ১৯৪১ এর অক্টোবর থেকে আজাদ হিন্দ রেডিওর নিয়মিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। স্থানীয় হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান ও পার্শিদের সহযোগিতায ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, পারসি, তামিল, তেলুগু ও পুস্তু ভাষায় প্রচার আরম্ভ হল।

আর দেরি করা যায় না।

এইবার জার্মান মিলিটারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দরকার। প্রথমে জার্মান বৈদেশিক বিভাগের বিশেষ ভারতীয বিভাগ এবং সুভাষচন্দ্র পরে সরাসরি আলাপ আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই সুযোগে জনৈক ডঃ সাইফ্রিজের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। ডঃ সাইফ্রিজ নেতাজীর ইচ্ছামতোই ইণ্ডিযান লিজিয়নের স্বার্থ রক্ষা করতেন, ত্রুটি রাখতেন না।

যুদ্ধের পর জার্মান-ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠনে ও প্রসারে ডঃ সাই-ফ্রিজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে জওহরলাল নেহরু জার্মানিতে একটি ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন ব্যুরো চালু করেছিলেন। পরবর্তী কাল থেকে উক্ত সোসাইটি ইনফরমেশন ব্যুরোর কাজ করে আসছে।

পূর্ব এশিয়াতে যে সময়ে জেনারেল মোহন সিং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠমে ব্যস্ত প্রায় সেই সময়েই জার্মানিতে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন তথা ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির তিনি বীজ বপন করলেন।

১৯৪৪ সালের ফেবরুয়ারি মাসে আজদ হিন্দ বাহিনী যখন পূর্ব ভারতের সীমান্তে আঘাত হানছিল ঠিক ঐ সময়ে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আনা গেল না।

পরে পূর্ব এশিয়াতে নেতাজী যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন

করেছিলেন তার পূর্বশূরী এই ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন গড়ে তোলার কাজে নেতাজী অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এসবই তিনি করতেন সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে। ব্যক্তিগত ভাবে কিছু করতেন না। এই রকম মুক্তি ফৌজ যেকোনো বিপ্লবী সবকার গঠন করতে পারে।

১৯৪৫ সালে লালকেল্লার আই এন এ-এর ঐতিহাসিক বিচারের সময় ভুলাভাই দেশাই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আজাদ হিন্দ সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রচুর লড়াই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিদেশে হোটেল রুমে স্থাপিত ভাঙাচোরা সরকারকে যদি অন্যান্য দেশ স্বীকার করতে পারে তাহলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বৈধভাবে গঠিত আজাদ হিন্দ সরকারকে বৈধ বলে স্বীকার করে নিতে বাধা কোথায়?

জার্মানিতে তখন যে ইণ্ডিয়ান লিয়জিয়ন গঠিত হয়েছিল তাদের শক্তি ছিল চার ব্যাটালিয়ন। ওধারে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা বেশি ছিল না। তবে একটি ছোটখাটো কমাণ্ডো বাহিনী ছিল। কামাণ্ডো বাহিনীর কাজ হল গোপনে শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়ে তাদের কিছু ক্ষতি করে আসা।

এই কমাণ্ডোদের ট্রেনিং দিয়েছিল ক্যাপ্টেন হারাবিশ। সহযোগিতা করেছিলেন দুজন ভারতীয়, আবিদ হাসান এবং এন জি স্বামী। আবিদ এবং স্বামী জীবন বিপন্ন করে পরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পূর্ব এশিয়াতে এসে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে রাশিয়ায় স্টালিনগ্রাডে এবং উত্তর আফ্রিকায় এল আলামিনে জার্মানদের বিপর্যয়ের ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কমাণ্ডোদের বা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পাঠান সম্ভব হয় নি।

১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর থেকে ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের লোক ভর্তি আরম্ভ হল। তখন আন্নাবার্গ ক্যাম্পে অনেক ভারতীয় যুদ্ধবন্দী

ছিল, এদের আনা হয়েছে উত্তর আফ্রিকা থেকে। নেতাজী এই ক্যাম্পে গেলেন এবং বন্দীদের সৈনিকরূপে লিজিয়নে যোগদান করতে বললেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে লিজিয়নে যোগদান করলে এখন থেকে আর ইংরেজদের প্রতি নয়, ভারতের প্রতি, স্বদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য থাকা চাই এবং প্রস্তুত থাকতে হবে আত্মত্যাগের জন্যে। নেতাজীর কথায় অফিসার ও সৈনিকগণ যেন নতুন জীবন লাভ করলেন, নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন।

নবগঠিত ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের প্রথম কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হল। লিজিয়নের শক্তি তখন তিন ব্যাটালিয়ন। নেতাজী স্বয়ং এবং জার্মানিতে জাপানী দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশি কর্নেল ইয়ামা-মোটো এই কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করলেন। কর্নেল ইয়ামামোটো পরে পূর্ব এশিয়াতে বদলি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাপানী সংগঠনের নেতা এবং আই এনএ। এবং টোকিওর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের সৈনিকরা ভারতের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকার প্রতি আনুগত্য জানাল। ত্রিবর্ণ সেই পতাকায় চরকার স্থানে লম্ফোদ্যত একটি বাঘের ছবি ছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই পতাকা আমরা পরে দেখেছি। জার্মানি ও পূর্ব এশিয়াতে এই পতাকাই তখন ভারতের জাতীয় পতাকা রূপে গৃহীত হয়েছে। লেফটেনান্ট কর্নেল ক্রাপে'র নেতৃত্বে ভারতীয় সৈনিকেরা জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করল এবং পরে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল।

ভারতকে মুক্ত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে নেতাজী ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার স্থাপন করলেন এবং ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন অভিহিত সেনাবাহিনীও গঠন করলেন কিন্তু একটু কাজ বাকি রয়ে গেল। সেটি হল জার্মানি, ইটালি ও জাপানকে যুক্তভাবে ঘোষণা করতে

হবে, যুদ্ধে তারা জয়লাভ করলে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং স্বাধীন ভারতের প্রতি তাদের কি নীতি হবে।

ইটালির পক্ষে মুসোলিনি এবং জাপানের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী তোজো আপত্তি প্রকাশ করলেন না। ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিতে তাঁরা রাজী আছেন কিন্তু হিটলার কিছুই বলেন না। তিনি বলেন তাঁর পক্ষ থেকে এরকম কোনো ঘোষণার আপাততঃ কোনো মূল্য নেই, ভবিষ্যতে অবস্থা দেখে বিবেচনা করা যাবে।

হিটলারের সঙ্গে নেতাজীর যখন দেখা হল, নেতাজী তখন এই মর্মে একটি ঘোষণা দাবি করলেন এবং জার্মানিতে তিনি নিজের রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতাও দাবি করলেন।

হিটলার নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর রাজনীতিক মতবাদ কি?

এই প্রশ্নে নেতাজী বিরক্ত হলেন। ফন ট্রট দোভাষীর কাজ করছিলেন। নেতাজী বললেন: হিজ একসেলেনসিকে আপনি বলুন যে বাল্যকাল থেকেই আমি রাজনীতি করে আসছি এবং এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না।

হিটলার ইংরেজি বুঝতেন না। নেতাজীর কথাগুলি ফন ট্রট নাকি অনেক মোলায়েম করে বলেছিলেন। এই সাক্ষাৎকার মোটেই ফলপ্রসূ হল না।

নেতাজী কি করবেন বুঝতে পারলেন না তবে এটুকু বুঝলেন এখানে আর কাজ করার সুবিধে হবে না। কর্মক্ষেত্র এবার জার্মানি থেকে এশিয়াতে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

ওদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের অবস্থা শোচনীয়। জাপান দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। ১৯৪২ সালের ফেবরুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। সেখানে জাপানী শাসন কায়েম হয়েছে। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন এখন তাঁর কর্মক্ষেত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। সেখানে আছে তিরিশ লক্ষ ভারতীয়।

তাদের থেকে লোকবল সংগ্রহ করে ভারতকে মুক্ত করবার জন্যে

সংগ্রাম চালাতে হবে।

পশ্চিমে যখন উপযুক্ত সময়ের জন্যে সুভাষচন্দ্র বসু অপেক্ষা করছিলেন পূর্বে আর এক বসু, রাসবিহারী বসু।

জাপানে বসে এই বৃদ্ধ বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন। ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর জাপান যখন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন রাসবিহারী ভাবলেন, এবার বুঝি তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। জাপান এখন ব্রিটেনের শত্রু অতএব ব্রিটেনের কোনো বিধিনিষেধ মানবার আর কোনো বাধ্যবাধকতা রইল না। এখন তিনি ইচ্ছামতো জাপানের বাইরে যেতে পারেন।

জাপানে ব্রিটেনের দূতাবাসের লোকেরা রাসবিহারীকে ধরবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাসবিহারী গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন। পরে তিনি জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেনএবংজাপানী মহিলাকে বিবাহ করে স্থায়ীভাবে জাপানে বাস করছিলেন।

তাঁর একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্রটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত হয়। তাঁর কন্যার কন্যা ভারতে এসেছিলেন। রাসবিহারী স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারেন নি, স্বাধীনতার কুড়ি মাস পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

পূর্ব এশিয়াতে রাসবিহারী বসু প্রমুখ আরও অনেক ভারতীয় দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ওখানে পৌঁছে ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকেই জাপান, চীন, তাইল্যাণ্ড এবং মালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তাঁরা জানতেন যে ভারতের মধ্যে সৈন্যবাহিনী গঠন করে ও মুখোমুখি লড়াই করে ইংরেজদের তাড়ানো সম্ভব নয়। তাঁরা বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং সেই সুযোগে যদি ভারতকে স্বাধীন করা যায়।

এঁদের মধ্যে তাইল্যাণ্ডে ছিলেন বাবা অমর সিং আর সাংহাইতে ছিলেন বাবা ওসমান খাঁ।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাবা অমর সিং-এর ২২ বৎসর কারাদণ্ড

হয়েছিল। তখন বর্মা ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অমর সিংকে বর্মার কোনো জেলে পাঠান হয়েছিল। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি তাইল্যাণ্ডে পালিয়ে যান এবং ভারতের মুক্তির জন্য বিপ্লবাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বাবা অমর সিং-এর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি ব্যাংককের একজন শিখ ব্যক্তি জ্ঞানী প্রীতম সিংকে দলভুক্ত করেন। পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বাধবার আগে প্রীতম সিং বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। মালয় এবং বর্মায় তখন ব্রিটিশদের যেসব ভারতীয় সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে তিনি বিপ্লবাত্মক চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করেন।

ওদিকে বাবা ওসমান খাঁ স্যাংহাইতে একটি বিপ্লবী দল গঠন করে ছিলেন। তিনি একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন এবং সেই খবরের কাগজ চীন, জাপান, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া, মালয় বর্মা এবং ভারতের প্রধান প্রধান শহরে প্রচা রর ব্যবস্থা করেছিলেন।

পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের সময় জাপানের হাতে যখন স্যাংহাইয়ের পতন হল তখন জাপানের নৌ-বিভাগের সহায়তায় বাবা ওসমান খাঁ কয়েকজন যুবককে তাইল্যাণ্ড হয়ে ভারতে পাঠালেন আর কিছু যুবককে মালয়ে। এদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ অধীন ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালান এবং ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রভক্ত দার্শনিক ও পণ্ডিত স্বামী সত্যানন্দ পুরী তাইল্যাণ্ডে যে তাই-ভারত কালচারাল লজ খুলেছিলেন তারই মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র সেখানে প্রচুর কাজ করছিল।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী ভারতে কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন।

১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে অ্যামেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং সেইদিনই জাপান তাই-ল্যাণ্ডে ল্যাণ্ড করল। পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাবা অমর

সিং-এর নেতৃত্বে ব্যাংককে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগ গঠিত হল। স্বামী সত্যানন্দ পুরীও তাই-ভারত কালচারাল লজকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কাউনসিলে পরিবর্তিত করে উক্ত লিগের সঙ্গে হাত মেলালেন।

বর্মা থেকে জাপান পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে দেশপ্রেমী ভারতীয় যেন রাতারাতি জেগে উঠল। সারা পূর্ব এশিযার শহরে লিগের শাখা স্থাপিত হল। ইতিপূর্বে বিপ্লবীরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখে ছিলেন। এখন আর গোপনীযতা রক্ষার কোনো প্রয়োজনীযতা নেই। তিরিশ লক্ষ ভারতীয়, ভারতের মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন।

মালয়-তাই বর্ডারের কাছে জাপানিরা অবতরণ করেছিল, তারা এখন মালযে কোটা বারুর দিকে এগিযে চলল। জঙ্গল যুদ্ধে ব্রিটিশরা জাপানিদের সঙ্গে সুবিধে করতে পারল না।

মালযের জিতরা নামক স্থানে চতুর্দশ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক জাপানিদের প্রচণ্ড বাধা দিযেছিল কিন্তু তিন দিন যুদ্ধের পর তাদের পিছু হটতে হল।

১০ ডিসেম্বর তারিখে জাপান আর্মির মেজর ফুজিওয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে জ্ঞানী প্রীতম সিং বিমানে তাই-মালয বর্ডার অতিক্রম করে একটি বিমান ক্ষেত্রে অবতরণ করলেন এবং ভারতীয় সৈনদলের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন।

জিতরার কাছে জঙ্গলে প্রীতম সিং-এর সঙ্গে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর দেখা হল। এই সাক্ষাৎকারকে ঐতিহাসিক বলা হয কারণ এই দিনই একটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। জিতরায় তখন যে সকল ভারতীয় অফিসার ছিলেন তাঁদের মধ্যে তখন মোহন সিং ছিলেন সিনিয়র।

তিনিও ইতিমধ্যে ভারতের মুক্তির জন্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠনের কথা চিন্তা করছিলেন। জাপানী অফিসারদের কোনো

একটি মোটর গাড়িতে তিনি ভারতের জাতীয় পতাকা দেখতে পান। তখনই তিনি স্থির করেন, জাপানী অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

কিন্তু তার আগেই প্রীতম সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রীতম সিং মোহন সিংকে সবকিছু বললেন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে মোহন সিং-এর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হলেন। এই সাক্ষাৎকারে মেজর ফুজিওয়ারাও উপস্থিত ছিলেন। মোহন সিং রাজি হলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন।

ভারতের মুক্তির জন্য মোহন সিং এবং তাঁর চুয়ান্ন জন অনুচর ভারতের মুক্তির জন্য তখনই জীবন পণ করলেন।

তাই-মালয় সীমান্তে সেই অজ্ঞাতনামা অরণ্যভূমি জিতরাতে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)-এর চারাগাছটি রোপন করা হল।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি বা আই এন এ-কে যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ ও ভারতের রেডিও থেকে বলা হত ইমপিরিয়াল নিপ্পন আর্মি অর্থাৎ যেন জাপানের-ই বাহিনী। যাইহক এই মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং বা জি ও সি মনোনীত হলেন মোহন সিং।

সেদিন সমবেত মুক্তিফৌজের 'আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হল।

জাপান এগিয়ে চলল সিঙ্গাপুরের দিকে। বহু ভারতীয় সৈন্য বন্দী হতে লাগল। তাদের ভেতর অনেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করতে লাগল। আই, এন, এ-এরও শক্তি বাড়তে লাগল। ১৯৪২-এর ১৬ জানুয়ারি তারিখে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের একটি শাখা কুয়ালালামপুরে খোলা হল। সেদিন সেই অঞ্চলের সমস্ত ভারতীয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন! জ্ঞানী

প্রীতম সিং এবং মেজর ফুজিওয়ারা সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ফুজিওয়ারা বললেন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর সরকার সবরকম সাহায্য করবেন।

কুয়ালালামপুরে যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্পে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাঁচ হাজার যুদ্ধবন্দীকে মোহন সিং বললেন নবগঠিত আই এন এ-এর শপথ হল ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়া। এজন্য জাপান সরকার আই এন এ-কে সবরকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি সকল যুদ্ধবন্দীকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বললেন। পাঁচ হাজারের মধ্যে চার হাজার তখনি ফৌজে যোগদান করতে সম্মত হলেন।

জানুয়ারি মাস শেষ হবার আগেই সারা মালয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের শাখা স্থাপিত হল।

১৯৭২-এর ১৫ ফেবরুয়ারি তারিখে সিঙ্গাপুরের পতন হল। ইংরেজরা ভেবেছিল সমুদ্রপথে সিঙ্গাপুর আক্রান্ত হবে। প্রতিরক্ষার নকশা সেইভাবে রচিত হয়েছিল। সমুদ্রের দিকে মুখ করে কামান এমন ভাবে বসানো হয়েছিল যে সেগুলির মুখ মূল ভূখণ্ডের দিকে ঘোরাবার আর উপায় ছিল না।

একজন ব্রিটিশ সমর বিশেষজ্ঞ কিন্তু বলেছিলেন যে সিঙ্গাপুর জলপথে আক্রান্ত হবে না। আক্রান্ত হবে স্থল পথে। ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ তাঁর কথা শোনে নি।

সেই রাত্রেই ভারতীয় সৈন্যদের আদেশ দেওয়া হল তারা যেন আগামী কাল সকাল থেকেই সিঙ্গাপুরের ফারের পার্কে সমবেত হয়।

১৬ ফেবরুয়ারি বেলা দুটোর সময় মালয়ে ব্রিটিশ মিলিটারি হেড কোয়ার্টারের স্টাফ অফিসার লেঃ কর্নেল হাণ্ট, জাপানের পক্ষে মেজর ফুজিওয়ারা, আই এন এ-এর পক্ষে ক্যাপটেন মোহন সিং, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের প্রথম সারির সভ্য, জাপানী এবং ভারতীয় সামরিক বিভাগের কয়েকজন সামরিক অফিসার পার্কে উপস্থিত হলেন।

সমবেত যুদ্ধবন্দীদের উদ্দেশ্য করে লেঃ কর্নেল হান্ট বললেনঃ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জাপান সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছি, এতদিন আমাদের আদেশ যেমন পালন করে এসেছ তেমনি ভাবে তোমরা নতুন মনিবদের আদেশ পালন করবে।

হান্টের পর মেজর ফুজিওয়ারা মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলেনঃ —জাপান সরকারের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের ভার নিলুম এবং জি ও সি ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে তোমাদের সমর্পণ করলুম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে আসছে এবং ভারতীয়দের সামনে স্বাধীনতা অর্জনের অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত। দেশের মুক্তির জন্য তোমরা আঘাত হানো। যদিও তোমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত এবং সেই অর্থে আমাদের শত্রু তথাপি আমরা ভারতীয়দের শত্রু মনে করি না, জাপান ভারতীয়দের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ প্রজা হয় নি সেটা আমরা জানি। জাপানী আর্মি তোমাদের শত্রু মনে করবে না, তোমরা আমাদের বন্ধু।

ফুজিওয়ারার পর হিন্দুস্থানীতে ক্যাপটেন মোহন সিং বললেন ব্রিটেনের কুশাসনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। জাপান ব্রিটিশদের মালয় ও সিঙ্গাপুর থেকে তাড়িয়েছেন। এখন তারা বর্মা থেকে তাদের চাটিবাটি তুলতে আরম্ভ করেছে। ভারত আজ স্বাধীনতার দরজায় উপস্থিত এবং এখন প্রতিটি ভারতীয়ের কর্তব্য এই রক্ত-চোষা শয়তানদের তাড়িয়ে দেওয়া। জাপান আমাদের সাহায্য করবে, এখন আমাদের কর্তব্য আমাদের চল্লিশ কোটি ভাইবোনকে মুক্ত করার জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই উদ্দেশ্যে আমরা ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠন করেছি এবং সেই আর্মিতে তোমরা সকলে যোগ দাও।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে সমবেত সৈন্যরা মোহন সিংকে তাদের সমর্থন জানাল এবং হাত তুলে জানাল

যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা আই এন এ-তে এখনই যোগদান করতে প্রস্তুত।

মোহন সিং প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে মোট তিরিশ হাজার যুদ্ধবন্দী আই এন এ-তে যোগদান করলেন।

রাতারাতি এই মুক্তিফৌজ গঠন করতে গিয়ে মোহন সিংকে অনেক বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সাধারণ সৈনিকদের নিয়ে যত না বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার চেয়ে বেশি বাধা এসেছিল অফিসারদের কাছ থেকে। পদমর্যাদায় যাঁরা মোহন সিং অপেক্ষা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা মোহন সিং-এর অধীনে কাজ করতে রাজী নয়। তাদের নিয়েই সমস্যা। কোনো কোনো অফিসার আই এন এ-এর সংগঠনে বাধা দিতে লাগলেন এবং তাঁদের অধীন সৈন্যদের যোগ দিতে নিষেধ করলেন।

জাপানীরা রেশন, ইউনিফর্ম বা ওষুধ উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ দিতে পারছিল না। সে এক বিরাট অসুবিধা। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ বা মোহন সিং সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকাংশই সরবরাহ করতে পারছিলেন না।

এরই মধ্যে আবার অন্যরকম গোলমাল। আই এন এ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ না করেই জাপানিরা ইচ্ছামতো আদেশ জারি করতে লাগল। ইংরেজের পঞ্চম বাহিনীর চরেরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগল এবং সংগঠন কাজে বাধা দিতে থাকল।

কোনো কোনো কমিশন প্রাপ্ত অফিসার মোহনসিং-এর সঙ্গে একমত হতে অক্ষমতা প্রকাশ করতে লাগল, বিবাদ নয়, মতবিরোধ। তাঁদের মত জাপানীরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করবে।

শেষপর্যন্ত মোহন সিং তাঁদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে তিনি

যা কিছু করছেন নিজের জন্যে কথনোই নয় অতএব আসুন আমরা সকলে একত্র হয়ে হাত মিলিয়ে কাজ করি, দেশকে স্বাধীন করি।

সিঙ্গাপুরে মোহন সিং তাঁর :হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলেন। তিনজন অফিসার তাঁকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেন। প্রিজনার অফ-ওয়ার হেডকোয়াটারের চার্জ নিলেন লেঃ কর্নেল এন এস গিল, অ্যাডজুটান্ট এবং কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল হলেন লেঃ কর্নেল জে, কে, ভোঁসলে এবং মেডিক্যাল সারভিসের ডিরেক্টর হলেন লেঃ কর্নেল এ, সি, চ্যাটার্জি।

প্রথম আই এন এ গঠিত হল। বাহিনীর প্রতিটি সৈন্যকে শেখানো হল যে তাদের সর্বাগ্রে ভাবতে হবে, সে একজন ভারতীয় এবং সে যে মুক্তিযোদ্ধা হতে পেরেছে সেজন্যে সে গর্বিত। ক্রমশঃ পৃথক রন্ধনশালা ও ধর্মীয় গণ্ডী তুলে দেওয়া হল। সবাই এক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাই জাতীয় পতাকা রূপে প্রথম আই, এন, এ, গ্রহণ করল।

জ্ঞানী প্রীতম সিং অসামরিক দিকে প্রচুর কাজ করেছিলেন। মালয়ে যত ভারতীয় ছিল তাঁদের নিয়ে সিঙ্গাপুরে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডে-পেণ্ডেন্স লিগের অফিস খুললেন! এই অফিসের সমস্ত ভার দেওয়া হল এন রাঘবনের ওপর। পেনাং শহরে রাঘবন ব্যারিস্টারি করতেন। পরে স্বাধীন ভারতে তিনি চীনে ও ফ্রান্সে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৪২ সালের ৯ মার্চ তারিখে তাইল্যাণ্ড ও মালয়ের ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের সকল অফিসের প্রতিনিধিদের সিঙ্গাপুরে এক মিটিং হয়। ঐ মিটিং-এ স্বামী সত্যানন্দ পুরী ঘোষণা করেন যে, ব্যাংকক থেকে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে জার্মানিতে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। পূর্ব এশিয়ার আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবার জন্যে তিনি সুভাষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজি হয়ে সুভাষ তারবার্তার উত্তর দিয়েছেন।

সিঙ্গাপুর মিটিং-এর পর টোকিয়োতে আই আই লিগের প্রতিনিধিদের বড় একটা মিটিং করা স্থির হল। এই মিটিং-এ 'সাংহাই, মালয়, হংকং এবং তাইল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রাঘবন সভাপতিত্ব করেছিলেন। অন্য যাঁরা যাঁরা উপস্থিত হবেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাবা অমর সিং, জ্ঞানী প্রীতম সিং, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, কে পি কে মেনন, ক্যাপটেন মোহন সিং, লেঃ কর্নেল এন এস গিল এবং মেজর এম জেড কিয়ানি। পরে কিয়ানি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বাধিনায়কত্বে আই এন এ-র প্রথম ডিভিসন পরিচালনা করেছিলেন।

টোকিয়ো কনফারেন্সের উদ্দেশ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে জাপান সরকার যে সহযোগিতা করবেন তারই শর্তাবলী স্থির করা। এই কনফারেন্সে আরও স্থির হয় যে সত্যানন্দ পুরীব প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব এশিয়াতে আই আই লিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য সুভাষকে টোকিয়োতে আসতে বলা হক।

টোকিয়ো কনফারেন্সের তারিখ ঠিক হয় ২৮ মার্চ কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে টোকিযো কনফারেন্সে কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য উপস্থিত হতে পারেন নি। ১৩ মার্চ সাইগন থেকে একটি বিমান টোকিয়োর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেই বিমানে ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ পুরী, জ্ঞানী প্রীতম সিং, ক্যাপটেন মোহন সিং-এর দক্ষিণ হস্ত ক্যাপটেন মহম্মদ আক্রাম, রাঘবনের বিশ্বস্ত সহযোগী নীলকান্ত আযার। তাঁরা টোকিয়ো পৌঁছতে পারেন নি। পথে তাঁদের বিমান নিখোঁজ হয়। আজও তাঁদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

টোকিয়ো কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেছিলেন রাসবিহারী বসু। কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করে জাপানের প্রধান মন্ত্রী এক বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জাপান সরকার সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং এজন্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত।

জাপান সরকারের প্রতিনিধিরূপে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল ইয়াকুরো। পরে যুদ্ধকালে জাপান ও ভারতের মধ্যে তিনি লিয়াজঁ অফিসারের কাজ করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র হবে একতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ, (ইত্তেফাক, ইতমাদ, কুরবানি) এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। আরও একটি প্রস্তাব ছিল জাপানকে সরকারিভাবে ঘোষণা করতে বলা হক যে জাপান ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এবং স্বাধীনতার পর ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় জাপান হস্তক্ষেপ করবে না।

কনফারেন্সে একটি কাউনসিল অফ অ্যাকশন গঠন করা হয় এবং রাসবিহারী বসুকে অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি করা হয়।

পরে ১৫ জুন তারিখে ব্যাংককে বড় আকারে আরও একটি কনফারেন্স হয়। এই কনফারেন্সে জাপান, মাঞ্চুকুয়ো, হংকং বর্মা বোর্নিয়ো, জাভা, মালয়, তাইল্যাণ্ড, সাংহাই, ম্যানিলা এবং ইন্দো-চায়না থেকে আই আই লিগের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন।

টোকিয়ো কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি এই কনফারেন্সে পাকা করে নেওয়া হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে জাপানকে সরকারিভাবে ঘোষণা করতে বলা হয়, তাছাড়া সুভাষচন্দ্রকে টোকিয়ো আনাবার বিষয়ও আলোচনা করা হল।

ব্যাংকক কনফারেনসের পর আই আই লিগ এবং আই এন এ কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠল। তারা কাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কাউনসিল অফ অ্যাকশনের হেডকোয়ার্টার হল ব্যাংকক। কাউন-সিলের কতকগুলি বিভাগ গঠিত হল। বিভাগগুলি লীগের সহ-যোগিতায় কাজ করতে লাগল।

আই এন এ-এর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হল সিঙ্গাপুরে। সৈন্য বিভাগে রইল ফিল্ড ফোর্স গ্রুপ গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, এস এস গ্রুপ এবং ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ, মিলিটারি

হাসপাতালে মেডিক্যাল ফাস্ট এড কোর এঞ্জিনিয়ারিং কম্পানি, মিলিটারি প্রপাগাণ্ডা ইউনিট এবং রিইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ।

জাপান সরকারের পক্ষে প্রথম লিয়াজঁ অফিসার ছিলেন মেজর ফুজিওয়ারা এবং তাঁর অফিসের নাম ছিল ফুজিওয়ারা কিকান। কিকান অর্থাৎ অফিস! আবার পরে যখন কর্নেল ইয়াকুরে লিয়াজঁ অফিসার নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর অফিসের নাম হল ইয়াকুরো কিকান।

মেজর ফুজিওয়ারা ভারতীয়দের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছিলেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন কিন্তু কর্নেল ইয়াকুরো ভারতীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি।

জুন মাসে ব্যাংকক কনফারেন্সের পরবর্তী ছ মাস মোটেই ভাল কাটল না বরঞ্চ অবস্থার অবনতি ঘটল। ইয়াকুরা কিকানের মারফত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও স্বাধীন ভারতের প্রতি জাপান সরকারের নীতির সরকারি ঘোষণা কিছুতেই আনানো গেল না।

অনুরোধ বা চাপ সৃষ্টি করেও কোনো ফল হল না। জাপানীরা আই আই লিগ বা আই এন একে তাচ্ছিল্যই করতে লাগল। অন্ততঃ যে সব জাপানীরা বর্মায় থাকে তারা তো প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করত।

রেঙ্গুনে তো একদিন একজন অধস্তন অফিসার একজন ভারতীয়কে সোজাসুজি বলল: আমরা তোমাদের পুতুল করে রাখতে চাই না কিন্তু যদি পুতুল করে রাখি তাহলে ক্ষতি কি? পুতুল কি খারাপ? জাপান সরকার ভারতের প্রতি তাদের নীতি সরকারী ভাবে ঘোষণা করতে কেন দেরি করছে সে বিষয়ে ইয়াকুরো এবং অন্যান্যরা কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল, কৈফিয়তও দিয়েছিল কিন্তু তা সন্তোষজনক নয়। তার ফলে, কাউনসিল অফ অ্যাকশনের প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসুর হাত দুর্বল করতে থাকল। সংশ্লিষ্ট

সকলেই এবং ভারতীয়েরা জাপানীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল।

রাসবিহারী বসু দীর্ঘ ৩০ বৎসর জাপানে বাস করছেন এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক রূপে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও অনেকে ভাবতে লাগলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাসবিহারী কি সংগ্রাম করতে পারবেন? যৌবনের সে আগুন তাঁর মধ্যে তখন আর নেই, বয়স হয়েছে। জাপান কর্তৃপক্ষ, রাসবিহারী বসু, ক্যাপটেন মোহন সিং এবং আর সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব ঘটাতে লাগল। সব যেন ভেঙে যাবে।

জাপানীরা স্পষ্ট করে কিছু বলে না, তারা পরামর্শ না করে ইচ্ছামতো আদেশ জারি করে। জাপানীদের ব্যবহারও ভাল নয়। তারা নিজেদের প্রভু মনে করে। অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, অবস্থা অসহনীয়।

মোহন সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করা দূরের কথা মোহন সিং-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপানীরা আদেশ জারী করতে লাগল, ফলে অবস্থা চরমে উঠল। ১৯৪২ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে সিঙ্গাপুরে জাপানীরা মোহন সিংকে গ্রেফতার করল এবং কাছাকাছি এক দ্বীপে তাঁকে এক বৎসর অন্তরীন করে রাখল। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে জাপানীরা মোহন সিংকে সুমাত্রায় নিয়ে গেল এবং সেখানেই যুদ্ধের শেষপর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল।

যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫-এর নভেম্বরে ব্রিটিশরা তাঁকে উদ্ধার করে দিল্লি নিয়ে যায় এবং ১৯৪৬-এর মে মাসে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়।

গ্রেফতারের আগে মোহন সিং আই এন এ-এর ফৌজকে বলেছিলেন তাঁকে যদি আই এন এ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আই এন এ স্বাভাবিক ভাবে ভেঙে যাবে অতএব ১৯৪২-এর ২৯ ডিসেম্বর থেকে প্রথম আই এন ভেঙে গেল। কাউনসিল অফ অ্যাকশন তখন একা রাঘবন চালাচ্ছিলেন, তিনিও রিজাইন দিলেন। রাসবিহারী একা পড়ে গেলেন।

এরপর ছ মাস ধরে চলল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাস ও বিবাদ বিসম্বাদ। প্রথম আই এন এ ভেঙে গেল কাউনসিল অফ অ্যাকশন উঠে গেল।

চরম বিপর্যয়।

রাসবিহারী একাই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। জরাগ্রস্ত হলেও বিপ্লবী রাসবিহারী আবার যেন জেগে উঠলেন। তিনি আই আই-লিগ ও আই এন এ কে আবার জাগিয়ে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

রাঘবনের স্থলাভিষিক্ত ডাঃ লক্ষ্মিয়াকে নিয়ে লিগকে এবং লেঃ কর্নেল জে কে ভোঁসলের সহযোগিতায় আই এন এ-কে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্র যতক্ষণ পর্যন্ত না আসছেন ততক্ষণ পযন্ত সবকিছু ধরে রাখতে হবে নইলে তাঁর হাতে কি তুলে দেবেন?

১৯৪৩-এর মার্চ মাসে রাসবিহারী ব্যাংকক থেকে সিঙ্গাপুরে হেড-কোয়ার্টার তুলে আনলেন এবং অক্লান্তভাবে দিনরাত্রি পরিশ্রম করে লিগ ও আই এন এ-কে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন।

আই এন এ-এর মিলিটারি ব্যুরোর ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন লেঃ কর্নেল জে কে ভোঁসলে এবং ফৌজের কমাণ্ডার নিযুক্ত হলেন লেঃ কর্নেল এম জেড কিয়ানি।

সিঙ্গাপুরে ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৪৩ পর্যন্ত পূর্ব ভারতের ভারতীয়দের আর একটা সভা করলেন রাসবিহারী। সভায় নিম্ন-রূপ প্রস্তাব গৃহীত হল: ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি হল ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের বাহিনী এবং আই এন এ-এর সকল সৈন্য ও অফিসার এবং আই আই লিগের সকল সভ্য লিগের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং লিগ এখন যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা অনুসারে আন্দোলন চালাবে। যোগ্যতার সঙ্গে দ্রুত কাজ চালাবার উপযোগী করে লিগের সংবিধানও বদল করা হল ও রাসবিহারী বসুকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা দেওয়া হল।

রাসবিহারী বুঝলেন যে সংকট কাটিয়ে ওঠা গেছে। লিগ ও আই এন এ এখন কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। জুন (১৯৪৩) মাসে

তিনি টোকিয়ো ফিরে গেলেন। এখন সকলেই সুভাষচন্দ্রের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

জাপান ও জার্মান সরকারের কথাবার্তার ফলে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে টোকিয়ো আসা সম্ভব হয়েছিল। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সালে ভোরবেলায় সুভাষচন্দ্র আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মানির কিয়েল বন্দরে একটি জার্মান সাবমেরিনে উঠলেন।
এপ্রিল মাসের শেষাশেষি তিনি পৌঁছলেন মাডাগাস্কার থেকে ৪০০ মাইল দূরে ভারত মহাসাগরের কোনো এক স্থানে। সেখানে ২৮ এপ্রিল তারিখে জার্মান সাবমেরিন থেকে তাঁকে জাপানী সাবমেরিনে তুলে দেওয়া হল।
সেখান থেকে পৌঁছলেন সুমাত্রায়। সাবমেরিন ছেড়ে জমিতে পা দিলেন ৬ মে তারিখে এবং সেখান থেকে বিমানে টোকিয়ো এসে পৌঁছলেন ১৬ মে ১৯৪৩ তারিখে। বিপদসংকুল সমুদ্রপথে ৯০ দিন পরে তাঁর ঐতিহাসিক যাত্রা সমাপ্ত হয়েছিল।
সুমাত্রায় পৌঁছে তিনি অবাক হলেন যখন দেখলেন যে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবর জন্যে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বার্লিনে জাপানী দূতবাসের মিলিটারি অ্যাটাচি তাঁর পুরনো বন্ধু কর্নেল ইয়ামামোটো। নেতাজীর সাবমেরিন যাত্রার মূলে ইয়ামামোটোর অবদান কম নয়। ইয়ামামোটো এখন বার্লিন থেকে বদলি হয়ে পূর্ব এশিয়ায় এসেছেন। পূর্ব এশিয়াতে লিয়াজঁ অফিসের তিনি প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন। অফিসের বর্তমান নাম হিকরি কিকান।
টোকিয়ো পৌঁছেই নেতাজী জাপানের নেতাদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর সঙ্গে তিনি দু'বার বৈঠকে বসলেন এবং ভারতের মুক্তি সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছলেন জাপান কতদূর সাহায্য করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হল।
জাপানের ডায়েটের (পার্লামেন্ট) অধিবেশনে জেনারেল তোজো

নেতাজীকে দু'বার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং নেতাজীর উপস্থিতিতে ঘোষণা করেছিলেন : ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

নেতাজী যখন বুঝলেন যে এবার তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এগিয়ে যেতে পারবেন তখনই তিনি জাপানে তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করলেন। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠল।

পূর্ব এশিয়াতে ভারতবাসীদের লক্ষ্য করে নেতাজী টোকিয়ো রেডিও থেকে বললেন : ব্রিটিশ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের স্বদেশবাসীদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লব করা এখন সম্ভব নয়। দেশকে মুক্ত করার জন্যে সে-ভার ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দেরই হাতে তুলে নিতে হবে। সময় ও সুযোগ এসে গেছে এখন প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতীয়কে সমরক্ষেত্রের দিকে ছুটতে হবে। তোমাদের রক্তে দেশ স্বাধীন হবে।

২ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু টোকিয়ো থেকে বিমানে সিঙ্গাপুরের সামবয়াং বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে মোটরে এলেন সিঙ্গাপুরের মূল বিমানঘাটিতে। এখানে আই আই লিগের এবং আই এন এ-এর অফিসারেরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এছাড়া নেতাজীকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়েছিল।

আই এন এ-এর পক্ষ থেকে নেতাজীকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হল। সমবেত জনতা ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তিনি 'সাথিয়ো ঔর দোস্তো' সম্বোধন করে একটি ভাষণ দিলেন। নেতাজী সকলের মন জয় করে নিলেন।

দুদিন পরে ৪ জুলাই ক্যাথে সিনেমা হলে তিনি আবার ভাষণ দিলেন এবং ঐদিনই রাসবিহারী বসুর হাত থেকে সমস্ত ভার

গ্রহণ করলেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ঘোষণাও তিনি সেইদিনই করলেন। আজাদ হিন্দ সরকারই আজাদ হিন্দ বাহিনী পরিচালনা করবে।

সেইদিন থেকেই নেতাজী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ২৫ মাস পর্যন্ত তিনি আর বিশ্রাম নেন নি। শেষদিন পর্যন্ত, যেদিন তিনি সাইগনে একটি জাপানী বোমারু বিমানে উঠলেন। সেদিন পর্যন্ত তিনি নিরন্তর ও অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন।

৫ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুর টাউনহলের বিপরীতে বিস্তৃত ময়দানে নেতাজী আই এন এ-র এক সৈন্যদল পরিদর্শন করে মঞ্চে উঠে ভাষণ দিলেন। যার মূল মন্ত্র হল 'দিল্লি চল', ব্রিটিশদের তাড়িয়ে লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম থামবে না।

পরদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো সিঙ্গাপুরে আই এন এ বাহিনী পরিদর্শন করেন ও বাহিনীকে উৎসাহ দেন।

এরপর তিন চার মাস ধরে দিন রাত্রি পরিশ্রম করে নেতাজী আই আই লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঢেলে সাজালেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে লোক সংগ্রহের জন্যে সারা মালয় ঘুরে বেড়ালেন।

একতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ এগিয়ে চলল।

কাজের সুবিধার জন্যে কয়েকটি নতুন বিভাগও খোলা হল, নতুন নতুন কর্মীকেও সংগঠনে আনা হল।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর। তারিখটি স্মরণযোগ্য। ঐ তারিখে সারা পূর্ব এশিয়ার আই আই লিগের সমবেত প্রতিনিধি ও জনসাধারণের সমক্ষে আজাদ হিন্দ সরকারের বিষয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়।

ঐ তারিখে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে এক জনসভায় বিকেল

সাড়ে চারটের সময় নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন :—

১৭৫৭ সালে বাংলায় ব্রিটিশের কাছে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয়েরা তাঁদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবার জন্যে একশত বৎসর ধরে অবিরাম কঠোর যুদ্ধ চালান। ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায় ভারতীয়দের অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনীতে পূর্ণ।

এই অধ্যায়েই বাংলার সিরাজউদ্দৌল্লা, মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দার আলি, টিপু সুলতান, ভেলুথাপ্পি, মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব ভোঁসলে, পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আগরওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, ডুমরাওনের মহারাজা কুমার সিং এবং নানা সাহেবের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বুঝতে পারেন নি যে ব্রিটিশরা সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে, যদি এ কথা তাঁরা বুঝতেন তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন।

ভারতীয়রা যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন তখন বড় দেরি হয়ে গেছে, তবু ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে ভারতীয়েরা একবার সমবেত চেষ্টা করে দেখলেন। স্বাধীনতার জন্যে ভারতীয়দের এই শেষ সংগ্রাম।

ব্রিটিশরা ভারতীয়দের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল, নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করল, ফলে ভারতীয়রা কিছুকাল তাদের পদানত হয়ে রইল। তারপর ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আবার নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল।

এই সাল থেকে আরম্ভ করে গত মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত তারা আন্দোলন, প্রচার, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, সশস্ত্র বিপ্লব প্রভৃতি নানা উপায়ে তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে বিফল

হয়েছে।

নৈরাশ্যে মুহ্যমান হয়ে তারা যখন নতুন পথের সন্ধানে ঘুরছে এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী তাদের হাতে এক নতুন অস্ত্র তুলে দিল, এই অস্ত্র হল অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ।

এখন থেকে ভারতীয়দের শুধু যে রাজনৈতিক চেতনা লাভ হল তাই নয়, তারা একটা রাজনীতিক ঐক্যও লাভ করল। তাদের এখন কথা এক, ভাব এক, ইচ্ছা ও আদর্শ এক।

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তারা ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী রূপে কাজ করে তাদের প্রশাসনিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। এমনি করে বর্তমান মহাসমরের প্রাক্কালে ভারতীয় শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

ব্রিটিশের ছলনা, প্রতারণা, শোষণ নির্যাতনে ভারতবাসী একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে, ব্রিটিশের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আজ আর ভারতীয়দের নেই, ভারতবর্ষে আজ ব্রিটিশ সহায়হীন, বন্ধুহীন। এই দূষিত শাসনের অবসান ঘটাতে প্রয়োজন শুধু একটিমাত্র অনল শিখা, এই অনল শিখা জ্বালাবে আজ আজাদ হিন্দ ফৌজ।

মুক্তির লগ্ন সমাগত, এখন ভারতীয় জনগণের কর্তব্য হচ্ছে একটি সাময়িক সরকার প্রতিষ্ঠা করে তারই পতাকাতলে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা করা। ভারতের নেতারা আজ কারারুদ্ধ, ভারতের জনসাধারণ নিরস্ত্র সুতরাং ভারতভূমিতে এইরকম একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বা সশস্ত্র যুদ্ধ করাও সম্ভব নয়।

সুতরাং এই কার্যভার পূর্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগকে গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষের ভেতর ও বাইরে থেকে ভারতীয়দের এই কাজে অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ দিয়ে চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রাম চালাবার জন্যে প্রাণপণ সাহায্য করাই একমাত্র কর্তব্য।

এই সাময়িক সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্যলাভের অধিকার রাখে এবং তা দাবিও করে। এই সরকার প্রত্যেক নাগরিককে যে কোনো ধর্মপন্থা অনুসরণের স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ

দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সমগ্র জাতির এবং তার শাখা উপশাখা-সমূহের সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে আজাদ হিন্দ সরকার কৃতসংকল্প। ইংরেজ সরকার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ভারতীয়দের মধ্যে নানারকম ভেদ সৃষ্টি করেছিল, আজাদ হিন্দ সরকার তা সমূলে উৎপাটিত করবে। ভগবানের নামে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ ভারতীয় জনগণকে এক জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে গেছেন তাদের নামে এবং অতীত ভারতের যেসব বীর পুরুষ নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের ভেতরে শৌর্য ও আত্মত্যাগের স্পৃহা জাগিয়ে রেখে গেছেন, তাঁদের পবিত্র নামে আমরা প্রতি ভারতীয়কে আজাদ হিন্দ পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে আহ্বান করছি। তাঁরা ব্রিটিশ এবং ভারতে অবস্থানকারী ব্রিটিশের অন্যান্য মিত্রশক্তির সঙ্গে অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় নিয়ে শেষ বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে যুদ্ধ চালাতে থাকবেন।

ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে দেশ স্বাধীন না করা পর্যন্ত তাঁদের বিরাম নেই।

আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে উক্ত ঘোষণায় নিম্নোক্ত ব্যক্তি-গণের পদাধিকার উল্লেখ করে নাম ঘোষণা করা হল :—

সুভাষচন্দ্র বসু সর্বাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, সমর ও বৈদেশিক মন্ত্রী।
ক্যাপটেন মিসেস লক্ষ্মী স্বামীনাথন (মহিলা সংগঠন)
এস এ আয়ার (প্রচার)
লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি (অর্থ)
লেঃ কর্নেল আজিজ আমেদ, লেঃ কর্নেল এন এস ভগত, লেঃ কর্নেল জে কে ভোঁসলে, লেঃ কর্নেল গুলজারা সিং, লেঃ কর্নেল এম জেড কিয়ানি, লেঃ কর্নেল এ ডি লোগনাথন, লেঃ কর্নেল এহসান কাদির, লেঃ কর্নেল শাহ নওয়াজ (সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি) এ এম সহায়, সেক্রেটারি (মন্ত্রীর পদমর্যাদায়), রাসবিহারী বসু (সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা)।

করিম গনি, দেবনাথ দাশ, ডি এম খান, এ ইয়েলাপ্পা, জে থিবি, সর্দার ঈশ্বর সিং (পরামর্শদাতা)।

এ এন সরকার (আইন উপদেষ্টা)।

সেদিন সুভাষচন্দ্রের ভাষণের পর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে জনতা ফেটে পড়ল।

এরপরের কাহিনী সকলের জানা আছে।

মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয় লাভ করে পূর্ব এশিয়া পুনরায় দখল করল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু অফিসার ও সৈন্যকে বন্দী করে ভারতে আনা হল। যশোর জেলার অমৃতবাজারে, দিল্লির লাল কেল্লায়, নয়াদিল্লির ক্যান্টনমেন্টের কাবুল লাইনে বন্দীদের রাখা হয়েছিল। প্রায় পঁচিশ হাজার জন বন্দী ছিল।

একদিন যারা মুক্তি পতাকা উত্তোলন করার শপথ নিয়েছিল আজ তারা স্বদেশে বন্দী। এ হল ১৯৪৫ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসের কথা।

স্বাধীনতার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাজিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাদের সংগ্রাম কাহিনী ও ভারতে তাদের উপস্থিতি প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে বিরাট এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই চাঞ্চল্য জনমানসে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে ভারতের স্বাধীনতা অনেক এগিয়ে এসেছিল। প্রবল জনমতকে ব্রিটিশ শক্তি আর উপেক্ষা করতে পারে নি।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। গুজব শোনা গেল যে দিল্লির লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কুড়ি হাজার অফিসার ও জওয়ান বন্দী রয়েছে। এঁদের মধ্যে ছ জনকে নাকি গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

২০ আগস্ট তারিখে জওহরলাল নেহরু বললেন : ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির বিরাট একটা সংখ্যা বন্দী, তাঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। নেহরুজী এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে

বলেছিলেন তাঁদের সাধারণ বিপ্লবী মনে করা ঘোরতর অন্যায় এবং তাঁদের যে শাস্তি দেওয়া হল সে শাস্তি বস্তুতঃ ভারতবাসীদেরই দেওয়া হল এবং এই আঘাতে ভারত আজ জর্জরিত··· ।

সারা ভারত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি লোকের মুক্তি দাবি করল দেশবাসী। ব্রিটিশ সরকার বলল যে যারা চাপে পড়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল তাদের জন্য সরকার হালকা শাস্তির কথা ভাবছেন।

কিন্তু যুদ্ধবন্দীরা বলল তারা চাপে পড়ে শত্রুপক্ষে যোগদান করে নি, দেশকে স্বাধীন করবার জন্যেই তারা যুদ্ধ করেছে।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পুনা শহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল। অধিবেশনের পর ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করল যে এই সকল লোকগুলি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে—যদিও ভুল-পথে—সংগ্রাম করেছে, তাদের শাস্তি দিলে ঘোরতর অন্যায় হবে। স্বাধীন ও নতুন ভারত গড়ে তুলতে তাদের অন্যান্য সাধারণ কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

ওয়ার্কিং কমিটি আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী নরনারীর মুক্তি দাবি করল। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল অফিসার ও নরনারীকে বিচারের জন্যে আদালতে দাঁড় করানো হবে তাদের পক্ষ সমর্থন ও অন্যান্য ব্যবস্থার জন্যে এক সপ্তাহ পরে ওয়ার্কিং কমিটি একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করল।

অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে, বলতে গেলে দেশের প্রথম শ্রেণীর আইনজীবীদের এই কমিটির সদস্যভুক্ত করা হল। কমিটিতে রইলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজু, জওহর-লাল নেহরু, আসফ আলি (কনভেনর) এবং রঘুনন্দন সরন। অন্য সদস্য নিয়োগ করার ক্ষমতা এই ডিফেন্স কমিটিকে দেওয়া হল। এই কমিটি পরে অন্যান্য প্রখ্যাত আইনজীবীদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হলেন রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, কনোয়ার স্যার দলীপ সিং লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন

বিচারপতি পি কে সেন।

মহাত্মা গান্ধী তখন ছিলেন দিল্লির হরিজন কলোনিতে। তিনি লাল কেল্লার ভেতরে ও বাইরে আই এন এ-র কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন।

১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার মন্ত্রী শ্রী এস এ আয়ার জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে নেহরুজী আয়ারকে বলেন যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকগুলি যেন ভারতের বিশাল জনতার মধ্যে হারিয়ে না যায়, তিনি তা চান না।

মতিরাম লিখিত 'টু হিস্টরিক ট্রায়ালস ইন দি রেড কোর্ট' বইয়ের ভূমিকায় নেহরুজী ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে লিখেছিলেন: ভারত বনাম ইংলণ্ড এই পুরাতন মামলাটি এই বিচার নাটকীয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এই বিচার যেন ভারতীয় জনমত ও ভারতের শাসকদের মধ্যে এক শক্তির পরীক্ষা, তবে ভারতের জনমতই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

বাহাদুর শাহের বিচারের পর সুদীর্ঘ ৮৭ বছর পরে লাল কেল্লায় আবার আদালত বসল তবে এবার ফৌজী আদালত, মিলিটারি কোর্ট। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজনকে বেছে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের দেশপ্রেমের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

৫ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখে দিল্লির লাল কেল্লায় কোর্ট মার্শাল বসল। আই এন এ-র যে তিন জনের বিচার হবে তাঁদের নাম :—

১। ক্যাপটেন শাহ নওয়াজ খান (১/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট)

২। লেফটেনাণ্ট গুরুবক্স সিং ধিলন (১/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট) এবং

৩। ক্যাপটেন প্রেমকুমার সেহগল (২/২০ বেলুচ রেজিমেণ্ট)।

এরা তিন জনেই নিজ নিজ ইউনিফর্ম পরেই আদালতে হাজির হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা কোন ব্যাজ ধারণ করতে পারেন নি।

মিলিটারী কোর্টের সদস্য সংখ্যা ছিল সাত। এঁরা হলেন :—

১। মেজর জেনারেল এ বি ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড, সি. বি, ও. বি. ই প্রেসিডেণ্ট

২। ব্রিগ্রেডিয়ার এ জি এইচ বোর্ক

৩। লেঃ কর্নেল সি আর স্টট এম. সি. আই আর আর ও,

৪। লেঃ কর্নেল টি আই স্টিভেনসন, সি. আই. ই., এম. বি. ই. এম সি, রয়েল গাঢ়োয়াল রাইফেলস

৫। লেঃ কর্নেল নাসির আলি খাঁ, রাজপুত রেজিমেণ্ট

৬। মেজর প্রীতম সিং আই এ সি এবং

৭। মেজর বনোয়ারি লাল, ১৫ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট

আদালতের ওয়েটিং মেম্বার ছিলেন লেঃ কর্নেল সি এইচ জ্যাকসন আই, আর আর ও, মেজর এস এস পণ্ডিত, ১৫ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট এবং ক্যাপটেন গুরুদয়াল সিং রণধওয়া (সি আর ও ২৫) ১৩ ডি সি ও ল্যানসার।

ফরিয়াদি পক্ষে কৌসুলী ছিলেন ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যর এন পি এঞ্জিনিয়ার। তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন লেঃ কর্নেল পি ওয়ালশ মিলিটারি প্রসিকিউটর; কর্নেল এফ সি এ কেরিন ও, বি, ই, ডি, জি, এ, জি, সেণ্ট্রাল কমাণ্ড, জজ অ্যাডভোকেট।

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন রাইট অনারেবলস্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রু, শ্রীভুলাভাই দেশাই, শ্রীজওহরলাল নেহরু, জনাব আসফ আলি, ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, রায়বাহাদুর বদ্রীদাস, কনোয়ার স্যার দলীপ সিং এবং শ্রী পি কে সেন।

বেলা ১০টায় আদালত বসল। আদালত জানতে চাইলেন প্রতিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের নেতা কে? স্যার তেজবাহাদুর বললেন তাঁর অসুস্থতার জন্য তাঁর স্থলে শ্রীভুলাভাই দেশাই নেতার কাজ করবেন। তিনিই মামলা পরিচালনা করবেন। শ্রীদেশাই আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে ইণ্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্টের বিধান অনুসারেও মিলিটারি কোর্টে ওকালতি করার যোগ্যতা তাঁর আছে। মিলিটারি কোর্টের গঠন বিষয়ে আসামীদের প্রশ্ন করায় আসামীরা জবাব দিলেন যে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। এরপর আদালতে শপথ

গ্রহণের পালা সমাপ্ত হল।

এরপর আসামীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্তরূপ চার্জশীট পাঠ করা হল: আসামীরা যথা আই, সি-৫৮ ক্যাপটেন শাহ নওয়াজ খান, ১।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট; আই, সি-২২ ক্যাপটেন পি কে সেহগল, ২।১০ বেলুচ রেজিমেণ্ট এবং আই, সি-৩৩৬ লেঃ জি এস ধিলন, ১।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট সকলেই ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত অফিসার এবং দিল্লির সি, এস, ডি, আই, সি, (১)-এর সঙ্গে সংযুক্ত, এঁরা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ ধারা অনুসারে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং এঁরা সকলে মিলে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, রেঙ্গুনে, পোপার নিকটে, কিয়কপাডাউং-এর নিকট এবং বর্মার অন্যত্র ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

ভারতীয় পেনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে ৬ মার্চ ১৯৪৫ বা কাছাকাছি কোনো তারিখে বর্মার পোপা হিলে বা কাছে হরি সিংকে হত্যার অপরাধে লেঃ ধিলন অপরাধী।

এইভাবে তিনজনকেই হরি সিং, দুলিচাঁদ, পরদেব সিং এবং ধরম সিংকে হত্যার অপরাধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারা বা উপধারা অনুসারে অপরাধী করা হল। এ ছাড়া শাহ নওয়াজ খানকে অপরাধী বলা হল কাজিন শা, আয়া সিং এবং মহম্মদ হুসেনকে (গানায়) হত্যার অপরাধে।

এই সকল অভিযোগের উত্তরে আসামীরা নিজেদের নিরপরাধ বললেন। শ্রীদেশাই বললেন যে এই অভূতপূর্ব মামলার জন্য এবং আসামী পক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত তাঁর আরও সময় চাই। আদালত মুলতুবি রাখার জন্যে তিনি অনুরোধ জানালেন।

অ্যাডভোকেট জেনারেল আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন যে তিনি এখনও মামলা আরম্ভ করেন নি তার আগে আদালত মুলতুবি রাখা চলে না, তাছাড়া তিনি এখনি এমন একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করতে চান যিনি বেশ কিছু তথ্য ও প্রমাণ পেশ করবেন

যেগুলি মামলার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

মিলিটারি কোর্টের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললেন যে তথাপি আদালত মুলতুবি রাখা হবে কারণ আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এইমাত্র পড়া হল এবং ১১২ জন সাক্ষীর মধ্যে এখনও ৮০ জনের জবানবন্দী নেওয়া হয় নি। প্রতিবাদী পক্ষের অসুবিধা তিনি স্বীকার করলেন এবং সেজন্য সময় দেওয়া হয়েছিল।

আসামী তিনজনের জীবনপঞ্জী উল্লেখ করে অ্যাডভোকেট জেনারেল তাঁর মামলা আরম্ভ করলেন এবং মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উল্লেখ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অজানিত তথ্যের বিবরণী দিলেন।

মিঃ এঞ্জিনিয়ারের বিবৃতি থেকে সর্বপ্রথম জানা গেল যে আই এন এ-র সংগঠনে ছিল (ক) হেডকোয়ার্টার, (খ) হিন্দুস্থান ফিল্ড গ্রুপ, (গ) শৈরদিল গেরিলা গ্রুপ, (ঘ) স্পেশাল সারভিস গ্রুপ, (ঙ) ইন-টেলিজেন্স গ্রুপ এবং (চ) রিইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ। প্রথম হিন্দ ফিল্ড গ্রুপ-এর মধ্যে ছিল হেডকোয়ার্টার ১,২ এবং ৩ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন; আই এ এফ ভি ব্যাটালিয়ন ১ হেভি গান ব্যাটালিয়ন নাম্বার ওয়ান মেডিক্যাল কম্পানি এবং নাম্বার ওয়ান পি টি কম্পানি' গেরিলা গ্রুপের মধ্যে ছিল গান্ধী গেরিলা রেজিমেণ্ট, আজাদ গেরিলা রেজিমেণ্ট এবং নেহরু গেরিলা রেজিমেণ্ট, এবং পরে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আসার পর একটি সুভাষ রেজিমেণ্ট গঠিত হয়েছিল।

একটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করার মতলব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের বহুদিনের। ব্যাপারটা জাপানীদের মনঃপুত হল। এটাকে তারা প্রচারের মূলধন করতে পারবে। যাই হোক সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণের দু'দিন পরে ১৯৪২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে বহু ভারতীয় যুদ্ধবন্দীকে সিঙ্গাপুরের ফেরের পার্কে জমায়েত করা হয়।

জাপানের পক্ষে মেজর ফুজিওয়ারা ভাষণ দিলেন। ভারতীয়দের দলে টানবার ভার দেওয়া হয়েছিল ফুজিওয়ারাকে। এরপর ক্যাপটেন মোহন সিং ভাষণ দেন। তিনি বললেন: আমরা একটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠন করতে চলেছি, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আমরা লড়াই করব। এই আর্মিতে তোমরা সকলে যোগদান কর। নিয়মমাফিক ভাবে আই এন এ গঠিত হল ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে। ইতিমধ্যে প্ররোচনা ও প্রচার চলতে লাগল পূর্ণ উদ্যমে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল বলতে লাগলেন:

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ক্যাপটেন শাহ নওয়াজখান নিস্থন প্রিজনার অফ ওয়ার ক্যামপের কমাণ্ডার ছিলেন। শাহ নওয়াজ প্রায় দু-তিনশ' অফিসারকে এক মিটিং-এ বলেন যে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হেড-কোয়ার্টারে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে অফিসারগণ যেন সৈনিকদের বুঝিয়ে বলেন যে জাতিধর্মনির্বিশেষে এখন সকল ভারতীয়ের কর্তব্য ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা এবং এই জন্যে বন্দী সৈনিকেরা যেন মুক্তি ফৌজে যোগদান করে। সমবেত শ্রোতাগণ শাহ নওয়াজের প্রস্তাবে রাজি হন।

এরপর ১৯৪২-এর জুন মাসে ব্যাংককে এক কনফারেন্স। অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয় ফৌজের অনেক অফিসারও যোগদান করেছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে বলা হয় যে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে একটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠিত হবে যাতে সামরিক বিভাগের এবং পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়েরা যোগ দেবে। এই বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগ বাহিনীকে অর্থ, রেশন ও পোশাক পরিচ্ছদ যোগান দেবে এবং জাপান সরকার অস্ত্র ও গুলি-গোলা সরবরাহ করবে।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতে সিঙ্গাপুর এলাকায় বিদারি, সেলিটের এবং ক্রাঞ্জি বন্দী শিবিরের বন্দী সৈনিকেরা আই এন এ-তে

যোগ দিয়েছিল। ফরিয়াদি পক্ষ অভিযোগ করে যে যারা এই মুক্তি ফৌজে যোগ দেবার বিরুদ্ধে বাধা দিয়েছিল তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চালান দেওয়া হয়, তাদের খারাপ খাবার দেওয়া হতে থাকে, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়, নানারকম শাস্তি দেওয়া হতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে ক্রাঞ্জি ক্যাম্পের প্রায় ৩০০ মুসলমান বন্দী সৈনিক মুক্তিফৌজে যোগ দিতে বরাবর অনিচ্ছুক ছিল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক তারিখে চৌদ্দ জন সশস্ত্র শিখ সৈন্য নিয়ে জমাদার ফতে খাঁ এবং সুবেদার সিঙ্গাড়া সিং এই ক্যাম্পে চড়াও হয়ে ঐ তিনশ মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করে। একজন শিখও মারা যায়। এরপর কয়েকজন জাপানী অফিসার আসে এবং আরও অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বন্দীদের মুক্তিফৌজে যোগ দিতে বাধ্য করে। ক্যাপটেন মোহন সিংও এই পথ অবলম্বন করে বন্দী সৈনিক-দের জোর করে মুক্তিফৌজে ভর্তি হতে বাধ্য করে।

ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিদারি ক্যাম্পেও এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ২।৯ গুর্খা রাইফেলের গুর্খা সৈনিক ও অফিসারগণ মুক্তি ফৌজে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিল। জমাদার পুরণ সিং রক্ষীদের আদেশ করে বেয়নেট চার্জ করতে ও গুলি করতে।

কিন্তু শীঘ্রই গোলমাল আরম্ভ হল। জাপানী কর্তৃপক্ষ ও ক্যাপটেন মোহন সিং-এর মধ্যে মতবিরোধ ঘটল। জাপানী কর্তৃপক্ষ ক্যাপটেন মোহন সিংকে গ্রেফতার করল ও তাঁকে জেলে আটকে রাখল। অনেক যুদ্ধবন্দী যারা আই এন এ-তে যোগ দিয়েছিল তারা বাহিনী ছেড়ে দিল এবং অনেক অফিসারও আর আই এন এ-তে থাকতে চাইলেন না। বেশ গোলমাল বেধে উঠল। তখন কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ১০ ফেবরুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে ভারতীয় অফিসার-দের এক মিটিং-এ ডেকে তাদের সামনে কিছু প্রশ্ন রাখলেন যার মধ্যে একটি ছিল তুমি কি আই এন এ-তে থাকতে চাও? না ত্যাগ করতে চাও?

যারা অনিচ্ছা প্রকাশ করল তাদের বলা হল তারা যেন ১৩ ফেব্রুয়ারি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করে কিন্তু ১৩ তারিখে তারা দেখা করবার আগেই কাউনসিল অফ অ্যাকশন এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপণ্ডেন্স লিগের প্রেসিডেণ্টরূপে রাসবিহারী বসুর স্বাক্ষর-যুক্ত লিফলেট বিতরণ করা হল। সেই লিফলেটে লেখা ছিল :

"তোমরা জান যে ভারত-ব্রিটেন সংগ্রাম এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। ব্রিটেন যাতে ভারত ত্যাগ করে যায় সেজন্যে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্যে অনশন আরম্ভ করেছেন ফলে সকল রকম অপোষ মীমাংসার পথ বন্ধ। আমাদের কর্তব্য এখন স্পষ্ট। দুঃখের বিষয় যারা আই এন এ ত্যাগ করতে চায় তাদের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, জাপানীরা কি করবে, কোথায় কি ভাবে যুদ্ধ করবে তাও আমি জানি না এবং যুদ্ধবন্দীদের কি ব্যবস্থা করবে তাও আমি জানি না। যে সকল অফিসার বাহিনী ত্যাগ করার ইচ্ছা পুনর্বিবেচনা করবেন না তাঁরা যেন আজ বেলা সাড়ে এগারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কারণ জানান তারপর আমি আমার নীতি স্থির করব"।

ফরিয়াদি পক্ষের উকিল বলে চললেন ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাস থেকে বাহিনীতে নতুন লোক ভর্তি করা হচ্ছিল। ভারতের মুক্তির জন্যে, সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হবার জন্যে আসামীরা বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে যে আসামীরা এই কাজ করেছিলেন, নির্দেশ জারি করেছিলেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং নিজেরাও যুদ্ধ করেছিলেন। এইরূপে তারা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন।

জাপানীরা যে সমস্ত ব্রিটিশ অস্ত্র অধিকার করেছিল সেই সব অস্ত্র দিয়েই সৈনিকদের ট্রেনিং আরম্ভ করা হয়েছিল, তারা এবং অফিসারেরা ব্রিটিশদের দেওয়া ইউনিফরমই পরত এবং সেই ইউনিফরমের ওপর আই এন এ-র ব্যাজ লাগিয়ে নিত।

১৯৪২-এর অকটোবর মাস নাগাদ যতদূর সম্ভব ইণ্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্ট অনুসরণ করে লেফটেনান্ট নাগ একটি আই এন এ অ্যাক্ট তৈরি করেন। অতিরিক্ত ভাবে এই আইনে শাস্তি স্বরূপ বেতমারার বিধান ছিল তবে আদেশ দিতে পারতেন আর্মি কমাণ্ডারগণ, পরে এই ক্ষমতা অন্যান্যদেরও দেওয়া হয়েছিল যেমন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারগণও বেত মারার আদেশ দিতে পারতেন।

১৯৪৩-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে যুদ্ধ বন্দীদের প্রশাসন এবং প্রচারকার্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির এক্তিয়ারে ছিল। ঐ বছরের মে মাসে একটি ডাইরেকটরেট অফ মিলিটারি ব্যুরো গঠন করা হল যার মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল সেহগল এবং শাহ নওয়াজ ছিল চিফ অফ জেনারেল স্টাফ। অকটোবর মাসে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রদবদল করা হল।

২১ অকটোবর সুভাষচন্দ্র বোস সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। স্থির হল আই এন এ যে সকল ভূখণ্ড দখল করবে তার শাসনভার আজাদ হিন্দ সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে এবং যে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়েছিল শাহ নওয়াজ তার একজন সদস্য ছিল। সাময়িক সরকার পরে একটি ওয়ার কাউনসিলও গঠন করেছিল।

১৯৪৫-এর মার্চ মাসে যখন দেখা গেল যে আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সৈন্য ব্রিটিশ পক্ষে চলে যাচ্ছে তখন সুভাষচন্দ্র বোস এক আদেশ জারী করলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে কোনো ব্যক্তিকে কাপুরুষতার জন্যে গ্রেফতার করা হবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে গুলি করে হত্যা করা হবে।

ফরিয়াদি পক্ষ কিছু কাগজপত্র দাখিল করে। এইগুলি হয় শাহ নওয়াজের নিজের হাতে লেখা কিংবা কিছু কাগজে শাহ নও-য়াজের স্বাক্ষর ছিল। যে সব সৈন্য আই এন এ বাহিনীতে যোগ দেবে অথবা ভারত বর্মা সীমান্তে যুদ্ধের সময় যেসব ভারতীয় সৈন্যকে বন্দী করা হবে তাদের বিষয় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে

সেই সকল বিষয়ের পরিকল্পনা এই সব কাগজে লেখা ছিল। যেমন যেসব সৈন্য স্বেচ্ছায় বাহিনীতে যোগ দেবে তাদের নতুন করে ট্রেনিং দেওয়া হবে ও অস্ত্র দেওয়া হবে কিন্তু যেসব বন্দী সৈন্য ফৌজে যোগ দেবে না তাদের জাপানীদের হাতে সমর্পণ করা হবে এবং তাদের যুদ্ধবন্দী হিসেবেই রাখা হবে।

আর একটি কাগজে দেখা যাচ্ছে যে ২ এপ্রিল ১৯৪৫ তারিখে শাহ নওয়াজ লেজি ফ্রন্টে শত্রুপক্ষের ট্যাংক ও আরমারড কারের গতি-বিধি জানিয়ে জাপানী মেজর কাওয়াবারাকে একটি নোট পাঠিয়েছেন এবং কোথাও কোথাও টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে সে বিষয়েও জানান হয়েছে।

১০ এপ্রিল ১৯৪৫ তারিখে শাহ নওয়াজ ৬০৫, ৭৪৭ এবং ৮০১ নম্বর ইউনিটের প্রতি এক আদেশ জারি করে জানাচ্ছেন যে কোনো সৈন্য দলত্যাগ করলে সেটি মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

অ্যাডভোকেট-জেনারেল ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের ক্যাপটেন শাহ নওয়াজের ডায়েরি দাখিল করেছিলেন। ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে দেখা যাচ্ছে যে নিপ্পন আর্মির সুপ্রিম কমাণ্ডার শাহ নওয়াজকে সৈন্য চালনার আদেশ দিচ্ছেন।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে দেখা যাচ্ছে উত্তর বার্মায় জাপানের জি ও সি জেনারেল মোতোগুচি আই এন এ-কে সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

২০ মার্চ তারিখে জানা যাচ্ছে যে জাপানীরা আই এন এ-র ক্র্যাক রেজিমেণ্টের সৈনিকদের দিয়ে শ্রমিকের কাজ করাচ্ছে। খবরটি শাহ নওয়াজকে জানিয়েছে জনৈক বোবি।

তারপর ৪ এপ্রিল জানা যাচ্ছে যে শাহ নওয়াজ স্থির করেছেন যে তিনি ইমফল ফ্রণ্টে আক্রমণ করবেন। কিন্তু পরবর্তী দু মাসের মধ্যে জানা যাচ্ছে যে জাপানীরা অসহযোগিতা করছে ও বাধা দিচ্ছে।

৭ জুলাই জানা গেল যে আই এন এ বাহিনীর মধ্যে দারুন খাদ্য-

সংকট দেখা দিয়েছে। না খেতে পেয়ে অনেকে মারা যাচ্ছে, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করছে। আগস্ট পর্যন্তও জাপানীদের কাছ থেকে কোনো রেশন এসে পৌঁছল না। কিমেওয়ারির কাছে পারসকে শাহ্ নওয়াজ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কিমেওয়ারি বলেছে যে রুগ্ন ব্যক্তিরা আত্মহত্যা করুক।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ তারিখে শাহ্ নওয়াজের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে 'নেতাজীর' আদেশে শাহ্ নওয়াজ ফ্রন্টের পথে মধ্যরাত্রে পোপার পথে যাত্রা করলেন। পরদিন ভোর পাঁচটায় শাহ্ নওয়াজ কিয়কপাডাউং পৌঁছলেন এবং ইন্দে গ্রামে লেঃ ধিলন ও জাগিরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং পলায়মান প্রায় ৫০০ জনকে জমায়েত করলেন। আই এন এ-র অবস্থা তখন মোটেই ভাল নয়। একটা ব্যাটালিয়ন আত্মসমর্পণ করেছে এবং আর একটা ব্যাটালিয়ন পালিয়ে গেছে।

অতএব শাহ্ নওয়াজ ও ধিলন পোপায় গেলেন এবং সকাল ৭টায় সেহগল ও রিয়াজের সঙ্গে দেখা করে কমাণ্ডার কাঞ্জি বুটাই-এর সঙ্গে দেখা করলেন। পরদিন সাকু বুটাই আদেশ দিলেন শত্রুকে ইরাবতী নদীর ওপারে তাড়িয়ে দেওয়া হক। শাহ্ নওয়াজ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তদারক করে আই এন এ অফিসারদের বক্তৃতা দিলেন। ১১টার সময় শাহ্ নওয়াজ মিটালা পৌঁছে সেহগল ও ধিলনকে যুদ্ধ আরম্ভ করতে বললেন। কিন্তু যুদ্ধের মোড় তখন ঘুরে গেছে।

শাহ্ নওয়াজ তখন নেতাজীর সঙ্গে পিনমানায় দেখা করলেন এবং যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর শাহ্ নওয়াজ ২ নং ডিভিসনের ভার নেবার জন্যে রেঙ্গুনে দ্রুত ছুটে গেলেন। দু দিন পরে অর্থাৎ ৩ মার্চ স্থির হল যে শাহ্ নওয়াজ ২নং ডিভিসন পরিচালনা করবেন। ইতিমধ্যে কিছু দলত্যাগ সমানে চলেছে।

১৪ মার্চ শাহ্ নওয়াজকে সেহগল রিপোর্ট করলেন যে জাপানীরা পাইবি দখল করেছে এবং দুই কম্পানি সৈনিক নিয়ে সেহগল আক্র–

মণ করতে চলেছে কিন্তু আক্রমণ করার পর পরদিন সেহ্‌গল দেখলেন যে ওদিকে শত্রু নেই। ১৯ তারিখে শাহ্ নওয়াজ ও ধিলনের মধ্যে পরামর্শ।

২৫ মার্চ স্থির হল যে আই এন এ মূলবাহিনী এবং খানজো একত্রে পাইবি আক্রমণ করবে। ২৭ মার্চ শাহ্ নওয়াজ আদেশ জারি করলেন যে পিনিবিন্ আক্রমণ করা হোক। ইতিমধ্যে সেহ্‌গল এবং কয়েকজন অফিসারের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না কিন্তু ২৯ মার্চ তাঁরা ফিরে এল। ডায়েরিতে এপ্রিল মাসে দেখা যাচ্ছে যে বর্মার যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ২, ৩, ৪, ৫, এবং ৭ তারিখে দেখা যায় যে আই এন এ পিছু হটছে, অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে এবং শাহ্ নওয়াজ, সেহ্‌গল ও ধিলনের সঙ্গে বিপর্যয় সামলাবার আলোচনা করছেন তদনুসারে আদেশ জারি করছেন।

১৮ ও ১৯ এপ্রিলের মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক সকল প্রতিরোধ স্তব্ধ এবং ৪ ও ৫ মে তারিখে দেখা গেল যে আই এন এ-র সঙ্গে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে জাপানীরা নিজেরাই পালাচ্ছে। আই এন এ বাহিনীর মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল এবং ১৩ মে জানা গেল ব্রিটিশ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেছে। এ কথা শাহ্ নওয়াজ বাহিনীকে জানিয়ে দিলেন।

অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধবন্দী হওয়ার পক্ষে মত দিল এবং কিছু লোক বলল, তারা শাহ্ নওয়াজের নেতৃত্বে বর্মার জঙ্গলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ মে তারিখে সেই অধিকাংশ লোক যুদ্ধবন্দী হবার জন্যে মেজর জাগিরের নেতৃত্বে ব্রিটিশ লাইনের দিকে চলে গেল। শাহ্ নওয়াজ, ধিলন, মেজর মেহের দাস এবং ৮০ জন পেগুর দিকে যাত্রা করলেন। সেই দিনই বিকেল চারটে আন্দাজ সময়ে তারা একটা জঙ্গলে পৌঁছে দেখল সেখানে অনেক জাপানী রয়েছে, চারদিকে ব্রিটিশ সৈন্য, বেরোবার রাস্তা নেই। গ্রামবাসীরা কোনো সাহায্য করতে নারাজ, তারা ব্রিটিশের পক্ষে।

ডায়েরি শেষ লেখা হয়েছে ১৭ মে ১৯৪৫ তারিখে। ডায়েরিতে শাহ নওয়াজ লিখেছেন, গতকাল মাঝ রাত্রে ব্রিটিশ পক্ষের ২/১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সঙ্গে তাঁদের লড়াই হয়েছিল এবং সেই লড়াইয়ে শাহ নওয়াজ ধরা পড়েন। তাঁকে পেগু জেলে পাঠান হয়।

শাহ নওয়াজের কাগজপত্র উদ্ধৃত করা শেষ হলে অ্যাডভোকেট জেনারেল ক্যাপটেন সেহগলের কাগজপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলেন। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখ দেওয়া সুভাষচন্দ্র বসুর একটি আদেশ-নামায় সমস্ত ইউনিট কমাণ্ডারদের তাদের ইউনিট নিয়ে সমবেত হতে বলা হয়েছে। কুচকাওয়াজের পর তাদের আরাকান ফ্রণ্টের বিবরণ জানানো হবে এবং নতুন স্লোগান 'চলো দিল্লি' ধ্বনি জানিয়ে দেওয়া হবে। সেহগল ছিলেন আই এন এ-র মিলিটারি সেক্রেটারি। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ শীর্ষাঙ্কিত একটি আদেশনামা প্রচারিত হয়। আদেশনামায় বলা হয়েছিল যে আই এন এ-র যে সক সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহস দেখিয়ে ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্য নিহত বা গ্রেফতার করতে পারবে তাকে 'তামাঘা-ই-শ ক্রনাশ' দ্বারা ভূষিত করা হবে।

ক্যাপটেন সেহগলের ডায়েরি। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। ঐ তারিখের ডায়েরি পড়ে জানা যায় যে পোপা হিল প্রতিরক্ষার ভার তাঁর ওপর দেওয়া আছে।

১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের ডায়েরি পড়ে জানা যায় যে ব্রিটিশ সৈন্য ইরাবতী পার হচ্ছিল। ধিলনের বাহিনী তাদের বাধা দিতে গিয়ে প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে, যারা বেঁচে ফিরে এসেছে তাদের অবস্থা শোচনীয়, মনোবল একেবারে ভেঙে গেছে।

২২ ফেব্রুয়ারির ডায়েরি থেকে জানা যায় যে কর্নেল আজিজ আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত শাহ নওয়াজ খান তার ডিভিসনের ভার নেবে।

১ মার্চ তারিখে ডায়েরিতে সেহগল লিখছেন 'একজন অফিসার ফ্রণ্টে যেতে অস্বীকার করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হল। কি দুঃখের

বিষয়।'

কিন্তু পরদিন দেখা যাচ্ছে যে বাহিনীর অনেকের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে সেহগল নির্মম। কঠোর না হলে বিশ্বাসঘাতকতা দমন করা যাবে না। বিশ্বাসঘাতকতা না করেও ভয়ে অনেকে দলত্যাগ করেছে।

১১ মার্চের ডায়েরি পড়ে জানা যাচ্ছে যে ধিলন শীঘ্রই আক্রমণ করবে। ধিলনের ওপর সেহগলের আস্থা আছে। সে একটা কিছু করবে, সৈন্যদের আবার মনোবল ফিরে আসবে।

১৯ ফেব্রুয়ারির ডায়েরির পাতা। ধিলন অসম সাহসের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। দুই পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা প্রচুর।

২০ তারিখে সেহগল লিখছে যে সমগ্র পোপা হিল এবং কিয়ক-পাডাউং-এর প্রতিরক্ষার ভার তাকে নিতে হবে। ২৭ ও ২৮ তারিখের ডায়েরি পড়ে জানা গেল ধিলন ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা। ২৮ মার্চের পর সেহগল আর ডায়েরি লেখে নি। সেহগল কিন্তু ধরা পড়েছিল আরও এক মাস পরে।

অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার নোসিরওয়ান এঞ্জিনিয়ার এবার তিন জন আসামীর বিরুদ্ধে হত্যা অথবা হত্যায় প্ররোচিত করার অভিযোগ আনলেন। তিনি বললেন যে তাঁর হাতে লিখিত প্রমাণ আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের চারজন সেপাইকে গুলি করে হত্যা করায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ক্যাপটেন সেহগল এবং ৬ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে লেঃ ধিলন তা কার্যে পরিণত করিয়েছিলেন। লেঃ ধিলন স্বাক্ষরিত উক্ত তারিখের 'ক্রাইম' রিপোর্ট এবং ১৯ মার্চ তারিখের স্পেশাল অর্ডার পড়ে তথ্যটি জানা যায়। উক্ত চারজন সেপাই দল ত্যাগ করে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ তারিখে তারা যখন শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিল তখন পরবর্তী ২ মার্চ তারিখে তাদের অনুসন্ধানে প্রেরিত সার্চ পার্টি কর্তৃক ধৃত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের প্রচারিত আদেশানুসারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেন ক্যাপটেন সেহগল এবং তা কার্যকর করার ভার

দেওয়া হয় লেঃ ধিলনের ওপর। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে ৬ মার্চ তারিখে তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে এনে একটি ট্রেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। যারা সেখানে হাজির ছিল লেঃ ধিলন তাঁদের কাছে ঐ চারজনের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী বিবৃত করেন। ওদের গুলি করবার জন্যে আহ্বান জানালে নিজ নিজ রাইফেল বা রিভলভার নিয়ে এল/এন হিদায়েতউল্লা, এস/পি কালুরাম এবং নায়ক শের সিং এগিয়ে আসে।

ধিলন তখন প্রথম লোকটিকে ট্রেঞ্চ থেকে ডেকে তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে বলেন : লোকটি একটি অনুরোধ করতে চায় কিন্তু তা অগ্রাহ্য করা হয়। এরপর গুলি করার আদেশ দেওয়া হয় এবং হিদায়েতউল্লা গুলি করে। পরের লোকটিকেও হিদায়েতউল্লা গুলি করে এবং বাকি দু' জনকে গুলি করে কালুরাম।

কিন্তু সেই চারজন হতভাগ্যের তখনও মৃত্যু হয় নি। শের সিং তার রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে তাদের মেরে ফেলে। মৃতদেহগুলিকে কবর দেবার পূর্বে সমবেত সকলকে লেঃ ধিলন সতর্ক করে দেন যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে এইরকম শাস্তি পেতে হবে।

অ্যাডভোকেট জেনারেল অনুরূপ অভিযোগ আনেন ক্যাপটেন শাহ নওয়াজের বিরুদ্ধেও, তবে এক্ষেত্রে তিনি কোনো লিখিত প্রমাণ দাখিল করতে পারেন নি, মৌখিক প্রমাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অর্থাৎ একজন সাক্ষী হাজির করবেন। খাজিন শাহ এবং আয়া সিং জনৈক গোলন্দাজ মহম্মদ হুসেনকে হত্যা করে শাহ নওয়াজের আদেশে। শাহ নওয়াজের অভিযোগ ছিল মহম্মদ হুসেন, জাগরি রাম এবং আল্লাদিত্তা ব্রিটিশ পক্ষে পালাবার চেষ্টা করেছিল। প্রথম আসামী দোষ স্বীকার করে। শাহ নওয়াজ তাকে বলেন যে সে অন্যদেরও দলত্যাগ করতে প্ররোচিত করেছিল যার ফলে আরও দু'জন লোক দল ত্যাগ করছিল। মহম্মদ হুসেন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অতএব তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

মহম্মদ হুসেন ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিল কিন্তু শাহ নওয়াজ তার অনুরোধে

কর্ণপাত করেন নি। সেইদিনই খাজিন শাহ এবং আয়া সিং তাকে একটি নালার ধারে নিয়ে যায় এবং একটি গাছের সঙ্গে বাঁধে। তারপর তার চোখও বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। খাজিন শাহ, আয়া সিং এবং জাগরি রাম নামে একজন ফায়ারিং স্কোয়াডের মধ্যে ছিল। জাগরি রাম রাজি হয়নি কিন্তু খাজিন শাহ তাকে পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখায়।
শাহ নওয়াজ, সেহগল ও ধিলন যে আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধী এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল আইনের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে তাদের বিদ্রোহী বলেন।

লেঃ নাগের সাক্ষ্য

অ্যাডভোকেট জেনারেল তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তারপর ফরিয়াদি পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ ডি সি নাগকে হাজির করা হল। লেঃ নাগ একদা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, আই এন এ-তে যোগ দেবার পর আইন সম্বন্ধে পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। ক্যাপটেন মাথুরের সহযোগিতায় তিনি আই এন এ অ্যাক্ট রচনা করেন।
সাক্ষ্য দেবার সময় লেঃ নাগ বলেন যে ক্যাপটেন হবিবুর রহমান এবং ক্যাপটেন দিলসুখ মানের পরামর্শে বেত্রাঘাতের ধারা আইনে রাখা হয়। ক্যাপটেন মোহন সিং গ্রেফতার হবার পর তিনি স্থির করেন যে তিনি আই এন এ ত্যাগ করবেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আই এন এ ছেড়ে দিলে তাঁকে আবার যুদ্ধবন্দী করে রাখা হবে এবং তখনকার পরিস্থিতিতে চিকিৎসার কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না। সেইজন্য তিনি আই এন এ ত্যাগ করলেন না।
লেঃ নাগ আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র এবং অন্যান্য অনেক কাগজপত্র পেশ করেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের প্রশাসন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানান। নেতাদের সম্বন্ধেও কিছু খবর তিনি দিয়েছিলেন তবে যা কিছু বলেছিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলেছিলেন। আই এন এতে তিনি স্বয়ং ছিলেন জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং ডেপুটি অ্যাডজুটান্ট জেনারেল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ও তিনি সবিস্তার বর্ণনা দেন এবং একটি আজাদ হিন্দ ব্যাংকের বিষয়ও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই ব্যাংকে সর্বদা দশ কোটি টাকার বেশি রিজার্ভ ফাণ্ড থাকত। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দানে এই টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

লেঃ নাগ বলেন যে বস্তুতপক্ষে ছুটি আই এন এ গঠিত হয়েছিল। একটি ছিল ক্যাপটেন মোহন সিং গ্রেফতার হওয়ার আগে এবং অপরটি গঠিত হয়েছিল পরে কিন্তু জাপানীদের অধীন ছিল না। এটি ছিল একটি পৃথক ও স্বয়ংশাসিত ইউনিট জাপানীদের সহযোগী ও মিত্রপক্ষরূপে কাজ করত।

লেঃ নাগ বলেন যে আজাদ হিন্দ সরকারকে জার্মানি, জাপান, ইটালি, তাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, ক্রোয়েশিযা, মাঞ্চুরিয়া এবং বর্মা সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকার থেকে মুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার জাপানীরা আজাদ হিন্দ সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছিল।

লেঃ নাগ বলেন : অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সুভাষচন্দ্র আই এন এ ত্যাগ করতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে আই এন এ কেবলমাত্র তার নিজস্ব আজাদ হিন্দ সরকারের নির্দেশেই যুদ্ধ করবে এবং ভারতভূমিতে প্রবেশ করে যেসব ভূখণ্ড দখল করবে তা স্বতঃই আজাদ হিন্দ সরকার ভুক্ত হবে। ভারতীয়, শ্রম, চেষ্টা ও ত্যাগের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা আনতে হবে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে যেসব রাইফেল, কার্তুজ, কামান বা অন্য অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল সে সবই আজাদ হিন্দ ফৌজের দখলে এসেছিল। সেইসব অস্ত্র দিয়েই ফৌজের ট্রেনিং আরম্ভ হয় এবং সেইসব অস্ত্র দিয়েই ফৌজে লড়াইও করে।

লেঃ নাগের সাক্ষ্য শেষ হবার পর শ্রীদেশাইয়ের অনুরোধে আদালতে দু সপ্তাহ মুলতুবি রাখা হয়েছিল। এরপর ২১ নভেম্বর আবার আদালত বসে ও ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হয়।

ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবার জন্যে বল-প্রয়োগ করা হয়েছিল ফরিয়াদি এইরূপ প্রমাণ করবার জন্যে কয়েক-জন সাক্ষী হাজির করে। প্রতিবাদী পক্ষ আপত্তি জানিয়ে বলেন যে এ বিষয়ে মূল আসামী তিনজনের সম্পর্ক নেই অতএব এইরূপ সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। তথাপি ক্যাপটেন ধরগলকর, সুবেদার মেজর বাবুরাম, জমাদার আলতাফ রাজাক (বেঙ্গল স্যাপারস অ্যাণ্ড মাই-নারস)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় কিন্তু ভুলাভাই দেশাই তাদের জেরা করেন। জেরার ফলে তারা স্বীকার করে সে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবার জন্য কোনোরকম বল প্রয়োগ করা হয় নি, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ছিল। আরও কয়েকজন সাক্ষ্য দেয় কিন্তু ফৌজে চাপ দেওয়ার কথা কেউ বলে নি উপরন্তু একজন স্বীকার করেছিল যে ফৌজে যারা যোগ দেয় নি বা যারা যোগ দিয়েছিল এই দুই পক্ষেরই আহার একই ছিল, কোন পার্থক্য ছিল না।

ফৌজের মধ্যে সেপাইদের ওপর অত্যাচার প্রমাণ করাবার জন্যে কয়েকজন সাক্ষী হাজির করা হয়। সাক্ষীদের মধ্যে এ বিষয়ে মত-দ্বৈধতা ছিল, অত্যাচারের কথা সকলে স্বীকার করে নি। একজন তো বলল যে তাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে তাই বলেছে। আর একজন শাহ নওয়াজের বক্তৃতা উল্লেখ করে যা বলল তাতে প্রতিবাদীদের সহায়তা করা হল।

এরপর আই এন এ-র দুজন সিক্রেট সার্ভিসম্যানের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। আর আই এ এস সি-এর একজন কেরানী সুবেদার রামস্বরূপ বলে যে, মিলিটারি তথ্য সংগ্রহের জন্যে সে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে প্রবেশ করে কয়েক সপ্তাহ পরে সে ফিরোজপুরে ইণ্ডিয়ান আরমি ডিপোতে রিপোর্ট করে। সে বলে যে আই এন এ-তে সে গোড়ার দিকে যোগ দিয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সে তার বিশ্বাস রাখতে পারে নি।

সিক্রেট সারভিসের আর একজন লোক ল্যান্স নায়েক মোহিন্দর সিং বলে যে ক্যাপটেন মোহন সিং পরিচালিত প্রথম আই এন এ-তে

সে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল। ছদ্মবেশ গ্রহণে সে ট্রেনিং নিয়েছিল। স্যাবোটাজ করার জন্যে সে ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রথম আই এন এ-র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে বিশ্বাস করত কিন্তু মোহন সিং গ্রেপ্তার হওয়ার পর সে দ্বিতীয় আই এন এ-তে প্রথমে যোগ দেয় নি। পরে যোগ দিলেও তার মতলব ছিল ভারতে পালিয়ে যাওয়া এবং কি করে সে সফল হয় সে কথাও সে বলে। সে কিছু অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছিল।

হাবিলদার গোলাম মহম্মদ সাক্ষ্য দিতে এসে সুভাষচন্দ্রের একটি বক্তৃতার সারাংশ বলতে বলতে বলে যে 'দিল্লী চলো' স্লোগান তো ছিলই, শ্রদ্ধেয় নেতাজী আরও একটি স্লোগান যুক্ত করেন, 'খুন, খুন ঔর খুন।'

পলায়ন ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে যে চারজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল তাদের মৃত্যুদণ্ড কিভাবে ঘটানো হল তার বিবরণ শোনাবার জন্যে সিপয় আল্লাদিত্তা, সিপয় জাগরিরাম এবং ল্যানস নায়েক সরদার মহম্মদ হোসেনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। চারজন অপরাধীর বিচার ও দণ্ডের বিবরণ তারা দেয়। এরপর নারসিং সিপয় আবদুল হাফিজ খাঁ এবং সিপয় জ্ঞান সিং সাক্ষ্য দেয়। এরাও সবকিছু বলে, যে চারজন লোক গুলি চালিয়েছিল তাদের নাম বলে কিন্তু যে চারজনের মৃত্যুদণ্ড হল তাদের নাম বলতে পারে না।

এরপর ক্যাপটেন সেহগল কিভাবে আত্মসমর্পণ করেন সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন লেঃ কর্নেল জে এ কিটসন।

শাহ নওয়াজের বিবৃতি

ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হবার পর আসামীদের বিবৃতি দানের সুযোগ দেওয়া হল। আসামীরা পর পর তাঁদের লিখিত বিবৃতি পাঠ করলেন। প্রথম বিবৃতি দিলেন ক্যাপটেন শাহ নওয়াজ খান।

শাহ নওয়াজ খান বললেন : আমি পুরোপুরি সামরিক পরিবেশেই

প্রতিপালিত হয়েছি। আমাদের পরিবারের অনেকেই ব্রিটিশ আর্মিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখবার পূর্বে আমি রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলুম, রাজনীতির কোনো খবর রাখতুম না। আমি ভারতকে দেখতুম একজন যুবক ব্রিটিশ অফিসারের চোখ দিয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে তিনি কিভাবে জড়িত হয়ে পড়লেন সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন : ১৯৪২ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে আমি যখন সিঙ্গাপুরে এলুম তখন অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তবুও আমি স্থির করেছিলুম যে আমার সর্বশক্তি দিয়ে আমি প্রতিরোধ করব।

ঐ বছর ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সিঙ্গাপুরের জন্য যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধ যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই আমি দেখছি যে আমার উভয় পার্শ্ব থেকে ব্রিটিশরা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তথাপি আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলুম কিন্তু আমার কমাণ্ডিং অফিসার এসে আত্মসমর্পণ করবার আদেশ দিলেন।

আমি হতাশ ও বিরক্ত হলুম। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে আমাকে কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমাকে সিঙ্গাপুরে এনে তখন বলা হচ্ছে অস্ত্র সম্বরণ কর। এবং বিনা শর্তে! সৈনিক হিসেবে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগল এবং ব্রিটিশ অফিসারের আদেশ আমি অন্যায় বলে মনে করলুম।

যাইহোক ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের আলাদা করা হল এবং ভারতীয় সৈন্যদের ফেরার পার্কে জমায়েত করা প্রসঙ্গে শাহ নওয়াজ বললেন : আমরা জাপানীদের বর্বর আচরণ সম্বন্ধে শুনেছিলুম এবং আমরা ভেবেছিলুম যে ব্রিটিশরা আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাচ্ছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ তারিখে আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার মেজর মাডুম এবং আরও কয়েকজন অফিসার এসে আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক

করে বিদায় জানালেন। তিনি বললেন : আমাদের বোধহয় আর
দেখা হবে না।

আমি বুঝলুম যে ব্রিটিশরা আমাদের ত্যাগ করে চলল, আমাদের কপালে যা আছে সে জন্যে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই, তারা চিন্তিতও নয়। এরপর আমরা ফেরার পার্কে জমায়েত হলুম। আমাদের জাপানীদের হাতে সমর্পণ করা হবে।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কর্নেল হাণ্ট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বললেন যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি জাপানী কর্তৃপক্ষের হাতে আমাদের ভার দিচ্ছেন। আমরা এতদিন যেভাবে ব্রিটিশদের আদেশ পালন করে এসেছি এখন থেকে সেইভাবে যেন জাপানীদের আদেশ পালন করি।

এরপর জাপানের পক্ষ থেকে মেজর ফুজিওয়ারা আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়ে বললেন : এখন থেকে আমাদেব জীবন মরণের ভার ক্যাপটেন মোহন সিং-এর ওপর। তিনি বললেন যে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর অধীনে একটি বাহিনী গঠিত হবে যে বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে।

ক্যাপটেন মোহন সিংও ভাষণ দিলেন এবং মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে আমাদের অনুরোধ করলেন।

ফুজিওয়ারা ও মোহন সিং-এর আবেদনে আমি বিস্মিত। আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? এইভাবে গোরু ছাগলের মতো আমরা অন্য খোঁয়াড়ে চলে গেলুম, ব্রিটিশদের হাত থেকে জাপানীদের হাতে এবং জাপানীদের হাত থেকে মোহন সিং-এর হাতে।

মোহন সিংকে আমি জানতুম এবং আমার মনে হয়েছিল যে জাপানী-দের কুটবুদ্ধির সঙ্গে মোহন সিং এঁটে উঠতে পারবে না এবং আমরা খেলনার পুতুলে রূপান্তরিত হব

এরপর শাহ নওয়াজ খান পরবর্তী সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে বললেন : প্রথম ভাগ—১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের শেষপর্যন্ত, ১৯৪২। এই ধরনের মুক্তিফৌজ গঠন আমার মনঃপূত হচ্ছিল না এবং আমি সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেছিলুম।

দ্বিতীয় ভাগ—জুন ১৯৪২ থেকে জুলাই ১৯৪৩। আমি যখন বুঝলাম যে আমি বিরোধিতা করে বিশেষ কিছু করতে পারব না তখন আমি স্থির করলাম যে মুহূর্তে আমি বুঝব জাপানীরা আমাদের শোষণ করছে, আমার দলকে ভাঙবার চেষ্টা করব, দরকার হলে স্যাবোটাজ করব।

তৃতীয় ভাগ—জুলাই ১৯৪৩ থেকে মে ১৯৪৫। এই সময়ের মধ্যে আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে আই এন এ স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংশাসিত একটি মুক্তিবাহিনী।

এরপর শাহ নওয়াজ বললেন যে তিনি শুনলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে আসছেন এবং আই এন এ-র ভার নেবেন। এ হল ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসের কথা।

শাহ নওয়াজ বললেন : এই সময়ে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে আমরা চাই বা না চাই জাপানীরা ভারতে যাবেই। ভারতে ব্রিটিশরা জাপানের অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারবে না। মালয়ে আমি জাপানী সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করেছিলুম অতএব আমি ভাবলুম যে আমি যদি একটি রাইফেল হাতে ভারতে প্রবেশ করতে পারি তাহলে আমি অসামরিক ভারতীয়দের সেবা করতে পারব। বিদেশী সৈনিকদের অত্যাচারের হাত থেকে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করব। যুদ্ধবন্দী হয়ে মালয়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

অতএব আমি আই এন এ-র জন্যে এমন লোক ভর্তি করতে লাগলুম, দরকার হলে যারা জাপানীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবে।

নেতাজী যখন সিঙ্গাপুরে (জাপানীরা নাম বদলে দিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের নতুন নামকরণ করেছিল শ্যোনান) এলেন আমি তাঁকে

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলুম। আমি তাঁকে আগে কখনও দেখি নি এবং ভারতে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনো খবরও রাখতুম না।

সিঙ্গাপুরে আমি তাঁর কয়েকটা বক্তৃতা শুনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হলুম। এ কথা বাড়িয়ে বলা হবে না যে আমি তাঁর কথাগুলি শুনে সম্মোহিত হয়ে গেলুম এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলুম। পরাধীন ভারতের প্রকৃত ছবি তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। এই প্রথম একজন ভারতীয়ের চোখ দিযে ভারতকে দেখলুম।

নেতাজীর গভীর দেশপ্রেম নিস্বার্থপরতা এবং স্পষ্টবাদীতা এবং সর্বোপরি জাপানী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার অনমনীয় মনোভাব আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল, চোখ খুলে গেল।

আমি উপলব্ধি করলুম ভারতের সম্মান তাঁর হাতে নিরাপদ এবং তিনি এই সম্মান বিলিযে দেবেন না। যারা আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকতে চায় না তারা ফৌজ ছেড়ে চলে যেতে পারে কিন্তু যারা থাকবে তাদের চুড়ান্ত ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ফৌজের সৈন্যদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ্য করতে হবে, বিনা আহারে মাইলের পর মাইল মার্চ করতে হবে এবং তারপর মৃত্যু।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল হাজার হাজার অভুক্ত, দরিদ্র, রুগ্ন ভারতবাসী। তাদের যা কিছু ছিল তারা দেশের জন্যে সেইটুকু দান করে ফকির হয়ে গেল এবং তারা দেশের মুক্তির জন্যে সপরিবারে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করল।

আমি দেখলুম এই একজন নেতা। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র ও অসহায় ভারতবাসীর পক্ষে তিনি যে আহ্বান জানালেন তা উপেক্ষা করা আত্মসম্মান বিশিষ্ট ভারতীয়ের পক্ষে অসম্ভব।

আমি স্থির করলাম ইনিই আমার নেতা, আমি এই নেতাকেই অনুসরণ করব। আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলুম। ব্রিটিশ সেনাদলে আমার অনেক আত্মীয় আছেন,

তাদের বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ করব। তাদের তো আমি চোখ ফুটিয়ে দিতে পারছি না অতএব এছাড়া উপায় নেই।

অথচ আজীবন আমি অন্য পরিবেশে মানুষ, আমাদের আনুগত্য ছিল রাজার প্রতি, আমাদের শিক্ষাদীক্ষাও বিলিতি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, ব্রিটিশদের প্রতি আমরা ছিলুম সহানুভূতিশীল এবং আমরা বিশ্বাস করতুম সরকারের পরিবর্তন হলে দেশের কোনো উন্নতি হবে না। অবনতিই হবে।

কিন্তু এখন আমি অন্য লোক। আমি এখন লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ভারতবাসীকে দেখতে পাচ্ছি, ব্রিটিশ সরকার যাদের শোষণ করেছে এবং সহজে যাতে তাদের শোষণ করতে পারে সেজন্যে তাদের মূর্খ করে রেখেছে।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা হতে লাগল, এ ঘোর অন্যায় ও অবিচার। এই অন্যায় ও অবিচার দূর করবার জন্যে আমি যুদ্ধ করব. দরকার হলে আমি আমার ভাইয়ের বিরুত্তেও যুদ্ধ করব এবং বাস্তবিক ১৯৪৪ সালে বর্মার চিন পাহাড়ে আমি আমার এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম।

আমি লক্ষ্য করলুম যে একজন ব্রিটিশ সৈনিক এবং একজন ভারতীয় সৈনিকের মধ্যে অনেক ফারাক। যুদ্ধ তো সকলেই করবে তথাপি ব্রিটিশ সৈনিকের বেতন, ভাতা, আহার এবং অন্যান্য সুখসুবিধা অনেক বেশি।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে ভারতীয়দের মধ্যে অনেক কৃতী ও যোগ্য অফিসার থাকা সত্ত্বেও কোনো ভারতীয়কে ডিভিসনের ভার দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র একজনকে একটি ব্রিগেডের ভার দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের যাঁরা ট্রেনিং দিয়েছিল তাঁরা সকলেই ভারতীয় এবং উচ্চপদস্থ অফিসার না হলেও তাঁরা কিছু খারাপ ট্রেনিং দেন নি।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছি

এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সম্মানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলুম। রুক্ষ বা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আমরা যুদ্ধ করেছি, আমরা তিন হাজার মাইল মার্চ করেছি। দিনের পর দিন আমরা অভুক্ত থেকেছি, কখনও শুধু ধান বা জঙ্গলের ঘাস সেদ্ধ করে খেয়েছি, নুনও জোটে নি।

জাপানিদের কাছ থেকে আমরা কিছুই আশা করি নি, অনেক সময় সাহায্য করার পরিবর্তে ওরা আমাদের বাধা দিয়েছে। সময় সময় ওদের ওপর আমাকে গুলি চালাতে হয়েছিল। এসবই আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। সেই ডায়েরি আমি কোর্টে পেশ করেছি।

বিধিবদ্ধভাবে গঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের হয়ে আমি ভারতের মুক্তির জন্যে এবং যুদ্ধের আইন মেনে আমি যুদ্ধ করেছি অতএব আমি কোনো অপরাধ করি নি এবং এজন্যে কোর্ট মার্শাল বা যেকোনো কোর্ট আমার বিচারের অধিকারী নয়।

মহম্মদ হোসেনকে হত্যার প্ররোচনার অভিযোগ শাহ নওয়াজ খান অস্বীকার করেন। মহম্মদ হোসেনকে গুলি করার কথাও তিনি অস্বীকার করে বলেন যে যদিও আমি তা করে থাকি তাহলে কোনো অন্যায় করি নি কারণ আই এন এ অ্যাক্ট অনুসারে তার বিচার করা হয়েছিল। সে যে জঘন্য অপরাধ করেছিল সেজন্য যে কোনো মিলিটারি আইনে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমাদের গোপন খবর শত্রুদের হাতে পড়লে আমাদের সর্বনাশ হত, অনেকেরই প্রাণ যেত।

সেহগলের বিবৃতি

ক্যাপটেন শাহ নওয়াজ খানের বিবৃতির পর ক্যাপটেন সেহগল সোজাসুজি বললেন: আমি কোনো অপরাধ করি নি এবং আমি এ কথাও বলি যে কোর্ট মার্শাল বেআইনী ভাবে আমার বিচার করছেন।

ক্যাপটেন সেহগল বলেন যে যদিও পিছু হটতে হয়েছিল তবুও

তারা সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। যখন তারা মালয়ের দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছিলেন তখন বহু ভারতীয় তাদের কাছে এসে বলে যে আমরা এই যুদ্ধের জন্যে অনেক কিছু দিয়েছি আর এখন তোমরা আমাদের বিপদের মুখে ফেলে পালাচ্ছ? এখানকার মালয়ী ও চৈনিকেরা আমাদের ঘৃণা করে, তারা আমাদের ওপর অত্যাচার করবে, আমাদের ধনসম্পত্তি লুট করবে। তাদের কথা শুনে আমরা ব্যথিত হতুম, বলতুম ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, এছাড়া আমাদের করবার কিছু ছিল না। কিন্তু তাদের জন্যে কিছু করতে পারছি না এজন্যে মনে মনে আমরা লজ্জিত হতুম।

১৯৪২-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশরা যখন আমাদের জাপানীদের হাতে সমর্পণ করল তখন আমরা দারুণ আঘাত পেয়েছিলুম। তাদের জন্যে আমরা জীবনপণ করে লড়াই করলুম আর এখন তারা আমাদের শত্রুর দয়ার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। আমি তখন বুঝলুম যে ব্রিটিশরা আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করল। তারপরে জাপানীরা অবশ্য আমাদের ক্যাপটেন মোহন সিং-এর হাতে ছেড়ে দিল। মোহন সিং হলেন আই এন এ-র জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং অর্থাৎ জি ও সি। ব্রিটেনের প্রতি আমাদের আর কোনো আনুগত্য রইল না।

সেহগল বলতে থাকেন যে তাঁর প্রথমে বিশ্বাস জন্মেছিল যে ভারতীয় মুক্তিফৌজ গঠিত হলে জাপান সাহায্য করবে না। এজন্যে গোড়ার দিকে সেহগল আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে চায় নি যদিও তার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল যে ভারত যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীন হোক।

সেহগল বলছেন :—১৯৪২-এর জুন থেকে আগস্টের মধ্যে সুদূর-প্রসারী এমন সব ঘটনা ঘটল যে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে আর দূরে থাকতে পারলুম না। জাপান বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং এই গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে তারা ভারতে প্রবেশ করবেই এবং ইংরেজ তাদের গতিরোধ করতে পারবে না। এমন কি

লণ্ডনেব বি বি সি এই রকম আভাস দিয়ে ভারতীয়দের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল।

এই সময়ে সিঙ্গাপুরে যেসব ভারতীয় সৈন্য পাঠান হচ্ছিল তারা একেবারেই আনকোরা নতুন ও আনাড়ি, যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। দেশে তাদের হাতে কাঠের রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। কারও কারও ভাগ্যে লাইট মেসিনগান জুটেছিল। তাহলে জাপানীদের বাধা দেবার জন্যে ভারতের মূল ভূখণ্ডে কি ধরনের সৈন্য আছে তা বোঝাই যাচ্ছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নাকি প্রায় অরক্ষিত।

আমরা বিশ্বাস করলুম জাপানীদের বাধা দেবার মতো উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতে নেই। আমরা সকলে বির্মষ হয়ে পড়লুম। ভারতের ভাগ্যে তাহলে কি আছে? আবার পরাধীনতা? শুধু মনিব বদলের পালা?

ওদিকে ভারতে ১৯৪২-এর ৮ আগস্ট তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঐতিহাসিক কুইট ইণ্ডিযা বা ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং পরদিন ৯ আগস্ট তারিখ থেকে ভারতে আগস্ট বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেল।

লণ্ডনের বি বি সি বা দিল্লির অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগস্ট বিপ্লবের কোনো খবরই প্রচার করত না। তবুও আমরা খবর পাচ্ছিলুম। ভারতের ভেতরে কোথাও কোনো কোনো গুপ্ত রেডিও স্টেশন ছিল। তারা খবর প্রচার করত, এছাড়া বার্লিন রোম বা টোকিয়ো রেডিও মারফত খবর পেতুম।

আমাদের ধারণা হল যে ব্রিটেন এই আন্দোলন দমন করবার জন্যে ভারতীয়দের ওপর ভীষণ অত্যাচার করছে এবং ১৮৫৭ সালের পর ভারতে যে বিভীষিকার রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল এখন অনুরূপ নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছে। ভারতে আমাদের আত্মীয় স্বজনের জন্যে দুর্ভাবনা হতে লাগল। ব্রিটেনের ওপর আমাদের ক্রোধ বাড়তেই লাগল। আমাদের ধারণা হল ভারত ত্যাগ করবার

ইংরেজদের কোনো অভিপ্রায় নেই।

ভারতের এই সংকট নিয়ে আমরা উদ্বিগ্নভাবে আলোচনা করতুম এবং আমরা কি করতে পারি সে বিষয়ে চিন্তা করতুম। ভারতের বিপদ আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করলুম। আমরা বুঝলুম যে ইংরেজদের তাড়িয়ে অপর কোনো শক্তি যদি এখন ভারত দখল করে তাহলে তা হবে চরম বিপর্যয়।

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অতিশয় দুর্বল। ভারতীয় নেতারা প্রস্তাব করেছিল যে ভারতরক্ষার ভার এখন তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। জাতীয় বাহিনী গঠন করে তারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে কিন্তু ভারতীয় নেতাদের এই প্রস্তাব ইংরেজ সরকার ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছিল।

ভারত চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন, কে জানে জন সাধারণের ভাগ্যে কি আছে। ব্রিটিশ সরকার তখন বেপরোয়া, তারা স্কর্চড আর্থ বা পোড়া মাটির নীতি অবলম্বন করেছে। কলকারখানা, পুল ডক, খাদ্যের মজুদ ভাণ্ডার তারা ধ্বংস করে দেবে যাতে শত্রু পক্ষ এলে এসব ব্যবহার করতে না পারে। কিছু কিছু ধ্বংস করতে তারা শুরু করেও দিয়েছিল।

তখন আমরা ঠিক করলুম যে এই সংকটজনক অবস্থায় আমাদের কর্তব্য এখানে এমন একটি সেনাবাহিনী গঠন করা, যে বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে। যেকোনো শত্রুর হাত থেকে ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার বা নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং ব্রিটেনের স্থলে আর যদি কেউ দিল্লীর সিংহাসনে বসবার চেষ্টা করে তাদের বাধা দেবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই তো লক্ষ্য ! অতএব আমরা যারা এতদিন এই ফৌজে যোগ দেই নি তাদের কি এখন উচিত নয়এই বাহিনীতে যোগ দেওয়া ? ভারতকে ধরে রাখতে ব্রিটিশ পারবে না কিন্তু তাদের জায়গায় জাপানীরা যাতে রাজা হয়ে না বসে আমাদের দেখা উচিত। মালয় ও বর্মাতে ভারতীয়দের সম্মান ও সম্পত্তি

রক্ষা করবার জন্যে ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যা করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ফৌজে যোগ দেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

আমি দারুণ মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলুম। যাদের সঙ্গে আমি এতদিন যুদ্ধ করেছি আমার এই সব সহচরদের প্রতি আমার আনুগত্য এবং সততা অপরদিকে আমার দেশের প্রতি আমার কর্তব্য।

আমি স্থির করলুম যে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেব। আজাদ হিন্দ ফৌজকে একটি সুসংগঠিত বাহিনীতে পরিণত করতে হবে। ফৌজের প্রতিটি লোককে চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন হলে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

এরপর সেহগল বললেন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে তিনি কোনো অন্যায় করেন নি। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৫ তারিখে তিনি জনৈক ব্রিটিশ কমাণ্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সেই কমাণ্ডার তাঁর শর্ত না মানলে তিনি তাঁর অধীন ৬০০ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতেন।

হরি সিং, দুলিচাঁদ, দরাইয়া সিং এবং ধরম সিংকে হত্যা করার প্ররোচনার অভিযোগের উত্তরে সেহগল বলেন যে যদিও তাদের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আইনানুগ বিচার করে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই আদেশ পালন করা হয় নি। তাদের সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বাহিনীর অন্যান্যদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে সঙ্গত কারণে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রচার করা হয়েছিল মাত্র।

উপসংহারে প্রেমকুমার সেহগল বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যদিও ভারত স্বাধীন করবার মূল লক্ষে পৌছতে পারে নি তাহলেও তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনো অঞ্চলে মালয়ে এবং বর্মার ভারতীয়দের জীবন সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল সকল আক্রমণকারীর হাত থেকে।

ধিলনের বিবৃতি

ক্যাপটেন পি কে সেহগলের বিবৃতি শেষ হবার পর লেফটেনান্ট গুরুবকস সিং ধিলন নাটকীয় ভাবে বিবৃতি আরম্ভ করলেন :—

ডেরাডুনে ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির শেটউড হলে বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা আছে :

The honour, welfare and safety of your country comes first always and every time. The comfort, safety and welfare of the men you command comes next. Your own safety and comfort comes last, always and every time.

তোমার দেশের সম্মান, কল্যাণ ও নিরাপত্তার স্থান সর্বদা ও প্রতি ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে। তারপরই স্থান হল তোমার অধীনস্থ ব্যক্তি-দের আরাম নিরাপত্তা ও কল্যাণ। তোমার নিজের নিরাপত্তা এবং আরাম সর্বদা প্রতি ক্ষেত্রে সর্বশেষে।

এই আদর্শবাণী পাঠ করার পর থেকে আমি আমার দেশ ও আমার অধীনস্ত কর্মীদের প্রতি আমার পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হই। ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে আমি যতদিন অফিসার ছিলুম ততদিন আমি এই আদর্শবাণীদ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছি।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, পূর্ব ভারতের দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর বৃহত্তম নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুরে দ্রুত আত্মসমর্পণ আমাকে বিচলিত করে এবং আমি বুঝতে পারি যে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন দাঁড়াতে পারবে না।

মোহন সিং এক দুরূহ কাজের সম্মুখীন হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এক চরম সংকটের সময়ে ৭৫০০০ অফিসার ও সেপাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এমন চিন্তা মোহন সিং কোনোদিন করে নি। পরাজিত, আশাভঙ্গ হয়েছে এবং মনোবল ভেঙে পড়েছে। এমন এক বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন। সামনে অনেক সমস্যা, বাধাও প্রচুর।

এই সব সৈন্যদের নতুন করে অনুপ্রাণিত করে নতুন করে কাজে লাগাতে হবে। যে সব অফিসারদের ওপর জাপানীদের রোষ আছে, তাদের প্রাণ বাঁচাতে হবে, বেসামরিক ভারতীয়দের জান প্রাণ রক্ষা করতে হবে অথচ জাপানীরা প্রতিটি নতুন কাজ সন্দেহের চোখে দেখছে। এই সংকট মুহূর্তে মাথা উঁচু করে কাজ করা খুবই শক্ত।
ব্রিটেন আমাদের শোষণ করেছে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে আমাদের মানুষকেই কাজে লাগিয়েছে অথচ আমাদের দেশ রক্ষার কোনো দায়িত্ব আমাদের হাতে দেয় নি। আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতুম তাহলে কেউ বোধহয় আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করত না।
তাই মোহন সিং যখন ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠন করছিলেন আমি তখন আশার আলো দেখতে পেলুম। এই রকম একটি জাতীয় বাহিনী গঠিত হলে সেই বাহিনী ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে পারবে এবং পরে জাপানীরা যদি তাদের কথা না রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে পারবে। আপাততঃ এই বাহিনী পূর্ব এশিয়ায় অসামরিক ভায়তীয়দের সেবা করতে পারবে। আমি অনুভব করলুম দেশমাতা আমাকে আহ্বান করছেন। আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি মোহন সিং-এর বাহিনীতে যোগ দিলুম।
আজাদ হিন্দ ফৌজে সৈনিক ভর্তি সম্বন্ধে ধিলন বলেন যে, ফৌজে ভর্তি হওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছাধীন। ভর্তি হবার জন্যে কোনোদিন কারও ওপর চাপ দেওয়া হয় নি।
কেউ কেউ যে বলেছেন যেসব যুদ্ধবন্দী ফৌজে যোগ দিতে রাজি হয় নি তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠান হয়েছিল এ তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কারণ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বলে কিছুই ছিল না, যা ছিল সেটি হল ডিটেনশন ক্যাম্প। ফৌজের আইন ভঙ্গ করে যারা অপরাধ করত তাদের সামরিক বিচার অনুসারে শাস্তি দিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রাখা হত।
ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কোনো ব্যক্তিকে

ফৌজে ফিরিয়ে নেওয়া হত না, সে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় ফিরে আসতে চাইলেও, কারণ তার চারিত্রিক খুঁত আছে।

আমি আমার প্রতি বক্তৃতায় বলেছি, ধিলন বলেন, ফৌজে যোগদান সম্পূর্ণভাবে নিজ ইচ্ছাধীন। কারও ওপর জোর করা হবে না এমন কি আমরা ফ্রণ্টে যাবার পূর্বেও ফৌজকে বলেছি যে আমাদের এই অভিযানে আমাদের মৃত্যু অবধারিত কারণ আমাদের শত্রু সামরিক শক্তিতে আমাদের চেয়ে বলীয়ান। এছাড়া আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। যদি কেউ ইচ্ছা করে তারা ফিরে যেতে পারে। বস্তুতঃ একবার তুশো লোককে আমি মিনজিয়ান থেকে রেঙ্গুনে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

ব্রিগেড কমাণ্ডার হিসেবে আমি নিজেই অনেক সময় তৃষ্ণার জল পাই নি, আহার পাই নি। আমারই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ফৌজের সাধারণ সৈনিকের কি অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় তবুও তারা ফৌজ ত্যাগ করে নি। কাউকে জোর করে ভর্তি করা হয়ে থাকলে সে প্রতিবাদ তো জানাতই, ফৌজ ত্যাগ করেও চলে যেত।

ফৌজ থেকে দলত্যাগকারী যে চারজনকে হত্যা করার অভিযোগ আমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে সামরিক আইন অনুসারে আমারই আদেশে তাদের বিচার করা হয়েছিল কিন্তু যেদিন তাদের গুলি করা হবে বলে বলা হয়েছে সেদিন আমি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলুম তাছাড়া লোকগুলিকে গুলি করাই হয় নি। ডিভিসনাল কমাণ্ডার তাদের ক্ষমা করেছিলেন।

উপসংহারে ধিলন বলেন যে কোর্ট মার্শাল দ্বারা তাঁর বিচার করবার অধিকার কোনো আদালতের নেই। দেশের মুক্তির জন্য আইন-সঙ্গত ভাবে গঠিত সরকারের ফৌজে তিনি যুদ্ধ করেছেন।

ধিলন আরও বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকার সময় তিনি যেসব কাজ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতের শহরে বেসামরিক এলাকায় বোমা ফেলা থেকে জাপনীদের নিরস্ত করা।

জাপানীরা কিছু ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বা কঠোর সাজা দিয়েছিল। তাদের আমি মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলুম এছাড়া ভারতীয়-দের আমরা নানাভাবে সাহায্য করেছি যার ফলে ভারতীয়েরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আজাদ হিন্দ সরকারকে কোটি কোটি টাকা দান করেছে।

তিনজন আসামী, শাহ নওয়াজ খান, প্রেমকুমার সেহগল এবং গুরুবকস সিং ধিলনের বিবৃতি শেষ হল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনসাধারণ জানতে পারল আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের ভূমিকা, সরকার ও ফৌজ যে জাপানীদের হাতের পুতুল ছিল না তাও দেশবাসী ক্রমশঃ জানতে পারল।

প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য

৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখ থেকে প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হতে আরম্ভ হল। প্রতিবাদী পক্ষ যদিও ৭০জন সাক্ষী হাজির করেছিল কিন্তু তারা পরীক্ষা করল মাত্র ১১ জনকে কারণ প্রতিবাদীপক্ষের কৌসুলী বললেন যে তাদের বক্তব্য ফরিয়াদি পক্ষের সাক্ষীরাই বলেছেন যার ফলে তাঁদের কাজ সহজ হয়ে গেছে।

অভিযোগকারীদের কৌসুলী চেষ্টা করলেন আজাদ হিন্দ সরকারকে এবং ফৌজকে জাপানীদের আজ্ঞাবাহী পুতুল প্রতিষ্ঠান প্রমাণিত করতে। কিন্তু সাক্ষ্যদ্বারা প্রতিবাদী পক্ষ প্রমাণ করলেন যে এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজ ছিল জাপানী প্রভাবমুক্ত স্বয়ং-শাসিত ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। কেবল সামরিক কৌশল রচনাতেই জাপানী অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করা হত।

প্রথমত সাক্ষী জাপান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রকের মিঃ সাবুরো ওতা স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এই সরকারের স্বীকৃতি হিসেবে জাপানের ইমপিরিয়েল গভর্নমেণ্ট কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ হাচিয়াকে

প্রেরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী মিঃ সুনিচি সাতাসুমুতো তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে জাপানের যুদ্ধকালীন লক্ষ্যই ছিল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া।

তৃতীয় সাক্ষী জাপানের বৈদেশিক ব্যাপারের একজন উপ-মন্ত্রী মিঃ রেনজো সাওয়াদা বললেন যে জাপান সরকারের কূটনীতিক প্রতিনিধির তখনও উপযুক্ত পরিচয় পত্র না থাকায় সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চান নি।

চতুর্থ সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং মিঃ হাচিয়া। মিঃ রেনজো সাওয়াদার সাক্ষ্য তিনি সমর্থন করেন।

এরপর সাক্ষ্য দেন মেজর জেনারেল তাদাশি কাতাকুরা। ইমফলের সমর কৌশল তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি বলেন যে স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে আলোচনা করা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। দুটি ঘোষণার তিনি উল্লেখ করেন। একটি হল আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা এবং অপরটি জাপান সরকারের। ঘোষণা দুটি দ্বারা বলা হয়েছিল জাপানীরা যুদ্ধ করছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, ভারতের বিরুদ্ধে নয় এবং আই এন এ যুদ্ধ করছে ভারতের মুক্তির জন্য। এই যুদ্ধে জাপানীরা যেসব ভূখণ্ড, অস্ত্রশস্ত্র এবং সামগ্রী দখল করবে সেসবই আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরও বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইমফলে নিজেরাই যুদ্ধ করেছিল এবং প্রায় তিন ডিভিসন সশস্ত্র সৈন্যসহ ভারতে প্রবেশ করেছিল।

কাতাকুরা আরও বলেন যে আই এন এ এবং জাপানীরা পরস্পরকে স্যালুট করতেন। রেডিও মারফত যেসব অনুষ্ঠান বা বক্তৃতা প্রচারিত হত সেগুলির ওপর জাপানের কোনোই হাত ছিল না।

হুকুমত-এ-আজাদ হিন্দ-এর কয়েকজন মন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ অফিসার সাক্ষ্য দেন। প্রথম সাক্ষী হলেন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী এস এ আয়ার।

শ্রীআয়ার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে ২১ অক্টোবর ১৯৭৩ তারিখে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর ২৫ অকটোবর তারিখে সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সম্মুখে ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমাবেশেও এক বিরাট জনতার প্রতি উদ্দেশ করে নেতাজী ঘোষণা করেন যে গত রাত্রি বারোটা পনেরো মিনিটের সময় মন্ত্রী পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠকে সর্বসম্মতি ক্রমে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।
শ্রীআয়ার আরও বলেন যে হুকুমতেব নিজস্ব চারটি বেতার কেন্দ্র ছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগ মারফত পূর্ব এশিযার ভারতীয়দের নিকট থেকে হুকুমত চাঁদা তুলত এবং প্রাপ্ত অর্থ আজাদ হিন্দ ব্যাংকে জমা দেওয়া হত।
শ্রীআয়ার তিনটি ঘটনার উল্লেখ কবেন যেখানে জাপানীরা নাক গলাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু নেতাজী জাপানীদের কথায় কর্ণপাত করেন নি।
শ্রীআয়ারের পর সাক্ষ্য দেন আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী আই এন এ মেডিক্যাল সারভিসের ডিরেক্টর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের কমিশনার লেঃ কর্নেল এ ডি লোগনাথন। ১৯৪৪ এর ফেব্রুয়ারীর পর থেকে তিনি এই দুটি দ্বীপের প্রশাসনিক কাজের বিবরণী পেশ করেন। দ্বীপ দুটির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয় শহীদ (আন্দামান) এবং স্বরাজ (নিকোবর)। কত শত রাজবন্দী এই দ্বীপে ব্রিটিশ কারাগাবে আবদ্ধ ছিল তাদেরই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নতুন নামকরণ। দেশকে ভালবাসার অপরাধে তাদের এই দুই দ্বীপে বন্দী করে রাখা হত।
প্রসিকিউশন কাউনসেল প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে বস্তুতঃ দ্বীপ দুটি জাপানীরা আজাদ হিন্দ সরকারকে দেয় নি এবং প্রশাসনিক ভারও আজাদ হিন্দ সরকারকে ন্যস্ত করা হয় নি কিন্তু কাউনসেল তা প্রমাণ করতে পারেন নি।

রেঙ্গুনের একজন বড় কাষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং আজাদ হিন্দ ব্যাংকের অন্যতম ডিরেকটর শ্রীদীননাথ আজাদ হিন্দ ব্যাংকের কাজ কর্মের বিবরণ দেন এবং বলেন যেকোনো ব্যাংকের মতোই এই ব্যাংক কাজ করত। আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে এই ব্যাংকের যোগাযোগেরও তিনি বিবরণ দেন। তিনি আরও বলেন যে আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থ মন্ত্রীর নামে ব্যাংকে সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং আই এন এ-র নামে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা ছিল। সাক্ষী আরও বলেন যে নেতাজী ফাণ্ড কমিটির মেম্বার রূপে তিনি জানেন যে ১৯৪৪-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৫-এর এপ্রিলের মধ্যে ফাণ্ডে ৪৫ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। ব্যাংক যখন সীল করে দেওয়া হয় তখন ব্যাংকে ৩৫ লক্ষ টাকা ছিল।

জিয়াওয়াদি এস্টেট সম্বন্ধে শ্রীদীননাথ বলেন যে সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক আবেদনে সাড়া দিয়ে উক্ত এস্টেটের মালিক ঐ এস্টেট আজাদ হিন্দ সরকারকে দান করেন। আজাদ হিন্দ সরকার এস্টেটের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে এস্টেটভুক্ত কারখানাগুলি চালাতে থাকেন এবং সমুদয় আয় সরকারভুক্ত করা হত।

প্রতিবাদী পক্ষের নবম সাক্ষী শ্রী শিব সিং আজাদ হিন্দ দল সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন আজাদ হিন্দ দলের কাজ ছিল মুক্ত অঞ্চলের শাসন ভার গ্রহণ করা এবং দলের অফিস ছিল জিয়াওয়াদিতে। মুক্ত অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত গভর্নর কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি এই অফিসেই বসতেন।

পরের সাক্ষী ছিলেন ক্যাপটেন আর এম ইরসাদ। আজাদ হিন্দ বাহিনী কি ভাবে গঠিত হল এবং পরিচালিত হত সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন। আত্মসমর্পণের আগে ও পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থানের তিনি বিশদ বিবরণ পেশ করেন এবং বলেন যে জাপানীরা যখন রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যায় তখন রেঙ্গুনে অরাজকতা চলছে, কোন পুলিস নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন শহরের দায়িত্ব নিয়ে শহরে শৃংখলা ফিরিয়ে আনে, জনসাধারণের মান সম্মান ও ধন সম্পত্তি

রক্ষা করে। ব্রিগেডিয়ার লডার রেঙ্গুনে এসে কিভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের ভার গ্রহণ করে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন।

ভারত সরকারের কমনওয়েলথ রিলেশনস ডিপার্টমেন্টের শ্রী বি- এন নন্দকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে প্রতিবাদী পক্ষ তলব করেন। সরকার পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যা স্বীকার করিয়ে নেওয়াই ছিল প্রতিবাদী পক্ষের উদ্দেশ্য। শ্রী নন্দ তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যুদ্ধের সময় বর্মায় ভারতীয় ছিল ১০, ১৭, ৮২৫ জন, মালয়ে প্রায় আট লক্ষ ভারতীয় ছিল, তাইল্যাণ্ডে ছিল ৬৫,০০০ জন, ইন্দোচীনে ৬০০০ জন, হংকং-এ ৪৭৪৫ জন, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজে প্রায় ২৭,০০০ এবং জাপানে মাত্র ৩০০ জন।

ভুলাভাই দেশাইয়ের সওয়াল

সাক্ষ্য পর্ব শেষ হল। এবার শুরু হবে উভয় পক্ষের সওয়াল। ১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখে প্রতিবাদী পক্ষের মুখ্য কৌঁসুলী ভুলাভাই দেশাই তাঁর ঐতিহাসিক সওয়াল আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন পরদিন। বলতে গেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারেব নায়ক হলেন ভুলাভাই দেশাই।

কোর্টকে শ্রী দেশাই বলেন যে আসামীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ আনা হলেও মূলতঃ অভিযোগ একটাই এবং সেটি হল ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হওয়া। আসমীদের বিরুদ্ধে হত্যার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। যে চারজন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের বিচার করা হয়েছে এবং দণ্ড দেওয়াও হয়েছিল কিন্তু ঐ পর্যন্তই তবে এসবই প্রথম অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীদেশাই বলেন যে সমগ্র মামলাটি ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারের বিচার নয়। আসামীরা বিধিবদ্ধভাবে গঠিত একটি সামরিক বাহিনীভুক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে অতএব এটি একটি ব্যক্তিগত মামলা নয়।

অভিযোগ আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সম্মানও এই বিচারের সঙ্গে জড়িত।

তিনি বলেন যে প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিবরণীর ভেতর তাঁকে যেন প্রবেশ করতে না বলা হয়। সাক্ষ্যের বিবরণীর পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ২৫০ এবং একজিবিট হল ১৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী! অবশ্য প্রয়োজন হলে বা আদালত আদেশ করলে তাঁকে তা পালন করতে হবে।

প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে শ্রীদেশাই নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর তালিকা পেশ করেন :—

১ ॥ ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে জাপান কর্তৃক ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

২ ॥ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ তারিখে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ।

৩ ॥ ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখে ফেরার পার্কের মিটিং-এ ভারতীয় সৈন্যদের জাপানীদের হাতে সমর্পণ।

৪ ॥ ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত এবং ক্যাপটেন মোহন সিং গ্রেফতার হওয়ার ফলে ডিসেম্বর মাসে প্রথম আই এন এ ভেঙে যায়।

৫ ॥ ২ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর আগমন। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনি ভার গ্রহণ করেন। পরে গ্রেটার ইস্ট এশিয়ার একটি কনফারেন্স হয়। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লিগের প্রতিনিধিরা এই কনফারেন্সে যোগ দেন।

৬ ॥ ২১ অকটোবর ১৯৪৩ তারিখে প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট অফ ফ্রি ইণ্ডিয়া অর্থাৎ সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। এই সরকার ঘোষিত হওয়ার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অধীনে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেন।

৭ ॥ উক্ত সরকার কর্তৃক ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

আজাদ হিন্দ ফৌজ এরপর থেকে নবগঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের নির্দেশ মেনে চলত।

৮॥ তারপর আজাদ হিন্দ সরকার রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হল, আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় রাষ্ট্র কোহিমায় প্রবেশ করল এবং তারপর পশ্চাদপসরণ করে রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন এবং এবার জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের শহরে শৃংখলা রক্ষা ও তারপর ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক রেঙ্গুন দখল ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়।

শ্রীদেশাই বলেন যে অ্যাডভোকেট জেনারেল কর্তৃক সাক্ষীদের জেরা করার ফলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সামরিক আজাদ হিন্দ সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যথারীতি তার ঘোষণাও করা হয়েছিল। ঘোষণাপত্র পাঠ করে তিনি বলেন যে এই সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে মুক্ত করা এবং বর্মা ও মালয়ে ভারতীয়দের রক্ষা করা তবে ভারতকে এই সরকার মুক্ত করতে পারে নি। তাতে কিছু যায় আসে না। সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর তবে কোর্টও অবগত হয়েছেন যে এই সরকার বিধিবদ্ধভাবে গঠিত। এই সরকারের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডেপেণ্ডেন্স লীগও আইনানুগ ভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৪-এর জুন মাসে শুধু মাত্র মালয়ে দু'লক্ষ তিরিশ হাজার ভারতীয় আজাদ হিন্দ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেছিল।

প্রতিবাদী পক্ষ বলেছেন যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যেসব রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করেছিল তারা সব জাপানের অধীন ছিল কিন্তু তার দ্বারা স্বীকৃতি বিফল হয় না। একটা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল এবং সেই রাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার ছিল এবং এই রাষ্ট্রের একটি ফৌজও ছিল। এই ফৌজ পরিচালিত করবার জন্য আইনও গঠিত হয়েছিল। লেঃ নাগ এসব তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন।

শ্রীদেশাই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের উল্লেখ করে বলেন যে

১৯৪৩-এর ৬ নভেম্বর তারিখে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে দ্বীপ দুটি আজাদ হিন্দ সরকারে ভুক্ত হয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হস্তান্তর কাজ সম্পন্ন হয়। হস্তান্তর হবার পর দ্বীপ দুটির নাম পরিবর্তন করে শহীদ ও স্বরাজ রাখা হয়। জিয়াওয়াদি নামেও একটি অঞ্চল মুক্ত হবার পর আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তর করা হয়। জিয়া-ওয়াদির এলাকা ৫০ বর্গ মাইল এবং এখানে ১৫ হাজার ভারতীয় থাকত।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে জাপান সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয় যে জাপানীরা কোনো অংশ দখল করলে তা আজাদ হিন্দ সরকারকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তা আজাদ হিন্দ সরকার শাসন করবে। এইভাবে মনিপুর ও বিষেণপুর যার পরিমাণ দেড় হাজার বর্গমাইল তা আজাদ হিন্দ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীদেশাই বলেন যে এই সরকারের সংবিধান ছিল, ব্যাংক ছিল এমন কি প্রচলিত ডাকটিকিটও ছিল। এসবেরই প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা ও যুদ্ধ করবার আইনসম্মত অধিকার ছিল।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পরাধীন জাতিরও যুদ্ধ করবার অধিকার আছে এবং এজন্য দুই দেশের সামরিক বাহিনীর অফি-সারদের জবাবদিহি করবার প্রয়োজন নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজ আইনসম্মতভাবে গঠিত এবং এই ফৌজ সভ্য জগতের আইন মেনে চলত।

বিচারাধীন এই তিনজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে নি বা গুলি চালায় নি। তাই যদি হয় তাহলে অপর পক্ষ কোন অধিকারে যুদ্ধ চালিয়েছে? গুলি ছুঁড়েছে? অন্য সময় এই কাজ হত্যা বিবেচিত হতে পারে কিন্তু যুদ্ধের সময় দেশের স্বার্থে কাজ করতে হয়। নইলে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা কি?

শ্রীদেশাই বলেন যে অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে আসামীরা রীতিমতো যুদ্ধ করেছিল।

আমিও তো তাই বলতে চাই এবং আমি তা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি।

শ্রীদেশাই তাঁর সমর্থনে কিছু নজির উল্লেখ করেন এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ করেন। ১৯১৮ সালে গ্রেট ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্স এবং ইউ এস এ, চেকদের যুদ্ধরত জাতি বলে বিবেচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পোলিশ ন্যাশানাল আরমিরও উল্লেখ করেন।

শ্রীদেশাই বলেন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভিত্তিতে আসামীরা বিদেশে একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন এবং যুদ্ধও করেছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার হাজার হাজার নরনারীর সমর্থন ছিল এই সরকার ও বাহিনীর প্রতি। আদালতকে তিনি মনে করিয়ে দেন যে আসামীরা তাদের দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছিল কিন্তু আদালত তাদের বিচার করতে চাইছেন সাধারণ খুনীর মতো। আসামীরা সফলকাম হলে এই আদালতের অস্তিত্বের কোনো প্রশ্ন উঠত না।

ব্রিটিশ বাহিনী ও আজাদ হিন্দ বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল অতএব পেনাল কোডের ধারা অনুসারে তাদের বিচার করা চলে না। আসামীদের কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল না।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল-এর হাউস অফ কমনস-এ প্রদত্ত বক্তৃতা উল্লেখ করে শ্রীদেশাই বলেন যে বিদ্রোহ হল যুদ্ধের একটি অস্ত্র এবং বিদ্রোহীদের দেখা মাত্রই গুলি করা চলে না।

শ্রীদেশাই বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরা যদি ব্রিটিশ সৈনিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে থাকে তাহলে ব্রিটিশ সৈনিকেরাও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের প্রতি গুলি ছুঁড়েছিল। এখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য কাজ করেছে। কোনো পক্ষের দোষ নেই।

শ্রীদেশাই বলেন যে আজাদ হিন্দ সরকার দেশবিহীন ছিল না,

তারা দেশ জয় করেছিল বা তাদের দেশ দেওয়া হয়েছিল অতএব তারা যে যুদ্ধরত ছিল এ কথা না বললেও চলে। ইতিহাসে উদাহরণ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়মের এক ইঞ্চিও ভূমি ছিল না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তাদের এই অবস্থা। বেলজিয়ম এবং অনেক দেশ তখন রাজ্য ছাড়িয়ে লণ্ডনে দেশান্তরী হয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আই এন এ ছিল মুক্তিফৌজ। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তারা যুদ্ধ করেছিল কারণ তাদের যুদ্ধ করবার অধিকার আছে। আমরা বেলজিয়ান নই এবং ভারতীয় বলেই যে আমাদের এই অধিকার নেই সে কথা কি বলা চলে?

শ্রীদেশাই আরও একটা উদাহরণ দেন। ফ্রান্সে মার্শাল পেতঁ্যার অধীনে যে সরকার ছিল সে সরকার জার্মানির মিত্র অথচ ফ্রেঞ্চ মার-কুইস নামে সরকার তাদের বিরোধিতা করত এবং জেনারেল আই-সেনহাওয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে ফ্রেঞ্চ মারকুইস তাঁর অধীনস্ত একটি যুদ্ধরত দল এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিহিংসা গ্রহণ করলে তা শত্রুতা বলে বিবেচিত হবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলা আরও জোরালো এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি বিধান করলে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করা হবে। এরপর তিনি বলেন যে বিলাতে হাউস অফ কমনস-এ মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন বলেছেন সরকারী নীতি হল এই যে কোনো ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তার বিচার করা হবে না এবং ভারত সরকার এই বিবৃতি উল্লেখ করে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেছেন। কারণ ব্রিটিশ সরকার বুঝেছেন যে এই প্রকার অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না।

একটা আনুগত্যের প্রশ্ন আছে। কিন্তু কার প্রতি আনুগত্য? সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জাপানীদের হাতে সমর্পণ করলেন এবং জাপানীরা মোহন সিং-এর হাতে। তখন স্বতঃই রাজার প্রতি আর আনুগত্য রইল না। আনুগত্য তখন দেশের

প্রতি। আমরা যুদ্ধ করি দেশের স্বাধীনতার জন্য অতএব সে ক্ষেত্রে আমাদের আনুগত্য স্বভাবতই দেশের প্রতি হবে ইংলণ্ডের রাজার প্রতি নয় কারণ আমরা ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারি না।
আরও বলা হয়েছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ বা সরকার ছিল জাপানী-দের আজ্ঞাবাহী পুতুল মাত্র। এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের মিত্ররূপে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিল। উভয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন করা।
ফ্রান্সকে মুক্ত করার জন্যে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে ফ্রি ফ্রেঞ্চ আর্মি যুদ্ধ করেছিলেন তার মানে এই নয় যে ফ্রি ফ্রেঞ্চ আর্মি ব্রিটেন ও আমেরিকার আজ্ঞাবাহী পুতুল ছিল।
সুখের বিষয় যে লেফটেনাণ্ট নাগের সাক্ষ্য আমার যুক্তি প্রমাণ করেছে। অ্যাডভোকেট জেনারেল লেঃ নাগকে দিয়ে প্রমাণ করাবার চেষ্টা করেছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি রীতিমতো বাহিনী ছিল। আমার কাজ সিদ্ধ হয়েছে, মন্তব্য করেন শ্রীদেশাই।
উপসংহারে তিনি বলেন যে আসামীদের বিচারের কোনো কথা ওঠে না এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রযোজ্য নয়।
অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি এঞ্জিনিয়ার প্রত্যেকটি অভি-যোগের জন্য আসামীদের শাস্তি দাবি করেন কিন্তু বলেন যে আসামীরা বিপথে চালিত হলেও তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অপরাধ করেছে এজন্যে সম্ভব হলে তাদের দণ্ড হ্রাস করা যেতে পারে। বর্তমান আসামীদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের নজির উঠতে পারে না।
৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখে জেনারেল কোর্ট মার্শাল রায় দিলেন। ধিলন এবং সেহগলকে হত্যার প্ররোচনা থেকে মুক্তি দেওয়া হল, শাহ নওয়াজকে হত্যার প্ররোচনার জন্য অভিযুক্ত করা হল। তবে তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী এজন্য তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করা হল তবে শাহ নওয়াজকে পৃথক কোনো শাস্তি দেওয়া হল না। তাদের প্রাপ্য সমস্ত বেতন ও ভাতা

বাজেয়াপ্ত করা হল।

কোর্ট মার্শালের রায় কমাণ্ডার-ইন চিফ অনুমোদন না করলে দণ্ড কার্যকরী করা যায় না। ভারতের কামাণ্ডার ইন চিফ তখন স্যার ক্লড অকিনলেক (শোনা যায় আসল উচ্চারণ নাকি আক্লেক)।

৩ জানুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে প্রধান সেনাপতি আসামী তিনজনকে মুক্তি দিলেন।

মুক্তি না দিয়ে বোধহয় উপায় ছিল না। জনমত তখন প্রবল। শাহ নওয়াজ, ধিলন ও সেহগলের একটি কেশ স্পর্শ করলে তখন ভারতে বোধহয় একটি ইংরেজকেও জীবিত রাখা সম্ভব হত না। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও দ্বিধাবিভক্ত, তাদের আর সংযত করে রাখা যেত না।

মুক্তি প্রাপ্ত এই তিন বীর সারা দেশে সেদিন যে সম্বর্ধনা পেয়েছিল তা অভূতপূর্ব। উত্তাল অভ্যর্থনায় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের এমন বন্যা ভারতে আর দেখা যায় নি।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজে লাল কেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলতে পারে নি কিন্তু এর পরে যারা পতাকা তুলেছিল তাদের কাজ দ্রুততর করে দিয়েছিল।

লাল কেল্লায় একটি তাঁবুতে বসে ভুলাভাই কাগজপত্রের স্তূপ আর পাহাড় প্রমাণ আইন বইয়ের মধ্যে ডুবে পথ খুঁজতে খুঁজতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিখুঁত সংগঠন প্রতিভা, রাজনীতি ও আইন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর কাজ অনেকটা সহজ করে রেখে গিয়েছিলেন।

ফ্লোরা ফাউন্টেন রোড দিয়ে গাড়িখানা সবেগে ছুটে শেতলবাদ রোডে ঢুকে বম্বের বিখ্যাত সেই বিলাসবহুল প্রাসাদ 'জীবন-জ্যোতি'র সামনে থামল।

গাড়িতে একজনই আরোহী ছিল এবং সে-ই গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নামল ছ'ফুট দীর্ঘ সুদর্শন এক পুরুষ এবং জীবন-জ্যোতির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

পুরুষটি এই বাড়িতে আগেও দু'একবার এসেছে, অতএব সবই তার পরিচিত।

তারিখটা ছিল ১৯৫৯ সালের ২৭ এপ্রিল। বিকেল এবং গরম। একটুও হাওয়া নেই। গাছের পাতা নড়ছে না। আরব সাগরও যেন নিস্তরঙ্গ পুষ্করিনীর মতো ঝিমিয়ে পড়েছে।

ছ'ফুট দীর্ঘ সেই সুদর্শন পুরুষ একটি ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার পাশে কলিংবেলের বোতাম টিপল। একজন ভৃত্য দরজা খুলে দিতেই তাকে পাশ কাটিয়ে সেই পুরুষ ভেতরে ঢুকে গেল।

গ্রাম···! গ্রাম···!! গ্রাম···!!!

পর পর তিনটে গুলির আওয়াজ। কি ব্যাপার? কোথায়? কার বাড়িতে?

জীবন-জ্যোতির আবাসিক ও পল্লীবাসীরা সচকিত হয়ে উঠল। বাড়ির সামনে কৌতূহলী কয়েকজন জমায়েত হল। তারা কিছু বোঝবার বা জানবার আগেই ফন রঙের শার্ট ও ঘোর রঙের ট্রাউজার পরিহিত ব্যক্তিটি হাতে রিভালভার নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

চৌকিদার তাকে থামাবার চেষ্টা করল কিন্তু রিভলভার দেখে পেছিয়ে গেল। লোকটি বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

কেউকেউ, পুলিস! পুলিস! বলে চিৎকার করল। কিন্তু কোথায় পুলিস?

ঐ সময়ে ওখানে কোন পুলিস মোতায়েন থাকবার কথা নয়।'

তোমাদের আর পুলিস ডাকতে হবে না, আমিই পুলিসের কাছে যাচ্ছি, বলতে বলতে লোকটি গাড়ি চালিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল।

গভর্নমেণ্ট হাউস লোয়ার গেটের কাছে একজন কনস্টেবল ডিউটি দিচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে লোকটি তাকে বলল : আমাকে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে চল।

কনস্টেবল বলল সে তার ডিউটি ছেড়ে যেতে পারবে না, তবে সাহেব গামদেবী থানায় যেতে পারেন।

সাহেবের মন তখন খুব চঞ্চল। গামদেবী থানা কোন দিকে সে চেনে না এবং থানায় যাবে কি না ঠিক করতে পারল না।

এই রকম একটা ঘটনা যে সত্যিই ঘটে যাবে লোকটি তা বুঝতে পারে নি। এই তো ঘণ্টাখানেক আগে সে তার স্ত্রী ও তিনটি বাচ্চাকে মেট্রো সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে এসেছে। তখনও জানে না সে কি করতে যাচ্ছে।

এই লোকটিরই নাম কমাণ্ডার কাভাস মানেকশ নানাবতি। বয়স ৩৭। ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন দক্ষ অফিসার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমুদ্রে কৃতিত্বের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছে। স্বয়ং লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন তাঁর সুখ্যাতি করেছেন এবং ভারতের প্রথম এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারই হাতে দেওয়া হয়েছিল।

মন স্থির করতে না পেরে নানাবতি তার এক সহকর্মী ও বন্ধু কমাণ্ডার মাইকেল বেঞ্জামিন স্যামুয়েল-এর অফিসে গেল।

কমাণ্ডার স্যামুয়েল আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন নিউ কুইনস রোডে "মুনলাইট" অফিস বাড়ির একতলায় জানালার ধারে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় দেখলুম নানাবতি আসছে। তাকে দেখে মনে হল একটা কিছু ঘটেছে এবং তা সাংঘাতিক।

সত্যিই তাই। আমাকে দেখতে পেয়ে জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে সে বলল : কি করে কি হয়ে গেল আমি বলতে পারি না তবে আমি

বোধ হয় একজন লোককে মেরে ফেলেছি।

কমাণ্ডার স্যামুয়েল বিস্মিত হয়ে বললেন :

—সে কি! কি হয়েছিল?

—লোকটা আমার স্ত্রীকে ফুসলে নেবার মতলবে ছিল।

—রিভলভার দিয়ে গুলি করেছ? রিভলভারটা কোথায়?

—গাড়িতেই আছে।

—এস এস, ভেতরে এসে বেসো, আগে খোলসা করে সব বল।

—না থ্যাঙ্ক ইউ, কোথায় যাব বলতে পার? কোন থানায় বা কোন অফিসারের কাছে?

কমাণ্ডার স্যামুয়েল তখন নানাবতিকে বললেন সি আই ডি অফিসে ডেপুটি কমিশনার জন লোবোর সঙ্গে দেখা করতে। ইতিমধ্যে তিনি লোবোকে ফোন করে দেবেন।

কিছুদূর গিয়ে আবার নানাবতি ফিরে এসে একটা চাবির গুচ্ছ স্যামুয়েলের হাতে দিয়ে অনুরোধ করল : তার স্ত্রী সিলিভিয়া আর বাচ্চারা এখন মেট্রোতে সিনেমা দেখছে। সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে সিনেমা শেষ হবে। স্যামুয়েল যেন চাবিটা সিলভিয়াকে দিয়ে দেয়।

স্যামুয়েল অবিশ্যি লোবোকে ফোন করে দিয়েছিল কিন্তু সিলভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় সি আই ডি থেকে লোক এসে চাবির গুচ্ছটি নিয়ে যায়।

স্যামুয়েলের ফোন পেয়েই লোবো সুপারিণ্টেনডেণ্ট ফোর্ড আর ইনস্পেক্টর মোকেশকে প্রস্তুত থাকতে বলল। ইতিমধ্যে নানাবতি পৌঁছে গেল এবং একটি বিবৃতি দিল। বাকি তিনটি বুলেট-সমেত রিভলভারটি লোবো আটক করল এবং নানাবতিকে থানায় রাখা হল।

দক্ষ পুলিস অফিসারেরা তদন্ত কাজ শেষ করার পর ঘটনা পরম্পরা ও কিছু সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩২০ ধারা অনুসারে হত্যার অভিযোগে নানাবতিকে অভিযুক্ত

করা হয়।

কিন্তু সেদিন সেই ২৭ এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে নিহত প্রেম আহুজার ঘরে ঠিক যে কি হয়েছিল সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে নি। পারত প্রেম আহুজা কিন্তু সে মৃত এবং পারত নানাবতি কিন্তু সে ঘটনার একাধিক বিবরণী দিয়েছিল।

১৫ জুন তারিখে অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম নসরুল্লার এজলাসে বম্বে সেশন কোর্টে নানাবতির কেস ওঠে। বিচার চলার সময়ে জেলখানায় আটক না রেখে নানাবতিকে উপকূলে অবস্থিত আই এন এস কুঞ্জালি জাহাজে নৌবাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

নিয়ম আছে যে প্রতিরক্ষাবাহিনীর কোন কর্মচারী জেলখানায় আটক থাকলে তিনি প্রতিরক্ষা বিভাগে আর চাকরী করতে পারেন না। ভারত সরকারের দক্ষ অফিসারের তখন একান্ত প্রয়োজন, তাই নানাবতির অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর বলেন ঃ

ইংলণ্ডে ১৯৪৯ সালে পোর্টসমাউথে এক রেজিস্ট্রী অফিসে ইংরেজ যুবতী সিলভিয়ার সঙ্গে নানাবতির বিয়ে হয়। তিনটি সন্তান হয়েছিল, তাদের বয়স যথাক্রমে সাড়ে নয়, সাড়ে পাঁচ এবং তিন বছর। বম্বেতে ফিরে দম্পতি কোলাবায় বাস করতে থাকে।

নেভাল অফিসার হিসাবে নানাবতিকে সরকারী কাজে প্রায়ই দীর্ঘদিনের জন্যে সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করতে হত। ১৯৫৮ সালে নানাবতিকে প্রায় ৬ মাস বাইরে থাকতে হয়।

পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ ত্রিবেদী বলেন যে নিহত ব্যক্তি প্রেম আহুজার সঙ্গে নানাবতি দম্পতির পরিচয় করিয়ে দেন লেফটেনান্ট কমাণ্ডার যাজ্ঞিক। প্রেম আহুজার দিদি ম্যামির সঙ্গে সিলভিয়ার বন্ধুত্ব হয় এবং নানাবতি যখন বাইরে থাকত সেই সময়ে সিলভিয়া মাঝে মাঝে আহুজাদের ফ্ল্যাটে যাতায়াত করত।

প্রেম আহুজা সুদর্শন ধনী ও সুরসিক। পেডার রোডে তার

মোটর গাড়ির ব্যবসা ছিল। নারীমহলে প্রেম আহুজা খুব জনপ্রিয় ছিল। প্রেম অবিবাহিত ছিল বলেই প্রকাশ এবং সে বিবাহকে এড়িয়েই চলত।

সে আর তার দিদি ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভে 'শ্রেয়স' নামে বাড়িতে ভাড়া ছিল, তারপর তারা মালাবার হিলে জীবন-জ্যোতি বাড়িতে উঠে আসে। তিনতলার একটি ফ্ল্যাটে তারা থাকত।

মৃত্যুর সময় আহুজার বয়স ৩৪ আর তার দিদির বয়স ৩৮।

আহুজাদের বাড়ি যাতায়াতের ফলে প্রেম আহুজার সঙ্গে সিলভিয়ার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং একথা সিলভিয়াও স্বীকার করেছিল।

ব্যাপারটা নানাবতি সন্দেহ করছিল এবং একটা বোঝাপডা বা ফয়সালার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালের ১৮ এপ্রিল দশ দিনের ছুটি নিয়ে নানাবতি বম্বেতে আসে এবং তার পত্নীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে। স্বামীর প্রতি পত্নীর উত্তাপ আর নেই।

২৭ এপ্রিল তারিখ। তারিখটি স্মরণীয়।

সকালে ব্রেকফাস্টের পর দুজনে তাদের কুকুরের চিকিৎসাব জন্যে রুগ্ন কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে পারেলে এক পশুচিকিৎসকের কাছে যায়। ফেরবার পথে ম্যাটিনি শো-এর জন্যে সিনেমার টিকিট কেনে এবং পথে ক্রফোর্ড মার্কেট থেকে কিছু সবজি কিনে বাড়ি ফেরে।

ব্রেকফাস্টের সময়েই নানাবতি সিলভিয়ার কাছে সোজাসুজি প্রশ্নটা তুলেছিল। আদর করে স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখেই জিজ্ঞাসা করেছিল ; কি হয়েছে তোমার ? সিলভিয়া ?

কিন্তু সিলভিয়া তখন প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। কাঁধ থেকে নানাবতির হাতও সরিয়ে দেয় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে।

লাঞ্চের সময় নানাবতি প্রশ্নটা আবার তোলে এবং গোপন না রেখে জিজ্ঞাসা করে : লোকটা কে ? প্রেম আহুজা ?

সিলভিয়া স্বীকার করে এবং বলে যে স্বামীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। স্বভাবতই নানাবতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তবুও সে ধৈর্য

ধরে পত্নীকে প্রশ্ন করে যে আহুজা যদি তোমাকে বিয়েই করে তাহলে সে কি তোমার সন্তানদের দায়িত্ব নেবে? যত্ন করবে?

এর উত্তর সিলভিয়া জানে না। আহুজা তাকে বিয়ে করবে কিনা তাও সে জানে না, সন্তানদের দায়িত্ব তো পরের কথা।

ক্ষিপ্ত স্বামীকে দেখে সিলভিয়া ভয় পেয়ে যায় এবং নানাবতি যখন বলে যে সে আজই আহুজার কাছে গিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে আসবে তখন সিলভিয়া ভয় পেয়ে যায় এবং স্বামীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে এবং বলে নানাবতিকে দেখলেই আহুজা গুলি করতে পারে।

নানাবতি বলে আহুজা তাকে গুলি করবার আগেই সে নিজেকে গুলি করে মরবে। সে সৈনিক মৃত্যুকে সে ভয় করে না। কিন্তু নিজের সন্তানদের কথা মনে পড়ায় নানাবতি বোধহয় শান্ত হয়।

নানাবতি তখন সিলভিয়াকে বলে যে যা হবার তা হয়ে গেছে, সন্তানদের মুখ চেয়ে আহুজার সঙ্গে সিলভিয়া সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি আছে কিনা। সিলভিয়া কোনো সন্তোষজনক বা স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি।

ওদিকে সিনেমার টিকিট কাটা আছে। সিলভিয়া বলে তাদের নিয়ে সিনেমায় যেতে। নানাবতি রাজি হয় না। বলে তার কাজ আছে তবে সে তাদের সিনেমায় পৌঁছে দেবে। সিলভিয়া, দুটি বাচ্চা এবং প্রতিবেশীদের একটি ছেলেকে নানাবতি মেট্রো সিনেমায় নামিয়ে দিয়ে সোজা তার জাহাজে চলে যায়।

জাহাজের কমাণ্ডারের কাছে নানাবতি গুলিভরা একটা রিভলভার চায়। বলে যে সে মোটরে করে সপরিবারে আওরঙ্গাবাদ যাবে, পথে জঙ্গল পড়বে সেই জন্য রিভলভারটা সঙ্গে রাখতে চায়। ছ'টি গুলি সমেত নানাবতিকে একটি রিভলভার দেওয়া হয়।

লগবুকে স্বাক্ষর দিয়ে নানাবতি রিভলভার নিয়ে চলে আসে।

জাহাজ থেকে গাড়ি চালিয়ে নানাবতি আসে পেডার রোডে ইউনিভারসাল মোটর কোম্পানিতে। প্রেম ভগবান দাস আহুজার

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে।

নানাবতি অফিসে গিয়ে প্রেম আহুজার খোঁজ করে। কিন্তু কম্পানির সেলস ম্যানেজার তানেজা বলে যে মিঃ আহুজা লাঞ্চ করতে বাড়ি গেছেন। এখন তিনি বাড়িতেই আছেন। তখন বেলা সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, চারটে বাজতে চলেছে।

আহুজার ফ্ল্যাটে গিয়ে নানাবতি তার বেডরুমে ঢোকে। আহুজা তখন একটি তোয়ালে পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। তার দিদি ম্যামি নিজের ঘরে ছিল।

চিৎকার গোলমাল ও গুলির আওয়াজ শুনে ভৃত্যরা ও ম্যামি আহুজা ছুটে আসে। তারা রিভলভার হাতে নানাবতিকে দেখতে পায়, কিন্তু নানাবতি রিভলভার দেখিয়ে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নীচে জীবন-জ্যোতির চৌকিদার পুরণ সিং তাকে থামাবার চেষ্টা করে কিন্তু থামাতে পারে নি। নানাবতি নিজের গাড়িতে উঠে চলে যায়।

আহুজা তখন মেঝেতে পড়ে আছে। পা দুটো বাথরুমের ভেতরে মাথাটা বেডরুমে। ম্যামি ছুটে এসে ভাইয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে 'প্রেম' 'প্রেম' বলে দুবার ডাকে। কোনো সাড়া পায়না। তখন কেউ কেউ ধরাধরি করে আহুজাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ওদিকে চৌকিদার পুলিসে খবর দেয়। মিস ম্যামি আহুজা ৩৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী মহিলা। তিনি যেদিন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সেদিন আদালতে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। পুলিসের পক্ষে ভিড় সামলানো মুস্কিল হয়েছিল। ভিড় সামলাতে তারা হিমসিম খাচ্ছিল।

মিস ম্যামি তার সাক্ষ্যে বলে যে দেশ বিভাগের আগে তারা করাচিতে বাস করত, ১৯৪৭ সালের পর তারা তাদের বাবাকে নিয়ে বম্বে চলে আসে। প্রথমে তারা মেরিন ড্রাইভে 'শ্রেয়স' বাড়িতে বাস করত।

তারপর তারা মালাবার হিলে নেপিয়ানসী রোডে 'জীবন-জ্যোতি' বাড়িতে উঠে আসে। নেপিয়ানসী রোডটি বেরিয়েছে নিপিয়ান সি

রোড থেকে।

'শ্রেয়স' বাড়িতে থাকবার সময় মিসেস যাজ্ঞিকের মারফত তাদের ভাইবোনের সঙ্গে কমাণ্ডার নানাবতিদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

ঐ বছরের জানুয়ারি মাসে প্রেম আহুজা দিল্লি গিয়েছিল। পরে ম্যামিও যায়। সেখানে এক কফি হাউসে সিলভিয়ার সঙ্গে ম্যামির দেখা হয়। সিলভিয়া একাই দিল্লি গিয়েছিল।

দিল্লি থেকে সিলভিয়াকে সঙ্গে নিয়ে প্রেম ও ম্যামি তাদের নিজেদের গাড়িতে বম্বে ফেরে। পথে ওরা আগ্রার এক হোটেলে রাত্রি বাস করেছিল।

পরদিন সকালে প্রেম তার দিদিকে বলেছিল যে সিলভিয়া যদি নানাবতির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাহলে সে সিলভিয়াকে বিয়ে করতে পারে।

ম্যামি বলে ঃ মনে রেখো সিলভিয়ার তিনটি বাচ্চা আছে, তাদের ব্যবস্থা কি হবে ?

উত্তরে প্রেম বলে ঃ সেটাও ভাববার বিষয় তবে সিলভিয়া ওর স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারবে না।

এরপর ২৭ এপ্রিলের ঘটনা।

সেদিন সকালে সাড়ে ৯টায় প্রেম অফিসে গিয়েছিল। ম্যামিও বাইরে বেরিয়েছিল। ওরা দুপুরে ফিরে আসে এবং বেলা পৌনে দুটো আন্দাজ সময়ে দুজনে লাঞ্চ খায়। লাঞ্চের পর ভাই বোন যে যার বেডরুমে চলে যায়।

বিকেল তখন সওয়া চারটে। ম্যামি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে পড়েছে। শাড়ি ইস্ত্রি করতে হবে। এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল। বাইরের দরজা খুলতে হলে ম্যামির বেডরুমের দরজা আগে বন্ধ করতে হয়।

হঠাৎ ভাইয়ের ঘরে চিৎকার ও কাঁচ ভাঙার-আওয়াজ শুনে সে ভাইয়ের ঘরের দিকে ছুটে যায়। ভৃত্য অঞ্জনি ও সম্পতও ছুটে আসে।

ভাইয়ের ঘর বন্ধ ছিল। অঞ্জনি দরজা খুলে ফেলে। ঘরে ঢুকে দেখে যে কমাণ্ডার নানাবতি দরজার দিকে এগিয়ে আসছে, তার হাতে রিভলভার।

নানাবতিকে ম্যামি জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার? কিন্তু নানাবতি কি বলেছিল তা সে শুনতে পায় নি। এদিকে ম্যামিও দেখতে পায় তার ভাই প্রেম মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

মিসেস সিলভিয়া নানাবতি আদালতে যেদিন সাক্ষ্য দিলেন সেদিন আদালত ও আদালত প্রাঙ্গণ বোধহয় ফেটে পড়েছিল। এত ভিড় হয়েছিল যে জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিসবাহিনী বেসামাল হয়ে পড়েছিল।

কামাণ্ডার নানাবতির ইংরেজ পত্নী ২৮ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী একখানি শাদা শাড়ী পরে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন। ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে সিলভিয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেও প্রচ্ছন্ন বেদনা সে লুকোতে পারে নি।

অন্যান্য প্রসঙ্গের পর সিলভিয়া বলল যে প্রেম আহুজার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে তিন বছর, তবে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ১৯৫৮ সালের গোড়া থেকে।

আহুজার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা সে ঐ ২৭ তারিখে স্বামীর কাছে স্বীকার করেছিল। আদালতেও সিলভিয়া স্বীকার করেছিল। সে বলেছিল: আই ওয়াজ ইনফ্যাচুয়েটেড উইথ আহুজা। আহুজার প্রতি আমি মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলুম। তবে আহুজার সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমরা পতি-পত্নী সুখেই ছিলুম।

সিলভিয়া বলে যে ঘটনার দিন লাঞ্চের পরে নানাবতি গম্ভীর হয়ে বসেছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বলে যে সে তখনি আহুজার ফ্ল্যাটে গিয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চায়।

আমি ভয় পেয়ে যাই, সিলভিয়া বলে, অনুরোধ করে বলি তুমি যেয়ো না, তোমাকে দেখলে ও গুলি করবে। দিল্লিতে অশোক হোটেলে আমি দেখেছিলাম আহুজার রিভলভার আছে। কিন্তু

নানাবতি বলে : আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি যদি নিজেকে গুলি করি তাতে কি কিছু যায় আসে ?

কিন্তু তুমি কেন নিজেকে গুলি করবে, তোমার তো কোন দোষ নেই।

এরপর নানাবতি কিছু শান্ত হয়। সিলভিয়াকে জিজ্ঞাসা করে আহুজা কি তোমাকে বিয়ে করবে ? কিন্তু সিলভিয়া কোন জবাব দেয় নি কারণ সিলভিয়া বুঝতে পারছিল যে বিয়ে শাদির মধ্যে আহুজা নিজেকে জড়াতে চায় না।

নানাবতি তখন বলে যে সিলভিয়া যদি আহুজার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহলে নানাবতি সিলভিয়ার অপরাধ ভুলে যাবে। সিলভিয়া এরও কোন জবাব দেয়নি। এই প্রশ্নের উত্তরেও সিলভিয়া বলে যে সে তখনও মোহাবিষ্ট।

প্রেম আহুজার সঙ্গে সে একা অনেকবার দেখা করেছে এবং ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে।

আহুজার মৃত্যুর পর সিলভিয়া তার স্বামীর পরিবারে বাস করেছে এবং বিচারাধীন স্বামীর সঙ্গে অনেকবার দেখা সাক্ষাতও হয়েছে। ছেলেদেরও সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

কমাণ্ডার স্যামুয়েল এবং ডেপুটি কমিশনার লোবোর কাছে নানাবতি আচ্ছন্ন অবস্থায় বলেছিল যে সে বোধ হয় একজন মানুষকে হত্যা করেছে কিন্তু আদালতে বলে যে আহুজার সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়েছিল এবং এক দুর্ঘটনাক্রমে হঠাৎ রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আহুজার মৃত্যু হয়।

নানাবতি বলে যে ইচ্ছে করলে তো আমি আহুজার দেহে পর পর ছ'টা গুলিই বর্ষণ করতে পারতুম।

নানাবতি নাকি ঘরে ঢুকেই আহুজাকে 'ফিলদি সোয়াইন' বলে সম্বোধন করে এবং এই সময় নানাবতি নাকি অস্ত্রটি একটি ক্যাবিনেটের ওপর রেখেছিল।

নানাবতি জিজ্ঞাসা করে : তুমি কি সিলভিয়াকে বিয়ে করবে ?

উত্তরে আহুজা নাকি বলে : যে মেয়ের সঙ্গে আমি ঘুমোব তাকেই বিয়ে করতে হবে নাকি ?
সে নাকি বুঝতে পারে যে এই উত্তর শুনে নানাবতি নিশ্চয় ক্ষেপে যাবে তাই সে রিভলভারটি দখল করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নানাবতিও তৎপর। রিভলভার নিয়ে দুজনেই মারামারি হয়।
ঘরের ভেতর ঠিক কি হয়েছিল তা কেউ জানেনা। আহুজাকে যে নানাবতি গুলি করেছে এটাও কেউ দেখে নি। ঘটনাক্রমের ওপর নির্ভর করেই বিচারপতিরা নানাবতিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু রিভলভার থেকে দুর্ঘটনাক্রমে গুলি ছিটকে যাওয়া বিচারপতিরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। দুর্ঘটনা ঘটলে সে গুলি নানাবতির দেহেও তো বিদ্ধ হতে পারত। তাছাড়া রিভল-ভারটা মেসিনগান নয়। একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে পড়তে পারে কিন্তু তিনটে গুলি পর পর দুর্ঘটনাক্রমে কি করে বেরোতে পারে ?
কমাণ্ডার স্যামুয়েলকে নানাবতি বলেনি যে সে দুর্ঘটনাক্রমে আহুজাকে গুলি করেছে, কিংবা রিভলভার থেকে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে গেছে। পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করার সময়ও এ কথা বলে নি। অথচ আদালতে তার উকিলরা বলছেন যে রিভলভার থেকে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আহুজা মারা গেছে।
নানাবতি আদালতে বলেছিল যে রিভলভারটি একটি খামে মোড়া ছিল এবং সেটি একটি ক্যাবিনেটের ওপর নানাবতি রেখেছিল। আহুজা যখন বলে যে আমি যে মেয়েকে নিয়ে ঘুমোব তাকেই বিয়ে করতে হবে নাকি? এই কথা শুনে নানাবতি ক্ষিপ্ত হয়ে আহুজাকে প্রহার করতে যায়।
আহুজা অনুমান করেছিল খামের ভেতর রিভলবার আছে। সে রিভলভারটি দখল করতে যায়। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় এবং দুর্ঘটনা-ক্রমে দুটি গুলি নাকি বেরিয়ে যায়। তৃতীয় গুলিটি কি ভাবে বেরিয়ে গেল তার কোন জবাব নানাবতি দিতে পারে নি।
প্রথম দুটি গুলি যদি দুর্ঘটনাক্রমে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার

একটি তো নানাবতির গায়ে লাগতে পারত !

প্রথমে বম্বের সেশন আদালতে নানাবতির বিচার হয়। সেশনে জজ ছিলেন মাননীয় বিচারপতি আর বি মেটা। ইনি পরে গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ এবং ৩০৪ ধারা অর্থাৎ হত্যার অপরাধে নানাবতিকে অভিযুক্ত করা হয়। ন'জন জুরি ছিলেন। জুরিরা সকলেই ছিলেন বম্বে পোর্ট কমিশনারের কর্মী এবং বম্বে পোর্ট কমিশনারের অ্যাটর্নি ছিলেন নানাবতির চাচা। একজন ব্যতীত আটজন জুরি নানাবতিকে নির্দোষ বলেছিলেন কিন্তু জজ-সাহেব জুরিদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। মামলাটি তিনি হাইকোর্টে পাঠিয়েছিলেন।

বম্বে হাইকোর্টে ডিভিসন বেঞ্চে বিচারপতি সেলাট এবং বিচারপতি নায়েকের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি দু'জন পৃথক রায় দিলেও সাজা দিয়েছিলেন একটি, যাবজ্জীবন এবং কঠোর পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড।

নানাবতিকে তখন নৌবাহিনীর হেফাজতে 'কুঞ্জালি' জাহাজে আটক রাখা হয়েছিল। বিচারপতি রায় দিয়ে নানাবতিকে গ্রেফতারের আদেশ দেন কিন্তু বম্বের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীপ্রকাশ এক আদেশ জারী করে নানাবতির দণ্ড স্থগিত রাখবার আদেশ দেন অতএব গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যায় নি।

রাজ্যপালের এই আদেশ নিয়ে বম্বে হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে শুনানি হয়েছিল। হাইকোর্ট অনিচ্ছাসত্বেও রাজ্যপালের আদেশ বহাল রাখেন।

দণ্ডাদেশ মকুব করার জন্যে নানাবতি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে চায় কিন্তু তাহলে তাকে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পুলিসে আত্মসমর্পণ করতে নানাবতি রাজি নয়। প্রশ্ন নিয়ে আদালতে আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত নানাবতিকে জেলে যেতে হল তবে সুপ্রিম কোর্টে তার আপিল গৃহীত হল। আপিল গ্রহণ করা হবে

কিনা তাই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে শুনানি হয়েছিল। পাঁচজন বিচারপতি ছিলেন যথা প্রধান বিচারপতি বি পি সিংহ, পি বি কাপুর, গজেন্দ্রগড়কর, সুব্বারাও এবং বাঞ্চু।

মূল আপিলের শুনানি হল। তিনজন বিচারপতি ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রাখলেন, কঠোর পরিশ্রমসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তবে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

নানাবতির বিচার নিয়ে পশ্চাতপটে বহু ঘটনা ঘটেছিল, আইন-ব্যবসায়ীরা ও বার লাইব্রেরিগুলি সর্বদা আইনের নানারকম প্রশ্ন নিয়ে মুখর থাকত। একটা কথা শোনা যায়। নিম্ন আদালতের জুরিদের রায়ে কেউ সন্তুষ্ট হয় নি, জুরিরা নাকি সাজানো ছিল ফলে বম্বে আদালতে নাকি জুরির সাহায্যে আর বিচার করা হয় না।

৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮। বিকেল পাঁচটার কিছু পরে দিল্লীর বিড়লা ভবনে মহাত্মা গান্ধী যখন আভা ও মানু গান্ধীর কাঁধে হাত রেখে দৈনন্দিন প্রার্থনা সভার দিকে যাচ্ছিলেন তখন পুনা থেকে আগত জনৈক ব্রাহ্মণের গুলিতে মহাত্মা গান্ধী নিহত হন।

সেই ব্রাহ্মণের নাম নাথুরাম গড়সে। সে তিন বার গুলি করেছিল। গান্ধীজী 'হে রাম' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

নাথুরামকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়, পিস্তলটি উদ্ধার করা হয় এবং পুলিস ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে থাকে এবং ধড়পাকড়ও শুরু হয়। ক্রমে জানা যায় যে নাথুরাম গড়সে একাই দায়ী নয়। একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হয়েছিল, যার সঙ্গে কয়েকজন ব্যক্তি জড়িত ছিল। পুলিস পাঁচ মাস ধরে তদন্ত চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে তাদের বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করে।

গান্ধীজী হত্যার মামলার বিচার বিবরণী আপিল কোর্টের অন্যতম বিচারপতি গোপালদাস খোসলার লিখিত বিবরণী থেকে এখানে পেশ করেছি।

২২ জুন ১৯৪৮ তারিখে দিল্লির লাল কেল্লায় বিশেষ একটি আদালতে আসামীদের বিচার শুরু হয়। বিচারক ছিলেন জনৈক প্রবীণ আই সি এস, শ্রীআত্মাচরণ। তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়েছিল। লাল কেল্লার ভেতরে আদালত বসলেও আদালত জনসাধারণ ও সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিচারের বিবরণী সংবাদপত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হত। নিজ নিজ কৌঁসুলি নিযুক্ত করবার স্বাধীনতা আসামীদের দেওয়া হয়েছিল।

নিম্নোক্ত আটজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক পদার্থের শাস্তিযোগ্য আইন অনুসারে

অভিযোগ দায়ের করা হয় :—

১। নাথুরাম গড়সে, ৩৭, সম্পাদক, হিন্দুরাষ্ট্র, পুনা।

২। গোপাল গড়সে, ঐ ভাই, ২৭, স্টোরকিপার, আরমি ডিপো, পুনা।

৩। নারায়ণ আপতে, ৩৪, ম্যানেজিং ডিরেকটর, হিন্দুরাষ্ট্র প্রকাশম লিঃ, পুনা।

৪। বিষ্ণু করকরে, ৩৭ রেস্তোরাঁর মালিক, আমেদনগর।

৫। মদনলাল পাওয়া, ২০, রিফিউজি ক্যাম্প, আমেদনগর।

৬। শংকর কিস্তায়া, ২৭, গৃহভৃত্য, পুনা।

৭। দত্তাত্রেয় পরচুরে ৪৯, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, গোয়ালিয়র।

৮। বিনায়ক সবারকর, ৬৫, ব্যারিস্টার, জমিদার এবং সম্পত্তির মালিক, বম্বে।

গঙ্গাধর দণ্ডবতি, গঙ্গাধর যাদব এবং সূর্যদেও শর্মা পলাতক। এদের অনুপস্থিতিতে এদের বিচার করা হয়েছিল।

ফরিয়াদি পক্ষের মামলা আরম্ভ করলেন বম্বে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী সি কে দফতরি। ইনি পরে ভারত সরকারের অ্যাটরনি জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২৪ জুন থেকে সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ আরম্ভ হল।

মোটমাট ১৪৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল এবং একজিবিট রূপে বহু প্রামাণিক দলিল, চিঠি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অন্যান্য বস্তু আদালতে দাখিল করা হয়েছিল।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দিয়েছিল এই মামলার রাজসাক্ষী দিগম্বর বাদগে। হত্যার চক্রান্তে বাদগে একজন ষড়যন্ত্রকারী, তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। গান্ধীজীকে হত্যার পরদিনই ৩১ জানুয়ারি বাদগেকে গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিস তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেরা করতে থাকে। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বীকারোক্তি করে এবং সঙ্গীদের নাম ও তাদের দায়িত্বও উল্লেখ করে।

স্বীকারোক্তির পর দিগম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হয়ে

তার স্বীকারোক্তি পুনরায় বলতে রাজি হয়। শর্তাধীনে তাকে ক্ষমা করা হয় কারণ সে রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়েছিল।

সাক্ষীদের বিবৃতি শেষ হয় ৬ নভেম্বর তারিখে। এরপর আসমীদের বক্তব্য পেশ করতে বলা হয়। আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কিছু প্রামাণিক দলিল পেশ করলেও কাউকে সাক্ষী মানে নি।

উভয়পক্ষের কৌঁসুলিদের সওয়াল শেষ হতে এক মাস সময় লাগে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখ বিচারক রায় দেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নাথুরাম গড়সে ও তার বন্ধু নারায়ণ আপতের ফাঁসির হুকুম হয়, পাঁচজনকে যাবজ্জীন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং শ্রীসবারকারকে মুক্তি দেওয়া হয়। আসামীরা ইচ্ছা করলে পনের দিনের মধ্যে আপিল করতে পারে। সাতজন আসামীর পক্ষ থেকেই চারদিন পরে পাঞ্জাব হাইকোর্টে আপিল করা হয়।

গড়সে তার দণ্ড বা বিচারের কোনো ত্রুটির জন্যে আপিল করে নি। আদালত বলেছে যে গান্ধীজীকে হত্যার জন্যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এইখানেই তার আপত্তি। সে তার আপিলে উল্লেখ করেছিল যে কোনো ষড়যন্ত্র করা হয় নি। গান্ধীজীকে হত্যার দায়িত্ব সে একা গ্রহণ করে এবং সে প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে বলে যে আর কেউ এই হত্যার ব্যাপারে জড়িত নেই।

হাইকোর্টের রুল ও অর্ডার অনুসারে হত্যার মামলার শুনানি হয় দু'জন বিচারকের ডিভিসন বেঞ্চে কিন্তু এ ক্ষেত্রে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির হত্যা জড়িত, বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশে এই মর্মান্তিক হত্যা নিয়ে গভীর আলোচনা চলছে অতএব প্রধান বিচারপতি তিনজন বিচারক নিয়ে বেঞ্চ গঠন করলেন। বিচারক তিনজন হলেন মহামান্য বিচারক ভাণ্ডারী, মহামান্য বিচারক অচ্ছরাম এবং মহামান্য বিচারক গোপালদাস খোসলা।

বিচারকেরা স্থির করলেন যে অতি পুরাতন রীতি অনুসারে তাঁরা মাথায় উইগ ধারণ করবেন এবং তাঁরা আদালতে প্রবেশ করবার আগে রৌপ্যদণ্ড হস্তে উর্দি পরিহিত আরদালিরা তাঁদের পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাবে।

পাঞ্জাব যা তখন পূর্ব পাঞ্জাব নামে অভিহিত এবং নিজস্ব কোনো রাজধানী না থাকায় সাময়িক রাজধানী সিমলায় অবস্থিত ছিল। হাইকোর্টও সিমলাতেই ছিল। সিমলায় বড়লাটের গ্রীষ্মাবাস পিটারহফ নামে প্রাসাদোপম বাড়িতে হাইকোর্টের স্থান দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বাড়িখানা অতিশয় সুন্দর কিন্তু হাইকোর্টের অনুপযোগী। সবচেয়ে বড় ঘরটিও আদালতের পক্ষে অনুপযুক্ত। নাথুরাম গড়সে ও তার সঙ্গীদের আপিলের শুনানির জন্যে দ্বিতলে বলরুমটি ঠিক করা হল। কিছু কিছু পরিবর্তন করে ঘরখানিকে আদালত গৃহে পরিণত করা হল।

সিমলায় জনসাধারণ মামলা শোনবার জন্যে হাইকোর্টে ভিড় করত না কিন্তু বর্তমানে আপিল শুনানির জন্য প্রচণ্ড ভিড় হবে আশা করে নতুন ব্যবস্থা করা হল। সিমলায় তখন বেশ শীত সেজন্য ঘরখানি গরম রাখার ব্যবস্থা করা হল। প্রবেশপথে পুলিস পাহারা রইল এবং বিনা অনুমতিতে আদালতে প্রবেশ নিষেধ করা হল। রেজিস্ট্রার এজন্যে পাস ইস্যু করবেন।

২ মে ১৯৪৯ তারিখে শুনানী আরম্ভ হল। আদালত গৃহ পূর্ণ। আদালতের বিচারক, উভয়পক্ষের কৌঁসুলী, আসামীগণ, সংশ্লিষ্ট কর্মী এঁদের সংখ্যা কম নয়। এঁরা ছাড়া শুনানী শুনতে হাইকোর্টের অন্যান্য আইনজীবীরা এসেছেন। অনেক ভি আই পি, তাঁদের বন্ধু ও পরিবারের লোকজন, সাংবাদিকেরা তো আছেনই। হাইকোর্টের বাইরেও প্রচুর ভিড়। ঐতিহাসিক বিচারে ভিড় তো হবেই।

আসামীদের দিকে মদনলাল ও নারায়ণ আপতের পক্ষে কলকাতার একজন সিনিয়র ব্যারিস্টার ছিলেন' মিঃ ব্যানার্জি। করকরের পক্ষে মিঃ ডাঙ্গে, শংকর কিস্তায়ার পক্ষে পাঞ্জাব হাইকোর্টের মিঃ আবাস্তি। কিস্তিয়া দরিদ্র। তার জন্যে সরকারী ব্যয়ে ব্যারিস্টার নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরচুরে আর গোপাল গড়সের পক্ষ নিয়েছিলেন বম্বের

মিঃ ইনামদার।

নাথুরাম বলেছিল, সে দরিদ্র, ব্যারিস্টার নিযুক্ত করবার তার অর্থ নেই। নিজের মামলা সে নিজেই লড়বে। এজন্যে তাকে বিশেষ একটি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল।

নাথুরামের আসল মতলব কি জানা যায় না। হিন্দুধর্মের প্রবক্তা-রূপে নিজেকে সে হয় তো জাহির করতে চেয়েছিল। তবে সে আগাগোড়া নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে এবং যে কাজ সে করেছে তার জন্যে মোটেই অনুতপ্ত নয় একথা বলতে সে দ্বিধা বোধ করে নি।

ফরিয়াদি পক্ষে কৌসুলি ছিলেন বম্বের অ্যাডভোকেট জেনারেল সি কে দফতরি এবং বম্বের শ্রী পাতিগর ও ব্যবকরকর এবং পাঞ্জাব হাইকোর্টের শ্রী কর্তার সিং চাওলা।

মামলা আরম্ভ করতে গিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্বন্ধে মিঃ ব্যানার্জি বৈধতার কিছু প্রশ্ন তোলেন কিন্তু বিচারপতি অশ্রুরাম তাঁকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকেন।

সেদিন আদালতের শেষে এ বাধা দেওয়া অন্য দুজন বিচারপতি সমর্থন করতে পারেন নি কারণ মিঃ ব্যানার্জির ব্যক্তব্যে যুক্তি ছিল এবং এইরকম প্রশ্ন হাইকোর্টে আলোচিত হওয়া উচিত।

তাছাড়া আদালতের কাজ এইভাবে চললে সকলের ধারণা হবে যে বিচারপতিরা আগেই তাঁদের বিচারফল স্থির করে রেখেছেন, এখন যা চলছে তা রুটিন মাত্র।

বিচারপতি ভাণ্ডারী এই বিষয়ে বিচারপতি অশ্রুরামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অশ্রুরাম প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলেন তবে পরে মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। তিনজনের মধ্যে ভাণ্ডারী ছিলেন সিনিয়র।

আসামীদের পরিচয় দেওয়া যাক। নাথুরাম এবং গোপাল গড়সে গ্রামের পোস্টমাস্টারের ছেলে। ওরা চার ভাই দুই বোন। নাথুরাম মেজ ছেলে, পড়াশোনায় ভাল ছিল না, পরিশ্রম করতে চাইতেন না, বুদ্ধি কিছু কম ছিল না। ম্যাট্রিক পাস করার আগেই পড়া ছেড়ে দেয়।

পড়া ছেড়ে দিয়ে নাথুরাম একটা কাপড়ের দোকান করে। এই ব্যবসায় সুবিধে হল না, তখন একটা দর্জির দোকানে চাকরী নিল। বাইশ বছর বয়সে নাথুরাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে যোগ দেয়। সংঘের মূল উদ্দেশ্য হিন্দুদের স্বার্থ, সংহতি ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা। কয়েক বছর পরে নাথুরাম পুনায় চলে যায় এবং পরে হিন্দু মহাসভার স্থানীয় শাখার সেক্রেটারি হয়। হিন্দুমহাসভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আর এস এস-এর বিশেষ তফাত নেই। তফাত হল সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপে। তবে হিন্দু মহাসভার পরে মূল ধ্বনি ছিল অখণ্ড হিন্দুস্থান বা অখণ্ড ভারত। হিন্দু মহাসভা টিম টিম করে চলছিল কিন্তু বীর সবারকর মহাসভায় যোগ দেবার পর থেকে মহাসভায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল।

নিজামের রাজ্য হায়দারাবাদে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ফলে সেখানে যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল, নথুরাম তখন সেই সত্যাগ্রহে যোগ দেয় এবং কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দু স্বার্থ রক্ষার্থে রাজনীতিতে সে ডুবে যায় এবং সে ঠিক করে যে এজন্যে সে তার পুরো সময় ব্যয় করবে এমন কি বিয়ে করে সংসারের জন্যে সে সময় নষ্ট করবে না।

পুনায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় নারায়ণ আপতের। আপতে স্কুল মাস্টারি করত এবং 'অগরনি' নামে একটি পত্রিকা চালাত। পরে নাম বদল করা হয়। নতুন নাম হয় 'হিন্দু রাষ্ট্র'।

মুসলমানদের তোষণ, জিন্নার সঙ্গে আলাপ আলোচনা, সুরাবর্দির সঙ্গে বন্ধুত্ব, এসব নাথুরাম পছন্দ করত না এবং গান্ধীজীর এই সকল নীতির তীব্র সমালোচনা করে সে উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখত। তার উত্তেজক প্রবন্ধগুলির জন্যে সরকার তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে নতুন জামানত জমা দিতে বলা হয়।

২০ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে দিল্লিতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তা সমর্থন করে উক্ত পত্রিকায় সংবাদ ছাপা

হয়েছিল। সংবাদ শিরনাম ছিল গান্ধীজীর তোষণ নীতির প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শরণার্থী কর্তৃক প্রতীক প্রতিবাদ।

নাথুরাম উত্তমরূপে গীতা পড়েছিল এবং অধিকাংশ শ্লোক তার মুখস্ত ছিল এবং অনেক সময় সে তার যুক্তিতর্কের সমর্থনে গীতার শ্লোক আওড়াত। যদিও তাকে দেখে মনে হত শান্ত কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল উগ্র।

হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও তার ভাই গোপাল কিন্তু নাথুরামের মত এতটা উগ্র সমর্থক ছিল না। নাথুরাম যে দর্জি প্রতিষ্ঠানে কাজ করত গোপালও সেখানে যোগ দেয় কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করার পর।

হিন্দু মহাসভার জন্যে কিছু কাজ করার পর গোপাল মিলিটারিতে চাকরী নেয়। কিরকিতে মোটর ট্রান্সপোর্ট স্পেয়ারস সাব ডিপোতে সে স্টোর কিপারের চাকরী নেয়। যুদ্ধের সময় সে ইরাক ও ইরানে গিয়েছিল এবং যখন ফিরে আসে তখন সে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

ভারত ভাগের প্রতিবাদে সবারকরের বক্তৃতাগুলি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সে হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়। নাথুরাম তাকে সতর্ক করে বলত যে তুমি বিবাহিত ও সংসারী, এ পথ বিপদজনক, এ পথে আসবে কিনা ভাল করে ভেবে দেখ। গোপাল দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরে সে নাথুরামের সঙ্গে কাজে আত্ম-নিয়োগ করে।

নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপতে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। বি, এস সি পাস করে সে আমেদনগরে শিক্ষকতা করত। আমেদ-নগরে 'নারায়ণ আপতে একটি রাইফেল ক্লাব স্থাপন করে ও নিজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে যোগ দেয়। সংঘের সভ্যদের লাঠি ও হাত লাঠি দিয়ে সে নিয়মিত ড্রিল করাত।

এই সময়েই তার সঙ্গে নাথুরাম গড়সের পরিচয় এবং দুজনে খুব বন্ধুত্ব হয়। ১৯৪৩ সালে আপতে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগ দেয়,

এবং তাকে কিংস কমিশন দেওয়া হয়।

তার ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে চার মাস পরে সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

পরের বছর থেকে হিন্দু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সে নাথুরামকে সাহায্য করতে থাকে। নাথুরামের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সে বিশ্বাস করতে থাকে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে কিছুই অর্জন করা যাবে না।

নাথুরামের মতো ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও কাজে উদ্যম না থাকলেও নারায়ণ আপতে কিন্তু শেষপর্যন্ত তার সাহস অক্ষুণ্ন রেখেছিল যা নাথুরামের হ্রাস পেয়েছিল।

বিষ্ণু রামকৃষ্ণ করকরের শৈশব ও কৈশোর কষ্টেই কেটেছিল। তার পিতামাতা তাকে পালন করতে না পেরে একটি অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দিয়েছিল এবং পরে তার কোনো খবর নেয় নি। অনাথ আশ্রম থেকে করকরে পরে পালিয়ে যায় এবং চায়ের দোকান বা হোটেলে বয়ের কাজ করতে থাকে।

পরে এক ভ্রাম্যমান থিয়েটার দলে ভর্তি হয়। কিছুকাল পরে আমেদনগরে একটি রেস্টুরেন্টের মালিকরূপে তাকে দেখা যায়। পরে সে হিন্দু মহাসভার একজন সক্রিয় সভ্যরূপে যোগ দেয় এবং জেলা শাখা অফিসের সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়। এই সূত্রে তার সঙ্গে আপতের পরিচয় হয় এবং তা ঘনিষ্ঠ হয়।

আপতের সাহায্যে করকরে আমেদনগর মিউনিসিপালে কমিটির নির্বাচনে জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালে করকরে সেবাকার্যের জন্যে নোয়াখালি যায়। নোয়াখালিতে করকরে তিন মাস ছিল এবং হিন্দু নারীদের প্রতি অত্যাচার তাকে ক্ষুব্ধ করে বিশেষ করে গান্ধীজী যে বলেছিলেন নোয়াখালিতে তিনি নারী অপহরণ বা নারী ধর্ষণের একটিও ঘটনা দেখেন নি বা শোনেন নি। তারপর বঙ্গদেশের একজন মুসলিম এম এল এ, গোলাম সারোয়ারকে দশ হাজার টাকা দেওয়াটাও করকরে সমর্থন করতে পারে নি কারণ সারোয়ার হিন্দু

বিদ্বেষী এবং বহু অত্যাচারের জন্যে সে দায়ী।

মদনলাল পাওয়ার দেশ পাঞ্জাবের পাকপত্তনে বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান ভুক্ত। বাল্যকাল থেকেই সে ভীষণ তেজী। স্কুলে পড়বার সময়েই মদনলাল বাড়ি থেকে পালিয়ে রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভিতে ভর্তি হতে গিয়েছিল কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় পুনায় গিয়ে মিলিটারিতে ভর্তি হয় কিছুদিন ট্রেনিং নেবার পর সে মিলিটারি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যায়।

১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ওরা ফিরোজপুরে চলে আসে তার চোখের সামনে তার বাবা ও পিসিকে হত্যা করা হয়। ভারতে এসে সে অনেকবার চাকরীর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, যার জন্যে মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হয়।

১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে তার সঙ্গে আপতে ও নাথুরামের পরিচয় হয়। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত শরণার্থীদের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারি ঔদাসিন্যের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্যে মদনলাল বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে মিছিল পরিচালনা করতে থাকে।

শংকর কিস্তায়া গ্রাম্য সূত্রধরের পুত্র। লেখাপড়া শেখে নি, নিরক্ষর ছিল। ইতস্তত ঠিকে কাজ করে পুনা শহরে এসে একটা দোকানে চাকরি পায়। এই দোকানে চাকরি করবার সময়ে দিগম্বর বাদগের সঙ্গে শংকরের দেখা হয়। ছোরা, কুকরি খাঁড়া এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসা করত বাদগে। আগ্নেয়াস্ত্র আর কার্তুজ বেচাকেনা করত লুকিয়ে গোপনে।

দোকানের চাকরি ছেড়ে কিস্তায়া মাসিক তিরিশ টাকা মাইনেয় বাদগের গৃহভৃত্যের চাকরিতে ভর্তি হল। কর্মঠ ও বিশ্বাসী ভৃত্যরূপে কিস্তায়া তার পরিচয় দিল। ঘরের কাজ ছাড়া কিস্তায়া বাদগের কাপড়চোপড় কাচত, দোকান দেখত আবার বাদগের রিকশাও টানত।

কিন্তু তার মাইনে বাকি পড়তে লাগল। একজন মহিলার কাছে বাদগের কিছু টাকা পাওনা ছিল। কিস্তায়া সেই টাকা আদায় করে

বাদগের বাড়িতে আর ফিরে গেল না। কিন্তু পরে যখন তার হাত খালি হয়ে গেল তখন সে আবার বাদগের বাড়ি ফিরে গেল। বাদগে তাকে আবার কাজে ভর্তি করে নিল। এরপর থেকে কিস্তায়া বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছিল। কিস্তায়ার অন্যতম কাজ ছিল বেআইনী অস্ত্রাদি বাদগের খরিদ্দারদের বাড়ি গোপনে পৌঁছে দেওয়া। সেই সময়ে হায়দারাবাদে এবং অন্যত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে বাদগের ব্যবসা ভালই চলছিল। তার বাজার তেজী ছিল।

ডাক্তার দত্তাত্রের পরচুরে ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়রে বাড়ি। তার বাবা গোয়ালিয়র স্টেটে শিক্ষা বিভাগে বড় চাকরি করতেন এবং মানুষ হিসেবে তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। পরচুরে ডাক্তারী পাস করে গোয়ালিয়র স্টেটেই চাকরি নিয়েছিল কিন্তু ১৯৩৪ সাল থেকে সে চাকরি ছেড়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছিল। পরচুরে হিন্দু রাষ্ট্রিয় সেনার ডিকটেটর নির্বাচিত হয়েছিল। এ সূত্রেই তার সঙ্গে আপতে ও নাথুরামের সঙ্গে পরিচয় হয়।

বিনায়ক দামোদর সবারকর বা বীর সবারকর ব্যারিস্টার এবং ঐতি-হাসিক। তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর চোদ্দ বছর দ্বীপান্তর হয়েছিল পরে বন্দী থাকতেও হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং মহাসভার মূল লক্ষ্য অখণ্ড ভারতের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকাল তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন এবং নীতি নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রচুর প্রভাব ছিল। তিনি বম্বেতে নিজস্ব বাড়ি সবারকর সদনে বাস করতেন এবং মহাসভার নেতারা তাঁর বাড়িতে আসতেন, মিটিং হত। সরকার কিন্তু তাঁর বাড়ির ওপর নজর রাখত।

দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগে রাজসাক্ষী হয়েছিল। পূর্ব খান্দেশের চালিসগাঁওতে তার বাড়ি। লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি, ম্যাট্রিক পর্যন্তও পৌঁছয় নি। লেখাপড়া ছেড়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় সে পুনায় আসে কিন্তু অস্থায়ী চাকরি ছাড়া স্থায়ী চাকরি কোথাও পায়

নি। চাকরির জন্যে সে পুনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে সত্যাগ্রহ করেছিল ফলে তাকে যে চাকরি দেওয়া হয়েছিল সে চাকরিতে সে সন্তুষ্ট হয় নি।

একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে সে কিছুদিন কৌটো হাতে বাড়ি বাড়ি চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াত। সংগৃহীত চাঁদা থেকে তাকে সিকি ভাগ দেওয়া হত। ঐ সিকি ভাগ থেকে পয়সা জমিয়ে ছোরাছুরি এবং অন্য কোনো অস্ত্র কিনে ফেরি করত। মোটামুটি একটা লাভ থাকত। এইভাবে কিছু জমিয়ে সে একটা দোকান করল। অচিরে তার ব্যবসা প্রসার লাভ করল কারণ দেশের চার-দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছে। হায়দারাবাদ সীমান্তে যেসব হিন্দুরা বাস করত তারাই ছিল তার বড় গ্রাহক।

বাদগে তার ব্যবসার মাধ্যমে হিন্দু মহাসভার সভ্যদের সংস্পর্শে আসে এবং হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে সে যাওয়া আরম্ভ করল। সভামণ্ডপের বাইরে সে বইয়ের স্টল খুলত। বইয়ের সঙ্গে ছোরাছুরিও বিক্রি করত।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সবারকরের বাড়িতে তার সঙ্গে নাথুরাম ও আপতের আলাপ হয়। ১৯৪৭ সালে বাদগে ব্যবসা বড় করল। ছোরা, ছুরি, কুকরি, খাঁড়া, তলোয়ার, কৃপাণ, বর্শা, বাঘ-আঁচড়া ইত্যাদি ছাড়া সে গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র, কাতুর্জ ও বিস্ফোরক পদার্থও বেচতে আরম্ভ করল। এই গোপন ব্যবসায়ে তার মোটা লাভ। পুনা ও বম্বেতে তার অনুচর মারফত এগুলি চালান যেত। যুদ্ধের পরে দেশে এইসব অস্ত্রের অভাব ছিল না।

নাথুরাম, গোপাল, আপতে, করকরে, পরচুরে মদনলাল, বাদগে, এরা সবাই বিশ্বাস করত যে গান্ধীজীর অনুসৃত নীতি মুসলমানদের আবদার বাড়িয়ে দিচ্ছে। আদালতে যেসব তথ্য ও প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জানা যায় যে গান্ধী হত্যার চক্রান্ত ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে নাথুরাম ও আপতে কর্তৃক রচিত হয়েছিল এবং সেই চক্রান্ত রূপায়ণের জন্য তা প্রসারিত করা হয়।

পরের বছর ১৩ জানুয়ারী চূড়ান্ত ভাবে স্থির করা হল আর দেরি নয়, এইবার আঘাত হানতে হবে। বাঁটোয়ারার ফলে পাকিস্তানের পঞ্চান্ন কোটি টাকা বুঝি পাওনা হয়েছিল কিন্তু ভারতের ঘরোয়া মন্ত্রী সেই টাকা আটকে দিয়েছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মনে করতেন যে পাকিস্তান ঐ টাকা হাতে পেলেই সে অস্ত্র কিনবে এবং তা কাশ্মীর সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে।

কিন্তু গান্ধীজী ভাবলেন ঐ প্রাপ্য টাকা পাকিস্তানকে না দিলে বিরোধ আরও বাড়বে, দুই দেশের মনের মিল হবে না অতএব তিনি আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন যার ফলে ভারত সরকার তিন দিনের মধ্যেই পাকিস্তানকে ঐ টাকা দিতে রাজি হল।

আর দেরি নয়। চক্রান্তকারীরা এই লোকটিকে এবার একেবারেই চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। গান্ধীজী সাধারণ একজন লোক নন। তাঁকে হত্যা করতে যেমন অসাধারণ মনোবলের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নিখুঁত চক্রান্তের।

নাথুরাম চিন্তা করতে লাগল। যে কাজ তারা করতে যাচ্ছে তাতে সফল হলেও বিপদ, বিফল হলেও বিপদ। ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুবই বেশি এবং ধরা পড়বেই। ধরা পড়লে তাদের জেল বা ফাঁসি যাই হক না কেন সেজন্যে তারা প্রস্তুত কিন্তু তাদের পরিবারের কি হবে?

সে নিজে বিয়ে করে নি, সংসারের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই কিন্তু তার দুর্ভাবনা তার ভাই গোপাল ও বন্ধু ও সহযোগী নারায়ণ আপতেকে নিয়ে। নাথুরামের লাইফ ইনসিওরেনসের দুটো পলিসি ছিল। ১৩ জানুয়ারি তারিখে নাথুরাম তিন হাজার টাকার পলিসির ওয়ারিস করল আপতের স্ত্রীকে এবং দু হাজার টাকার পলিসির ওয়ারিস করে দিল পর দিন ১৪ জানুয়ারি তারিখে গোপালের স্ত্রীকে।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে আপতেকে সঙ্গে নিয়ে নাথুরাম পুনা থেকে

বম্বে যাত্রা করল। ঐ দিনই দিগম্বর বাদগে তার ভৃত্য শংকর কিস্তায়াকে সঙ্গে নিয়ে বম্বে রওনা হল, সঙ্গে নিল একটি ব্যাগে দুটি গান-কটন স্ল্যাব বিস্ফোরক এবং চারটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড।

বম্বে পৌঁছে বাদগে এগুলি গচ্ছিত রাখল দিক্ষীত মহারাজের বাড়ি। ইনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতা, ধার্মিক ব্যক্তি, বাদগের একজন প্রাক্তন গ্রাহক। যেখানে যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হত সেখানে হিন্দুদের সরবরাহ করবার জন্যে ইনি বাদগের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয় করেছেন।

হিন্দু মহাসভার অফিসে বাদগে রাত্রি যাপন করল এবং পরদিন সকালে নাথুরাম ও আপতে তার সঙ্গে দেখা করে তার চক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করল। জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকে মদনলাল আর করকরে বম্বেতেই ছিল। ওরা দুজনও হিন্দু মহাসভা অফিসে এসে আলোচনায় যোগ দিল তারপর ওরা পাঁচজন দিক্ষীত মহারাজার বাড়িতে এসে গচ্ছিত মালের ব্যাগটি ফেরত চাইল।

দিক্ষীত মহারাজ ভেবেছিলেন যে এই সকল বিস্ফোরক বোধহয় মুসলমান নিধনের জন্যে হায়দারাবাদে পাঠান হচ্ছে অতএব তিনি উৎসাহভরে বিস্ফোরকগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে ওদের কিছু নির্দেশ দিলেন, আসল চক্রান্তের বিষয় তিনি কিছু জানতেন না। সাক্ষ্য দেবার সময় এসব কথা তিনি বলেছেন।

নারায়ণ আপতে দিক্ষীত মহারাজের কাছ থেকে একটি রিভলভার চাইল কিন্তু দিক্ষীত মহারাজ রিভলভার দিলেন না, এড়িয়ে গেলেন। মদনলাল আর করকরের বম্বেতে কোন কাজ ছিল না। মদনলালের তখন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। তার দিল্লি যাওয়া দরকার। সে আর করকরে দিল্লি চলে গেল।

মদনলাল আর করকরে ১৫ জানুয়ারি তারিখে বম্বে ছেড়ে ১৭ তারিখে দিল্লি পৌঁছল। দিল্লিতে হিন্দু মহাসভার অফিসে থাকবার জায়গা পাওয়া গেল না তখন ওরা চাঁদনি চকে একটা সস্তা হোটেলে উঠল।

হোটেলের রেজিস্টারে করকরে তার নাম লেখাল বি এম বিয়াস আর মদনলাল নিজের নাম লেখালেও স্থায়ী ঠিকানার ঘরে মিথ্যে ঠিকানা লেখাল।

বাদগে শংকরকে নিয়ে পুনায় ফিরে গেল এবং পুনায় তার গোপন আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ সমূহ হায়দারাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের সমর্থক একজন ব্যক্তির তদারকিতে রেখে বম্বে ফিরে এল ১৭ জানুয়ারী তারিখে। এই বিলি ব্যবস্থা করবার জন্যেই বাদগে পুনা গিয়েছিল।

বম্বে পৌঁছে ওরা দুজন রেলস্টেশনে নাথুরাম ও আপতের সঙ্গে দেখা করল। এই ব্যবস্থা আগেই ঠিক করা ছিল।

দরকার এখন টাকার। ওরা শহরে বেরিয়ে পড়ল। হায়দারাবাদের অবস্থা সঙ্গীন। হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সেখানে এখন প্রচুর টাকার দরকার। এই কথা বলে তারা ২১০০ টাকা চাঁদা তুলে ফেলল।

সেইদিনই বিকেলের প্লেনে নাথুরাম এবং আপতে দিল্লি যাত্রা করল। টিকেট কিনল অন্য নামে, গড়সে নাম নিল ডি এন কারমারকর আর আপতে নাম নিল এস মারাঠে। দিল্লিতে এসে ওরা উঠল মেরিনা হোটেলে। এখানে ওরা দুজন নাম লেখাল এস দেশপাণ্ডে এবং এম দেশপাণ্ডে। ওরা দুজন এই হোটেলে ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত ছিল।

বাদগে আর শংকর দিল্লি পৌঁছল ১৯ জানুয়ারি। ওরা দুজন হিন্দু মহাসভা ভবনে স্থান পেল।

পুনার কাছে কিরকিতে একটি মিলিটারি ডিপোতে গোপাল গড়সে চাকরি করত। ১৪ জানুয়ারি তারিখে সে ১৫ তারিখ থেকে সাতদিন ছুটির জন্যে আবেদন করল। কর্তারা বলল ১৬ তারিখ তাকে অফিসারদের সামনে হাজির হতে হবে, তারা ছুটি মঞ্জুর করলে তবে ছুটি পাওয়া যাবে। অগত্যা ১৬ তারিখে গোপাল অফিসারদের সামনে হাজির হল। ১৭ তারিখ থেকে তাকে সাত

দিনের জন্যে ছুটি দেওয়া হল।

গোপাল সেই দিনই দিল্লি যাত্রা করল এবং ১৮ তারিখে সন্ধ্যায় সে দিল্লি পৌঁছল। স্টেশনে নাথুরাম তাকে নিতে এসেছিল কিন্তু কোথায় গোপাল?

গোপালের ট্রেন লেট হয়েছিল। সে ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ট্রেন যখন নিউ দিল্লি স্টেশনে পৌঁছল তখনও সে ঘুমাচ্ছে অতএব নাথুরাম তার দেখা পায় নি। ট্রেন যখন ওল্ড দিল্লি স্টেশনে পৌঁছল তখন তার ঘুম ভাঙল। রাত্তিরটা গোপাল প্ল্যাটফরমে রিফিউজিদের সঙ্গে কাটিয়ে দিল।

পরের দিন সকালে হিন্দু মহাসভা ভবনে গিয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করল। ঐ খানেই তার থাকার ব্যবস্থা হল। সাতজন চক্রান্তকারীই ১৯ তারিখে দিল্লি পৌঁছে গেছে। ওরা সকলে চাঁদনিচকে মদনলালের হোটেলে মিলিত হয়ে আরও পরামর্শ করল। ওদের সঙ্গে গ্রেনেড আর গানকটন স্ল্যাব তো ছিলই ইতিমধ্যে ওরা তুটো রিভলভারও যোগাড় করেছে।

গোপাল যখন মধ্যপ্রাচ্যে ছিল তখন সে একটা মিলিটারি রিভলভার সংগ্রহ করেছিল আর অপরটা শর্মার কাছ থেকে বাদগে চেয়ে এনেছিল। বাদগেই ওটা শর্মাকে বিক্রি করেছিল।

২০ জানুয়ারি সকালে আপতে, বাদগে, করকরে আর শংকর বিড়লা হাউসে গেল। ঘটনাস্থলটা আগে উত্তমরূপে দেখে রাখা দরকার। বিড়লা হাউস যে রাস্তার উপর অবস্থিত তখন তার নাম ছিল অ্যালবুকার্ক রোড বর্তমান নাম ত্রিশ জানুয়ারি মার্গ, গান্ধীজীর হত্যার তারিখটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে।

বিড়লা হাউসের প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা বসত। মূল বাড়ি থেকে কিছুদূরে ছিল ভৃত্যদের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের পিছন দিকে একটি বারান্দা ছিল আর এই বারান্দার সামনে একটি বড় চত্বর তৈরি করা হয়েছিল। এই চত্বরে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হত।

বারান্দার ছাদের নীচে একটা কাঠের তক্তাপোষের ওপর গান্ধীজী বসতেন। গান্ধীজী যেখানে বসতেন তার পিছনে একটা দেওয়াল ছিল। এই দেওয়ালে জাফরিকাটা একটা জানালো ছিল যা দিয়ে ভেতরের ঘরে হাওয়া চলাচল করত। জাফরির ফোকরগুলি বেশ বড় ছিল, হাত গলিয়ে গ্রেনেড ছোঁড়া যেতে পারত, রিভলভার গলিয়ে গুলি ছোঁড়াও কঠিন নয়।

বিড়লা ভবনের পিছন দিকেও একটা গেট ছিল। যারা নিয়মিত প্রার্থনা সভায় আসত তারা এই গেট দিয়েই ঢুকত। ঐ চারজন চক্রান্তকারীও এই পিছনের গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকল। ওরা গান্ধীজীর বসবার আসনটি দেখল, পিছনে জাফরিকাটা জানালাটিও লক্ষ্য করল।

ওদের ইচ্ছে ঘরের ভেতরে ঢুকে একবার দেখে কিন্তু ঘরের সামনে দরজায় একজন কানা লোক বসেছিল অতএব ঘরের ভেতরে ঢোকা যায় না। ওরা তখন ঘুরে পিছনের বারান্দায় গেল এবং গান্ধীজীর আসনের পিছনে জাফরিকাটা জানালাটি ভাল করে দেখল। তখন সেদিকে কেউ ছিল না। আপতে একটি দড়ি দিয়ে ফোকরগুলির মাপ নিল। এই জাফরিকাটা জানালা দিয়েই ওরা কাজ ফতে করবে।

ওরা এইরকম প্ল্যান করল: প্রার্থনাসভা যখন চলতে থাকবে তখন উপযুক্ত সময়ে নাথুরাম এবং আপতে কাজ আরম্ভ করার সংকেত দেবে।

বাদগের কাছে থাকবে একটি রিভলভার এবং একটি গ্রেনেড। জাফরির ফোকরের ভেতর দিয়ে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীর ছবি তোলবার ছল করে সে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে

পিছনের গেটের কাছে মদনলাল গান-কটন স্ল্যাব ফাটাবে, লোকে ভয় পেয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করবে, একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে আর সেই গোলমালের সুযোগ নিয়ে বাদগে প্রথমে গান্ধীজীকে গুলি করবে তারপর গান্ধীজীর দিকেই গ্রেনেড ছুঁড়বে।

সামনের দিকে থাকবে শংকর। সেও সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে গান্ধীজীকে গুলি করবে এবং পরে গ্রেনেড ছুঁড়বে। কোনো দিকে যেন না ফসকায়।

গোপাল গড়সে, মদনলাল এবং করকরের কাছেও বোমা থাকবে এবং ওরাও বোমা ছুঁড়বে তারপর যে যেদিকে বা যেভাবে পারবে পালাবে।

বাদগে আর গোপাল গড়সে যে রিভলভার এনেছিল সে দুটি তখনও পরীক্ষা করা হয়নি। বাদগের রিভলভারটি পুরনো। শর্মা নামে তার এক খরিদ্দারকে সেটি সে বিক্রি করেছিল। বাদগে সেটি এখন শর্মার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। গোপালেরটি মিলিটারি রিভলভার, দীর্ঘদিন ব্যবহার হয় নি। কয়েক বছর এমনি পড়েই ছিল।

বিড়লা ভবন তদারক করে ওরা চারজন রিভলভার দুটি নিয়ে হিন্দু মহাসভা অফিসের অদূরে একটি জঙ্গলে গেল। দেখা গেল যে গোপালের রিভলভারের চেম্বার জাম হয়ে গেছে। বাদগের আনা রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়া হল কিন্তু সেইগুলি লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাল না।

নিজের রিভলভারটি মেরামত করবার জন্যে তেল আর একটি ছুরি আনবার জন্যে শংকরকে গোপাল মহাসভা অফিসে পাঠাল। শংকর ফিরে আসবার পর গোপল যখন রিভলভার মেরামত করছে তখন একজন ফরেস্ট গার্ড এসে হাজির। পায়ের আওয়াজ পেয়েই ওরা রিভলভার দুটি লুকিয়ে ফেলেছিল।

মদনলাল গুরমুখি ভাষায় কি কথা বলে ফরেস্ট গার্ডকে কি বোঝালো কে জানে সে চলে গেল। তারপর ওরা অস্ত্র দুটি মেরামত করে নিল কিন্তু সেদিন আর গুলি ছুঁড়ে পরীক্ষা করা হল না।

সেদিন দুপুরে মেরিনা হোটেলে শেষবারের মতো পরামর্শ বৈঠক বসল। সকলে একবার কাল্পনিক ভাবে রিহার্সাল দিয়ে নিল।

নাথুরাম শুয়ে ছিল। তার ভীষণ মাথা ধরেছিল। নাথুরাম ওদের সতর্ক করে দিল, বিফল হলে চলবে না। সুযোগ বার বার আসবে না। সব ঠিকঠাক করে নাও। প্রার্থনাসভায় দরকার হলে ডাকবার জন্যে ওদের প্রত্যেকের একটা করে ডাকনাম দেওয়া হল। ওরা জামাকাপড় বদলাল। কয়করে একটু ছদ্মবেশ ধারণ করল, একটা গোঁফ আঁকল, ভুরুজোড়া ঘন করল, কপালে সিঁদুরের টিপ পরল, যেন একজন ভক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ।

সেদিন প্রার্থনাসভায় বেশ ভিড় হয়েছিল। কারণ গান্ধীজীর অনশনের পর এইটি প্রথম প্রার্থনাসভা। সেদিন আবার বৈদ্যুতিক গোলমালের জন্যে মাইক্রোফোন ও অ্যামপ্লিফায়ার বিকল হয়ে গেল। গান্ধীজীর কণ্ঠস্বর কেবল কাছের লোকেরাই শুনতে পাচ্ছিল।

তখন ডাক্তার সুশীলা নায়ার উঠে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর ভাষণ উচ্চস্বরে দূরের লোকদের শুনিয়ে দিচ্ছিলেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী দিল্লিবাসীদের প্রশংসা করে বলছিলেন যে তিনি পাকিস্তানে যাবেন এবং সেখানে অমুসলমানদের ওপর যাতে অত্যাচার না হয় সেজন্যে তিনি চেষ্টা করবেন।

আর ঠিক সেই সময়েই দম্ শব্দ করে বোমা ফাটল। কিছু জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল না, কিছু লোক সরে বসল মাত্র। উল্লেখযোগ্য কোনো গোলমাল হল না।

গান্ধীজী সকলকে শান্ত হয়ে বসতে বললেন। গান্ধীজীর কাছে যারা বসেছিল তারা জানতেই পারল না বোমা কোথায় ফেটেছে। গান্ধীজী নিজে মনে করেছিলেন মিলিটারিরা কোথাও হয়ত কিছু অভ্যাস করছে।

পরে জানা গেল যে পিছন দিকের গেটের কাছে একজন বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাবী যুবক গান-কটন স্ল্যাব ফাটিয়েছে, কেউ জখম হয় নি। যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কোটের পকেটে একটি

হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছিল। যুবকের নাম জানা গেছে। তার নাম মদনলাল পাওয়া। সে একজন শরণার্থী, মাথা গরম, বিক্ষোভ জানাবার জন্যে বোমা ফাটিয়েছে।

সেদিনের অর্থাৎ ২০ তারিখের প্ল্যান ফেল করল। ওরা সাতজন বিড়লা হাউসে নিজ নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়েছিল। কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হলেও মদনলালের বোমা ঠিক সময়েই ফেটেছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাদগে তার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

গান্ধীজীর পিছনে ঘরটির দরজায় দু'জন লোক বসেছিল। এদের মধ্যে সকালের দেখা সেই কানা লোকটি একজন। কানা লোক দর্শন অর্থাৎ যাত্রা খারাপ অতএব বাদগে সাব্যস্ত করল যে সে যদি ঘরে ঢোকেও এবং গুলি ছোঁড়ে ও বোমা ফাটায় তাহলেও সে ঘর থেকে বেরোতে পারবে না, পলায়ন অসম্ভব। সে ধরা পড়বেই পড়বে।

সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ হয়। বাদগে কিছুতেই ঘরে ঢুকতে রাজি হয় না। অতএব প্ল্যান পরিত্যাগ করতে হবে নাকি? তা হয় না। এত তোড়জোড়, এতদূর থেকে এসে শেষে কি তীরে তরী ডুববে? তা হয় না। মদনলাল বোমা ফাটাক, তারপর দেখা যাক কি হয়। বোমা ফাটলে নিশ্চয় সকলে পালাবার জন্যে ছুটাছুটি করবে আর সেই সুযোগে যা করবার করা যাবে।

মদনলাল বোমা ফাটিয়েছিল কিন্তু কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টিই হয় নি। কাজ তো হলই না উল্টে মদনলাল ধরা পড়ে গেল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। প্ল্যান সত্যি সত্যিই বানচাল হয়ে গেল।

রাস্তায় প্রথমেই যে টাঙ্গাটা পাওয়া গেল তাতেই চেপে বাদগে এবং শংকর, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা এই বাক্য স্মরণ করে সরে পড়ল। তারপর হিন্দু মহাসভা অফিস থেকে নিজেদের পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে রাত্রের ট্রেনে পুনা চলে গেল।

নাথুরাম গড়সে আর নারায়ণ আপতে কানপুর চলে গেল।

কানপুরে একদিন কাটিয়ে ওরা বম্বে যাত্রা করল। বম্বেতে ওরা পৌঁছল ২৩ জানুয়ারি।

গোপাল গড়সে আর বিষ্ণু করকরে সেই রাত্রে অন্য একটা হোটেলে উঠল। গোপাল নাম লেখাল জি এম শাস্ত্রী আর করকরে লেখাল রাজগোপালন। ২১ তারিখে ওরা দুজন পুনা যাত্রা করল। ওরা সকলে মুষড়ে পড়ল। প্ল্যান তো বানচাল হলই কিন্তু মদনলাল যে ধরা পড়ে গেল। চাপে পড়ে সে কিছু বলে ফেলতে পারে। আবার যদি অ্যাটেম্পট নিতে হয় তাহলে এখনই, দেরি হলেই বিপদের সম্ভাবনা।

নানারকম আলাপ আলোচনা হল কিন্তু কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হল না তখন নাথুরাম বলল কাউকে কিছু করতে হবে না, যা করবার সে একাই করবে। সমস্ত দায়িত্ব তার একার। নাথুরাম বলল এই হল সব চেয়ে ভাল পথ। সে নিশ্চয় কাজ হাসিল করবে।

বম্বের কাছে থানা শহরতলীতে নাথুরাম আর আপতের সঙ্গে ২৬ জানুয়ারি তারিখে করকরের কথাবার্তা হয়েছিল। নাথুরামের নিজস্ব প্ল্যানের বিষয় করকরে তার বিবৃতিতে পুলিসের কাছে যা বলেছিল তা নীচে দেওয়া হল :—

আমরা হাঁটতে হাঁটতে থানা রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছলুম। গুডস ইয়ার্ডের কাছে সিমেন্ট করা প্ল্যাটফরমের ওপর আমরা বসে পড়লুম। রাত্রি প্রায় পৌনে দশটা, জ্যোৎস্না রাত্রি। পরামর্শের জন্যে নাথুরাম আর আপতে জায়গাটা ঠিক করেছিল। নির্জন, কথা শোনবার লোক নেই। বসবার পর আমি আপতে আর গড়সেকে জিজ্ঞাসা করলুন ওরা দিল্লি থেকে ২০ তারিখের পর কি করে ফিরল।

গড়সে গম্ভীর, বলল ওসব কথা আলোচনা করবার এখন সময় নেই। চূড়ান্ত প্ল্যানটা আমাদের এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা খুবই জরুরী, মদনলাল ধরা পড়েছে। সে যদি আমাদের নাম বলে দেয়, তাহলে আমরা গ্রেফতার হব এবং গান্ধীকে

আর হত্যা করা যাবে না। কাজের জন্যে আমি সঙ্গে লোক নিতে চাই না কারণ এরকম কাজ অনেকেই একলা করেছে, কেউ সঙ্গী ছিল না, যেমন মদনলাল ধিংড়া বা বাসুদেবরাও গোগেট, ওরা একাই কাজ হাসিল করেছিল অতএব নাথুরাম বলল যে সে একাই গান্ধীজীকে হত্যা করবে।

সে আমাকে বলল যে ইচ্ছা করলে আমি আমেদনগরে চলে যেতে পারি এবং সেখানে হিন্দু মহাসভার কাজ করতে পারি। সে আরও বলল যে হিন্দু রাষ্ট্র প্রকাশমের শেয়ার বিক্রিতে আমি যেন মনোযোগ দিই এবং আপতের জায়গায় যেন একজন ভাল লেখকের সন্ধান করি।

এই প্রস্তাব শুনে আমি অবাক হলুম। আপতে কেন? আপতে কোনো কথা বলল না। তাহলে আপতে গড়সের মতলব জানে। আপতে তাহলে নাথুরামের পাশে দাঁড়িয়েছে, তার বিপদের ঝুঁকি সেও ভাগ করে নেবে।

আমি তখন নাথুরামকে জিজ্ঞাসা করলুম: তুমি তাহলে মরবার জন্যে প্রস্তুত। আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে নাথুরাম বলল আমি যেন আমার কাজে মন দিই।

আমি তারপর নাথুরামকে জিজ্ঞাসা করলুম সে কিভাবে গান্ধীজীকে হত্যা করবে? নাথুরাম বলল যে দুএক দিনের মধ্যেই সে একটা রিভলভার পাবে এবং না পেলে সে যেভাবে পারে গান্ধীজীকে হত্যা করবে এবং একাজ শেষ না করে সে মহারাষ্ট্রে আর ফিরবে না।

আমি বললুম যে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমিও তার সঙ্গে থাকতে চাই, আমিও একাজে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি। আমি শুনলুম বাদগে আর শংকর পুনায় ফিরে এসেছে এবং তাদের কাজকর্ম করছে। আপতে পুনা গিয়েছিল এবং বিলি ব্যবস্থা করে সে ফিরে এসেছে। তাহলে আমি একা পড়ে থাকব কেন, আমি বললুম, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। তখন আপতে

আমাকে তিনশ টাকা দিয়ে পরদিন দিল্লি যেতে বলল।
নাথুরাম এবং নারায়ণ আপতে তখন ছদ্মনামে বম্বের এক হোটেলে বাস করছিল। ওরা দুজনে নাম নিয়েছিল ভি বিনায়করাও এবং ডি বিনায়করাও। দিল্লিগামী সকালের প্লেনে ওরা ২৫ তারিখে ঐ ভি ও ডি বিনায়করাও নামে ২৭ তারিখের জন্যে দুটো সিট বুক করেছিল।
গড়সে এবং আপতে যা আশংকা করছিল তাই হল। পুলিস ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান কাজ আরম্ভ করেছে। মদনলাল পুলিসকে হয়তো কিছু বলেছে কিন্তু অনুসন্ধান সেই সূত্র ধরে নয়। বর্তমান অনুসন্ধানের উৎস হলেন বম্বের রামনারায়ণ রুইয়া কলেজের অধ্যাপক ডঃ জে সি জৈন।
রিফিউজি হিসেবে মদনলাল একদা উক্ত অধ্যাপককে বলে যে সে কোনো কাজ চায়। ডঃ জৈন ছিলেন হিন্দি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং কয়েকখানি বইয়ের গ্রন্থকার। তিনি মদনলালকে তার বইগুলি বেচতে বলেন, এজন্যে তিনি মদনলালকে কমিশন দিতে রাজি হন। এই বই বিক্রির সূত্রে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়।
মদনলাল ভীষণ আবেগপ্রবণ। অনেক সময় হতাশ হয়ে অনেক কথা বলে ফেলত, নেতাদের কঠোর সমালোচনা করত, তাদের গালাগালিও দিত। আমেদনগরে কোনো এক মিটিংএ রাও সাহেব পটবর্ধন হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিল, এজন্যে মদনলাল রাও সাহেবকে প্রহার করেছিল। একথা সে গর্ব করেই বলেছিল। পুলিস তাকে কিছু বলে নি কারণ তারাও তো হিন্দুদের মঙ্গল চায়। হিন্দু বিশেষ করে হিন্দু রিফিউজিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মদনলাল একটা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছিল।
জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ডঃ জৈনকে মদনলাল বলে যে একজন বড় নেতাকে খুন করবার চেষ্টা চলছে। চাপাচাপি করতে মদনলাল গান্ধীজীর নাম বলে।
ডঃ জৈন তখন মদনলালের কথার গুরুত্ব দেন নি। তিনি মদনলালকে

শান্ত করেন এবং কিছু উপদেশ দেন কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে মদনলাল যা বলছে তা রাগের মাথায় বলছে।

কিন্তু দিল্লিতে বিড়লা হাউসে প্রার্থনা সভায় ২০ তারিখের ঘটনা খবরের কাগজে পড়ে জৈন বোঝেন যে মদনলাল তো বাজে কথা বলে নি। মদনলাল নিজেই তো বোমা ফাটিয়েছে।

সেই সময় হোম মিনিস্টার সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল এবং বম্বে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এস কে পাটিল বম্বেতে ছিলেন। ডঃ জৈন ওদের দুজনকেই টেলিফোন করেন কিন্তু ওঁদের টেলিফোনে না পেয়ে তিনি বম্বের চিফ মিনিস্টার শ্রীবি জি খেরকে টেলিফোনে মদনলালের কথা বলেন। বম্বের তদানীন্তন হোম মিনিস্টার শ্রীমোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে ডঃ জৈন কথা বলেন এবং মদনলাল তাকে যা বলেছিল সে সবই বলেন। কোথাও না কোথাও একটা চক্রান্ত চলছে। তখন পুলিস মদনলালের সঙ্গী চক্রান্তকারীদের ধরবার জন্যে ব্যাপক অনুসন্ধান আরম্ভ করে।

গড়সে ও আপতে ২৭ জানুয়ারি তারিখ বেলা ১২-৪০ টায় দিল্লি পৌঁছয়। ঐ দিনই তারা গোয়ালিয়র যায়। গোয়ালিয়রে পৌঁছয় রাত্রি ১০-৪০ টায়। স্টেশন থেকে একটা টাঙ্গায় চেপে ওরা ডাক্তার পরচুরের বাড়ি যায়। রাত্রিটা পরচুরের বাড়িতেই থাকে।

পরচুরের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্য হল ভাল একটা পিস্তল সংগ্রহ করা যা থেকে ঠিকঠিক গুলি বেরোবে। ডাক্তার পরচুরের একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। বাহিনীর একজন সেচ্ছাসেবক গোয়েলের কাছ থেকে একটা ভাল পিস্তল পাওয়া গেল। পিস্তল নিয়ে গড়সে ও আপতে পরদিন রাত্রে, ২৮ তারিখে দিল্লি ফিরল। ওল্ড দিল্লি রেলস্টেশনে ওরা রাত্রিটা কাটাল।

এদিকে করকরে ট্রেনে ২৮ তারিখে দিল্লি পৌঁচেছে এবং আগের কথা অনুযায়ী ২৯ তারিখ দুপুরে বিড়লা মন্দিরের গেটে গড়সে ও আপতের সঙ্গে করকরে দেখা করল। গড়সে বলল

গোয়ালিয়রে একটা ভাল পিস্তল পাওয়া গেছে, এবার কাজ হাঁসিল হবে। গড়সে বেশ গম্ভীর এবং কেন সে বিপদের সব ঝুঁকি ও দায়দায়িত্ব একা নিচ্ছে সে বিষয়ে বিষ্ণু করকরেকে বুঝিয়ে বলল। সে বলল—

আপতের সংসার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে আছে—সে কেন আমার সঙ্গে মরতে যাবে? আমার সংসার নেই, দায়-দায়িত্বও নেই তাছাড়া আমি একজন লেখক ও বক্তা, আমি যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গান্ধীজীকে হত্যা করেছি সেকথা আমি সরকারকে বুঝিয়ে বলতে পারব। আমার অবর্তমানে আপতে হিন্দু রাষ্ট্র কাগজ চালাতে পারবে তবে তুমি তাকে সাহায্য কোরো এবং হিন্দু মহাসভার কাজও কোরো।

সন্ধ্যা বেলায় করকরে প্রস্তাব করল যে কালকের দিনটা তো চরম উত্তেজনার দিন তার চেয়ে চল আমরা একটু সিনেমায় গিয়ে মনটা হালকা করে নিই। গড়সে রাজি হল না। সে একখানা ডিটেকটিভ বই পড়তে আরম্ভ করল। করকরে আর আপতে প্রথম যে সিনেমা পেল সেটাতেই ঢুকল।

৩০ জানুয়ারি। নাথুরাম গড়সে নিজের মনকে প্রস্তুত করে ফেলেছে। সকালে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে করকরে ও আপতেকে ডেকে দিল। তারপর তিনজনে কিছু জলখাবার খেয়ে টাঙ্গা ভাড়া করে নয়া দিল্লিতে এল। সেখান থেকে ওরা গেল একটা জঙ্গলে। সেখানে গড়সে পিস্তল থেকে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে পিস্তলটা পরীক্ষা করে নিল। একটা উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে করকরে তখন পাহারা দিচ্ছিল। গড়সে সন্তুষ্ট, পিস্তলটা সত্যিই ভাল। ওরা ওখান থেকে পুরনো দিল্লিতে ফিরে এল।

দুপুর বেলায় গড়সে বেশি কথা বলল না। এক সময় করকরেকে বলল আমাদের আর দেখা হবে না। কি উদ্দেশ্যে বলল কে জানে! ভগবানের প্রার্থনাসভায় গমনোদ্যত জাতির জনক অহিংসার পূজারী সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র। হিন্দু মুসলিমের মধ্যে মিলন সেতুর

জন্য আত্মনিয়োগকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় নিরীহ এক মহাপুরুষকে হত্যা করবার জন্যে নাথুরাম গড়সে তখন কৃতসংকল্প।

বিকেল সাড়ে চারটের সময় একটা টাঙ্গা ভাড়া করে বন্ধুদের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে নাথুরাম বিড়লা হাউসের দিকে যাত্রা করল। একটু পরে করকরে এবং আপতেও বিড়লা হাউসে পৌঁছল।

প্রার্থনা সভা তখনও আরম্ভ হয় নি। শ দুয়েক লোক জমা হয়েছে। সকলে গান্ধীজীর জন্যে অপেক্ষা করছে। গান্ধীজীর আসতে আজ একটু দেরি হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে নাথুরাম গড়সেও মিশে গেল। একটু পরেই জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে গান্ধীজীর জন্যে রাস্তা করে দিতে লাগল।

মানু আর আভা, দুই নাতনির কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজী এগিয়ে আসছেন। মাঝে মাঝে দু হাত জোড় করে নমস্কার করছেন। হঠাৎ নাথুরাম গড়সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে গান্ধীজীর সামনে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর ডান দিকের মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রায় গান্ধীজীর দেহে রিভলবার ঠেকিয়ে তিনবার গুলি করল।

'হে রাম' বলে গান্ধীজী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন্। চারদিকে দারুণ চাঞ্চল্য, বিশৃংখলা, পা থেকে চপ্পল খুলে গেল, চোখ থেকে চশমা ছিটকে পড়ল। গান্ধীজীকে ধরাধরি করে বিড়লা হাউসের ভেতর নিয়ে যাওয়া হল এবং অল্পক্ষণ পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ইদানিং গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় সাধারণতঃ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টাররা আসত না কিন্তু সেদিন রয়টারের একজন রিপোর্টার ঘুরতে ঘুরতে বিড়লা হাউসে এসেছিল।

দুঃসংবাদটা রয়টারই প্রথম জগৎবাসীকে জানিয়ে দেয়। সমস্ত সংবাদপত্রের অফিসে টেলিপ্রিণ্টারে যে খবর খটাখট করে মুদ্রিত হচ্ছিল সে খবর থেমে গিয়ে টেলিপ্রিণ্টারের কাগজে ভেসে উঠল :

ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ

গান্ধীজী শট অ্যাট

রিপিট গান্ধীজী শট অ্যাট

কয়েক সেকেণ্ড পরে

ডক্টর হ্যাজ বিন সামনড

ডক্টর হ্যাজ বিন সামনড

আবার কয়েক সেকেণ্ড পরে

গান্ধীজী ডেড

গান্ধীজী ডেড

এদিকে নাথুরাম পালাবার চেষ্টা করে নি। জনতার কেউ তার রিভলভারটি কেড়ে নিয়েছিল। নাথুরাম তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, রিভলভারে এখনও গুলি আছে, সাবধানে ধরো, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।

জনতার হাতে লাঞ্ছিত হবার আগেই একজন পুলিস অফিসার এসে তাকে গ্রেফতার করে। জনতার মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তারা বিহ্বল, সেই সুযোগে আপতে ও করকরে ওল্ড দিল্লি স্টেশনে পৌঁছল এবং প্রথম ট্রেনেই বম্বে ফিরল।

সারা দেশ জুড়ে খানাতল্লাসি আরম্ভ হয়ে গেল। ডঃ জৈনের কাছে মদনলাল যা বলেছিল তা আর উড়িয়ে দেবার মতো নয়। চক্রান্ত একটা হয়েছিল। চক্রান্তকারীরা আজ মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে।

২০ তারিখে বোমা ফাটার পর সরকার প্রার্থনা সভায় রক্ষী নিয়োগ করবার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু গান্ধীজী স্বয়ং বাধা দিয়েছিলেন।

পুনায় ৩১ তারিখে বাদগে গ্রেফতার হল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্রুভার হতে রাজি হল। গোপাল গড়সে গ্রেফতার হল ৫ ফেব্রুয়ারি এবং ঐ দিনই গোয়ালিয়রে ডাক্তার পরচুরেকেও গ্রেফতার করা হল। শংকর কিস্তায়া গ্রেফতার হল ৬ ফেব্রুয়ারি, করকরে এবং আপতে গ্রেফতার হল ১৪ ফেব্রুয়ারি।

দীর্ঘ সময় ধরে ও কঠোরভাবে আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা চলল। আসামীরা প্রত্যেকেই দীর্ঘ বিবৃতি দিল। আসামীদের ছাড়া বহু ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং সমস্ত বিবৃতি জুড়ে জুড়ে ষড়যন্ত্রের একটা চিত্র দাঁড় করানো সম্ভব হল।

বিচারের সময় আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থনে জোর দিতে পারে নি। নিজেদের নির্দোষ বলেও তারা স্বীকারোক্তি করেছিল এবং তাদের সাজা দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল।

নাথুরাম গড়সে বলেছিল হ্যাঁ সে গান্ধীজীকে গুলি করেছে এবং এজন্যে সে একা দায়ী। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কারও কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সে স্বীকার করেছিল যে সে ও আপতে ১৭ জানুয়ারি প্লেনে দিল্লি এসেছিল এবং পরে ২৭ তারিখেও এসেছে এবং দুইবারই ছদ্মনামে। ছদ্মনামে থাকলেও এই হোটেলে 'এন ভি জি' চিহ্নিত নাথুরামের একটি শার্ট পরে পুলিস পেয়েছিল যেটি লনড্রিতে কাচতে দেওয়া হয়েছিল। দুজনে ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি দিল্লির মেরিনা হোটেলে ছদ্মনামে থেকেছিল। নাথুরাম আরও বলল যে ওরা দুজনে গোয়ালিয়রে ডাক্তার পরচুরের বাড়ি গিয়েছিল এবং দিল্লি রেলস্টেশনে রিটায়ারিং রুমের অ্যাটেণ্ডান্টের কাছে নিজেদের আসল নাম বলে নি।

গড়সে যা বলেছিল আপতেও অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছিল। দুজনের বিবৃতিতে গরমিল ছিল না। দুজনের একত্রে দিল্লি আগমন, মেরিনা হোটেলে ছদ্মনামে বাস, গোয়ালিয়রে ডাক্তার পরচুরের বাড়ি গমন, বেনামে ওল্ড দিল্লি রেলস্টেশনে রিটায়ারিং রুমে রাত্রি যাপন, সবই বলেছিল।

বিষ্ণু করকরে স্বীকার করেছিল যে ১৭ তারিখে সে ও মদনলাল দিল্লি এসেছিল। শরিফ হোটেলে বি এন ব্যার্স ছদ্মনামে ছিল কিন্তু পুনরায় দিল্লি আসা এবং গান্ধীজী হত্যার দিন দিল্লিতে থাকার কথা সে অস্বীকার করে। কোনোরূপ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

নিম্ন আদালতে শংকর কিস্তায়া বলে যে সে যা কিছু করেছে এসব তার মনিবের আদেশে করেছে। তার বিবৃতির দ্বারা তার মনিব দিগম্বর বাদগের স্বীকারোক্তিও সমর্থিত হয় কিন্তু পরে শংকর বলে যে সে যা কিছু বলেছে সবই পুলিস তাকে বলতে বাধ্য করেছে কিন্তু প্রমাণিত হয়েছিল যে পুলিস কোনোরকম বল প্রয়োগ করে নি। আদালতে কেস চলবার সময় সে তার আগেকার বিবৃতি প্রত্যাহার করে। পুলিস বলপ্রয়োগ করলে তো আদালতে কেস ওঠবার আগেই করত কিন্তু তা করা হয় নি। মনে হয় অন্যান্য আসামীদের চাপে পড়ে বা পরামর্শে শংকর কিস্তায়া পূর্ব বিবৃতি প্রত্যাহার করবার চেষ্টা করেছিল।

গোপাল গড়সে সবই অস্বীকার করে, কোনোরকম ষড়যন্ত্রের বিষয় সে কিছু জানে না, ১৮ বা ২০ জানুয়ারি তারিখে সে দিল্লিতে হাজির ছিল না।

মদনলাল বলে যে তারা দিল্লিতে আসার উদ্দেশ্য হল তখন শরণার্থী-দের প্রতি যে অবিচার করা হচ্ছিল তার প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন। এইজন্যই সে বোমা ফাটিয়েছিল কিন্তু কারও যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল।

ডাক্তার পরচুরে স্বীকার করে যে গড়সে ও আপতে তার কাছে গোয়ালিয়রে এসেছিল ঠিকই। দিল্লিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা তার কাছ থেকে কিছু স্বেচ্ছাসেবক চেয়েছিল কিন্তু ডাক্তার পরচুরে তাদের অনুরোধ সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। পিস্তল দেওয়ার কথাও পরচুরে অস্বীকার করেন।

আসামী পক্ষ থেকে মোটমাট বলা হয় যে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র করা হয় নি। প্রার্থনাসভায়, ২০ তারিখে বোমা বিস্ফোরণ এবং ৩০ তারিখে গান্ধীজীকে হত্যা, মদনলাল ও নাথুরাম গড়সের ব্যক্তিগত কাজ। তাদের যুক্তির সমর্থনে আসামীরা কোনো সাক্ষী হাজির করে নি। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তারা খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছিল।

নিম্ন আদালত সবারকারকে মুক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু বাকি সাতজন আসামীর বিরুদ্ধে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত বলে রায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসামীরা বলেছিল যে ২০ তারিখে বোমা বিস্ফোরণের জন্যে মদনলাল একা এবং ৩০ তারিখে গান্ধীজীকে হত্যার জন্যে নাথুরাম একা দায়ী। অপর আসামীরা উক্ত দুজন আসামীর মতলব সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

কিন্তু আসামীরা নিজেরাই যে স্বীকারোক্তি করেছিল তাতেই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে এবং ষড়যন্ত্র প্রমাণিতও হয়েছে। তারা পরস্পর বিরোধী অনেক উক্তি করেছে এবং জেরার সময় অন্য কথাও বলেছে।

আসামীরা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে অন্য যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের সকল কথা জজসাহেবরা বিশ্বাস করেন নি। ট্যাকসি ড্রাইভার, টাঙ্গা চালক, হোটেলবয়, জুতো পালিস ইত্যাদির সকল বাক্যই আদালত গ্রহণ করে নি তথাপি গান্ধীজীকে হত্যার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং সেই ষড়যন্ত্র সফল করার উদ্দেশ্যে নাথুরাম গডসে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তা নইলে ২০ তারিখের পূর্বে সাতজন আসামীই দিল্লি ফিরে যাবে কেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেনামে হোটেলে থাকবে কেন? এক জন ব্যতীত সকলে ঘটনার সময় বিড়লা হাউসে হাজির থাকবে কেন?

বাদগে হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিয়ে দিল্লি এল কেন? এবং সকল আসামীই সহসা একযোগে দিল্লি ত্যাগ করল কেন? এগুলি কাকতালীয়বৎ ঘটনা নয়। বি এম ব্যাস নামে কর্ককরে কি উদ্দেশ্যে বম্বে থেকে পুনায় আপতেকে টেলিগ্রাম করে, দুজনকে অর্থাৎ আপতে ও গড়সেকে বম্বে আসতে বলেছিল কি উদ্দেশ্যে? সকলে যে একযোগে এবং একই উদ্দেশ্যে কাজ করছিল তা বিশ্বাস

করবার কারণ রয়েছে।

পরচুরে ও শংকরকে হাইকোর্ট মুক্তি (বেনিফিট অফ ডাউট) দেন কিন্তু নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আসামীদের দণ্ড বহাল রাখেন।

নাথুরাম গড়সে দয়া ভিক্ষা করে নি তবে কেন সে গান্ধীজীকে হত্যা করল তার যুক্তিস্বরূপ সে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিল। তার মতে মূল কারণ হল গান্ধীজীর তোষণ নীতি ও পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে ভারত সরকাকে বাধ্য করা।

প্রথমে মামলাটি সে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলে তারপর কেন এবং কি উদ্দেশ্যে ও কি জন্য সে গান্ধীজিকে হত্যা করে সে কথাও সে বলে। বিবৃতি শেষ করতে নাথুরাম বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়েছিল। তার সেই বিবৃতি থেকে হুবহু নকল তুলে দেওয়া হল :—

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম তাই বাল্যকাল থেকেই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ইতিহাস এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু ধর্মের প্রতি আমি প্রগাঢ়ভাবে অনুরাগী। তৎসত্ত্বেও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিলুম, কোনো রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি আমার গোঁড়ামি ছিল না। এই জন্যেই আমি জন্মগত জাতিভেদ প্রথা ও ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছি। প্রকাশ্যভাবেই আমি জাতিভেদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছি। জন্মসূত্রে নয়, ছোট হক, বড় হক, উচ্চবর্ণের হক বা নিম্নশ্রেণীর হক, হিন্দু মাত্রেই সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তার অধিকার থাকবে, জাতি হিসেবে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। এই জন্যেই জাতিভেদ প্রথা বিরোধী যেসব সর্বজনীন পংক্তিভোজের আয়োজন করা হত, যাতে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চামার এবং ভাঙ্গি হিন্দুরা একত্রে আহার করত সেখানে আমিও যোগ দিতুম। জাতিভেদ প্রথা আমি মানি না। সকলের সঙ্গেই আমি একাসনে আহার করেছি যদিও আমি নিজে ব্রাহ্মণ। দাদাভাই নওরজি, বিবেকানন্দ, গোখলে, টিলকের রচনাবলী এবং

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সমেত কয়েকটি প্রধান দেশ যথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং রাশিয়ার ইতিহাস আমি পাঠ করেছি। শুধু তাই নয় আমি মোটামুটি ভাবে সমাজবাদী ও কমিউনিজম সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল। কিন্তু সর্বোপরি আমি বীর সবারকর এবং গান্ধীজী যা লিখেছেন ও বলেছেন তা গভীরভাবে অনুধাবন করেছি কারণ গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বর্তমান ভারতের চিন্তাধারায় ও কাজে এই দুজনের আদর্শবাদ প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে যা আর কোনো মতবাদ পারে নি।

এই সমস্ত রচনা ও চিন্তধারা উপলব্ধি করে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে দেশ ও মানবপ্রেমিক হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য হল হিন্দু ও হিন্দুত্বের সেবা করা। কারণ এটা কি সত্য নয় যে পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ত্রিশ কোটি নরনারীর স্বাধীনতা অর্জন করা আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তাদের স্বার্থের প্রতি আমাদের অবহিত হওয়া জাতীয় কর্তব্য? এই বিশ্বাসই আমাকে স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাণিত করল নব হিন্দু সংগঠনে যোগ দিয়ে তাদের আদর্শ ও অনুষ্ঠানসূচী অনুসরণ করতে কারণ আমার ধারণা যে আমার মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা এর দ্বারাই অর্জন করা যাবে এবং দেশমাতার প্রতি সেবাও করা যাবে।

নোয়াখালিতে ১৯৪৬ সালে যখন সুরাবর্দীর সরকারী বদান্যতায় হিন্দুদের ওপর মুসলিম আক্রমণ আরম্ভ হল তখন আমাদের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা রইল না যখন আমরা দেখলুম যে গান্ধীজী সেই সুরাবর্দিকে আশ্রয় দিতে এগিয়ে এসেছেন এবং তিনি তাঁর প্রার্থনা সভায় তাকে শহীদ (!) সাহেব বলে সম্বোধন করছেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজী দিল্লিতে এসে একটি ভাঙ্গি কলোনির হিন্দু মন্দিরে প্রার্থনা সভায় প্রার্থনার অঙ্গরূপে কোরান পাঠ করছেন এবং সেখানে সমবেত হিন্দু ভক্তদের আপত্তি সত্ত্বেও। অবশ্য তিনি মুসলমানদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে মসজিদে

গীতা পাঠ করতে সাহস করেন নি। সহনশীল হিন্দুদের মনোবেদনা তিনি এইভাবে পদদলিত করতে পারলেন। হিন্দুরা যে সবকিছু সহ্য করতে প্রস্তুত নয় এবং তার সম্মান যখন অপমানিত তখন গান্ধীজীর কাছে আমি প্রতিবাদ জানাতে সংকল্প গ্রহণ করলুম। তারাও অপমানের প্রতিশোধ নিতে জানে।

এরপরই মুসলিম অন্ধ গোঁড়ামি পাঞ্জাব এবং ভারতের অন্যান্য অংশে নির্লজ্জভাবে ফেটে পড়ল, তারা আক্রমণ করল। বিহার কলকাতা, পঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশে যেসব হিন্দুরা সাহস করে এই আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করছিল, কংগ্রেস সরকার তাদের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগল, আদালতে তাদের অভিযুক্ত করতে আরম্ভ করল এমন কি গুলি করে তাদের হত্যা করতে লাগল। আমরা দেখলুম যে আমাদের নিদারুণ আশংকা সত্যে পরিণত হতে চলেছে এবং এটা কতদূর বেদনাদায়ক ও অপমানজনক যে সারা পঞ্জাবে মুসলমানরা যখন আগুন জ্বালাচ্ছে আর হিন্দুদের রক্তে নদী বয়ে যাচ্ছে তখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মহাসমারোহে ও আলোর বন্যায় প্রতিফলিত হল। আমার মতাবলম্বী হিন্দুসভা স্থির করল যে তারা এই উৎসব বর্জন করবে এবং মুসলমানদের এই আক্রমণাত্মক অভিযান রুখতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

পাঁচ কোটি মুসলমান আমাদের দেশবাসী হতে পারল না, তারা বঞ্চিত হল আর পশ্চিম পাকিস্তানের অ-মুসলমান সংখ্যালঘুরা? হয় তাদের হত্যা করা হল কিংবা তাদের প্রাচীন বাসভূমি থেকে তাদের সমূলে উৎপাটিত করা হল আর অনুরূপ প্রতিহিংসা নেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানেও। এইভাবে প্রায় সওয়া দশ কোটি নরনারীকে যার মধ্যে মুসলমান ছিল অন্তত চল্লিশ লক্ষ, তাদের বাসভূমি থেকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হল এবং এর পরও গান্ধীজী তাঁর তোষণনীতি থেকে বিরত হলেন না অতএব আবার রক্ত গরম হয়ে

উঠল এবং আমি তাঁকে আর সহ্য করতে পারলুম না। ব্যক্তিগতভাবে আমি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর মতামত প্রকাশ করতে চাই না অথচ তাঁর মূলনীতি সমর্থন করতেও আমি প্রস্তুত নই। ইংরেজের চিরকালের নীতি ছিল 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল', বস্তুতঃ গান্ধীজীই- এই নীতিকে কার্যকরী করলেন। দেশ ভাগ করতে ইংরেজদের গান্ধীজীই সাহায্য করলেন এবং ইংরেজ শাসন যে আজও শেষ হয়েছে এ কথাও বলতে পারি না।

বত্রিশ বৎসরব্যাপী মুসলমান প্রীতি যার চরম পরিণতি হল তাদের অনুকূলে গান্ধীজীর আমরণ অনশন সংকল্প—আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলল এবং আমি স্থির করলুম যে গান্ধীজির অস্তিত্ব লোপ করতে হবে। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি এমনই একটা বৈষয়িক মানসিকতা গড়ে তুললেন যেন ন্যায় বা অন্যায় স্থির করার বিচারক একমাত্র তিনি স্বয়ং। দেশ যদি তাকে নেতা বলে স্বীকার করতে চায় তাহলে তাঁর দুর্বলতাও মেনে নিতে হবে আর দেশবাসী যদি তাতে রাজি না হয় তাহলে কংগ্রেস থেকে তিনি সরে দাঁড়াবেনএবং নিজের পথে চলবেন। মনোবৃত্তি যেখানে এইরকম সেখানে কোনো আপস চলে না, সেখানে কংগ্রেসকে তাঁর সমস্ত খামখেয়ালিপনা ও মরচেধরা নীতি মেনে নিতে হবে অথবা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকের এবং প্রতি বিষয়ের তিনিই একমাত্র বিচারক, আইন অমান্য আন্দোলনের পশ্চাতে তিনিই একমাত্র সবজান্তা ব্যক্তি, এই আন্দোলনের কৌশল তাঁরই হাতের মুঠোয় এবং তিনি একাই জানেন এই আন্দোলন কখন আরম্ভ করতে হবে এবং থামাতে হবে। আন্দোলন সফল হতে পারে, বিফলও হতে পারে, হয়ত প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটতে পারে কিংবা রাজনীতিক ভাবেও অসফল হতে পারে কিন্তু মহাত্মাজীর বিফলতায় এতে কিছু যায় আসে না। "সত্যাগ্রহী কখনও পরাজিত হয় না", নিজের বিফলতা ঢাকতে এই ছিল তাঁর আহ্বান এবং কে যে সত্যাগ্রহী তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। তাই নিজের ব্যাপারেও

তিনিই পরামর্শদাতা, তিনিই বিচারক। তবে তাঁর এই শিশুসুলভ একগুঁয়েমি, সরল জীবনযাপন, বিরামহীন কর্মজীবন ও দৃঢ় চরিত্র তাঁকে অপ্রতিরোধ্য মর্যাদা দান করেছিল। অনেক ব্যক্তি তাঁর রাজনীতি অযৌক্তীক মনে করতেন কিন্তু তখন তাঁদের বিচারবুদ্ধিকে হয় গান্ধীজীর পায়ে বিক্রয় করতে হত কিংবা তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে হত। আমি বলব গান্ধীজী চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন যার ফলে ভুলের পর ভুল, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা, ধ্বংসের পর ধ্বংস। তাঁর তেত্রিশ বছরের রাজনীতিক শাসনকালে এমন একটিও সাফল্য লাভ হয় নি যার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া যেতে পারে।

যতদিন গান্ধীবাদ চলতে থাকবে ব্যর্থতা হবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যে কোনো বিপ্লবাত্মক প্রস্তাব, যে কোনো সংস্কারের আমূল পরিবর্তন বা নতুন কোনো কার্যধারা তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং চরকা, অহিংসনীতি ও সত্যবাদীতা একমাত্র পথ বলে মনে করেছেন। গান্ধীজী চৌত্রিশ বছর ধরে চরকা চালাবার চেষ্টা করেছেন ফলে হয়েছে কি মেসিন-চালিত বস্ত্র শিল্প শতকরা ২০০ ভাগ বেড়ে গেছে। এক শতাংশ ব্যক্তিরও বস্ত্র যোগাতে পারে না চরকা। আর অহিংস-নীতি? চল্লিশ কোটি মানুষ এই উচ্চস্তরের জীবন বেছে নেবে এমন আশা করা যায় না এবং সেই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করল বিয়াল্লিশের আন্দোলন। আর সত্যবাদীতা সম্বন্ধে এই কথা বলতে পারি যে যারা নিজেদের কংগ্রেসী বলে পরিচয় দেয় তাদের চেয়ে রাস্তার একজন সাধারণ মানুষ অনেক বেশি সত্য কথা বলে। বস্তুতঃ কংগ্রেসীরা সত্য বলে না, সত্য বলার ছল করে মাত্র।

গান্ধীজীর বিবেক, অধ্যাত্মবাদ এবং তাঁর অহিংসনীতি সবকিছু মিঃ জিন্নার দৃঢ় মনোবলের সম্মুখে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেগুলি একেবারেই শক্তিহীন প্রমাণিত হল। গান্ধীজী জানতেন যে তাঁর অধ্যাত্মবাদ জিন্নাকে স্বমতে আনতে পারবে না, সেক্ষেত্রে তাঁর উচিত

ছিল নীতির পরিবর্তন করা অথবা হার স্বীকার ক'রে নিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী কারও উপর ভার দেওয়া, যে মিঃ জিন্না ও মুসলিম লিগের মোকাবিলা করতে পারবে। জাতির স্বার্থেও তিনি তাঁর অহংভাব ত্যাগ করতে পারেন নি। অতএব হিমালয়প্রমাণ ভুল যে হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

আমাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চেনে তারা জানে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা কিন্তু যখন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতারা দেশ ভাগ করে সর্বনাশ ডেকে আনল যে দেশ আমাদের কাছে দেবীমূর্তিতুল্য, তখন আমার মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি চিন্তা ক'রে দেখলুম যে আমি যদি গান্ধীজীকে হত্যা করি তাহলে আমার চরম সর্বনাশ হবে। আমাকে সকলে ঘৃণা করবে, অপমান করবে। কিন্তু আমি এ চিন্তাও করলুম গান্ধী বিনা ভারতের রাজনীতি নতুন মোড় নেবে, অনেক বেশি সচল হবে এবং ঢিলের বদলে ঢিল ছুঁড়তে পারবে এবং তার যে সামরিক বাহিনী রয়েছে তা তাকে শক্তিশালী করবে। আমার ভবিষ্যত অবশ্যই নষ্ট হবে কিন্তু পাকিস্তানের আক্রমণ ভীতি থেকে দেশ বাঁচবে। জনসাধারণ মনে করবে আমি মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, উন্মাদ কিন্তু যুক্তি-বাদের ভিত্তিতে দেশ তার পথ খুঁজে পাবে এবং গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। সবদিক উত্তমরূপে চিন্তা করে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম কিন্তু কাউকে কিছুই বললুম না। আমি আমার উভয় হস্তে সাহস সঞ্চার ক'রে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখ বিড়লা গ্রাউণ্ডে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীকে গুলি করলুম।

আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। নিজের দেশের প্রতি আনুগত্য যদি পাপ হয় তবে আমি সেই পাপ স্বীকার করে নিচ্ছি। আর তার যদি কোনো গুণ থাকে তাহলে নম্রচিত্তে তাও আমি দাবি করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষ প্রতিষ্ঠিত বিচারালয় ব্যতীত যদি আর কোনো বিচারালয় থাকে তবে আমার এই কাজ সেই বিচারালয়ে

অন্যায় বিবেচিত হবে না। এমন যদি কোনো বিচারালয় থাকে যেখানে মৃত্যুর পর পৌঁছান যায় না তাহলেও আমার দুঃখ নেই। আমি যা করেছি তা মানবের কল্যাণের জন্যেই করেছি। যে ব্যক্তির কার্যাবলী হিন্দুদের ধ্বংস ডেকে এনেছে তাব প্রতিই আমার গুলি বর্ষিত হয়েছে।

ভগবানের কাছে আমার শেষ প্রার্থনা এই, যে-দেশ হিন্দুস্তান নামে পরিচিত সেই দেশ আবার এক হক, মানুষ পরাজিতের মনোভাব দূর করুক এবং অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করার সাহস সঞ্চয় করুক। বিভিন্ন দিক থেকে আমার কাজেব যে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে সেজন্যে আমি মোটেই বিচলিত নই আমি আমার বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হই নি। ভবিষ্যতে কোনো ঐতিহাসিক আমার কাজেব সঠিক মূল্যায়ণ করবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই কারণ এ সম্বন্ধে অনেক বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড়ে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী যুবকদের সঙ্গে সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সেনার যুদ্ধ, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ এবং আরও কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ প্রচুর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ঐ বিদ্রোহের নায়ক নায়িকারাও আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছেন।

অতএব মাস্টারদা সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, নির্মলচন্দ্র সেন ইত্যাদি আরও অনেকের বিষয় আমরা লিখব না কারণ বর্তমান প্রবন্ধের তা উদ্দেশ্য না।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত মামলা ও বিচার কাহিনী নিবেদন করবার চেষ্টা করব। সেই সময়ে সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য ও আসামীপক্ষ সমর্থক কৌঁসুলীদের সওয়ালের অংশ আমরা পরপর সাজিয়ে দোব। সম্পূর্ণ বিচার কাহিনী ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী লিখতে হলে একাধিক বই লিখতে হবে।

মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল যুব বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল আমরা সেই তারিখ থেকেই আরম্ভ করছি।

চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদল কর্তৃক সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত: রেল লাইন উৎপাটিত ও তার ছিন্ন: ৭ জন বিদ্রোহীর গুলিতে নিহত: কলিকাতা হইতে বহু সৈন্য প্রেরণ।

কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল—বাংলা সরকার এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—গভর্নমেন্ট অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে, একশতজন বিদ্রোহী দলবদ্ধ

হইয়া ১৮।১৯শে এপ্রিল রাত্রিতে চট্টগ্রাম রেলের পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। পূর্ণ বিবরণ এখনও কিছুই জানা যায় নাই। যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে একজন সার্জেন্ট মেজর, একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ৪ জন ভারতীয়কে বিদ্রোহীরা গুলি মারিয়া খুন করিয়াছে।

অন্য খবরে জানা যায় যে সকল সিভিলিয়ান রেল কর্মচারী, স্ত্রীলোক ও শিশুকে জেটিতে লইয়া গিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ ও অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। লেপ্টেনাণ্ট কর্নেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে একদল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল আজ সকালে চট্টগ্রাম যাত্রা করিয়াছে। তাহারা রবিবার ২০শে এপ্রিল সকালে চট্টগ্রাম পৌঁছিবে। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলও ঐ সঙ্গে গিয়াছেন।

টেলিগ্রাফ চলাচলে বাধা পড়িয়াছিল। কিন্তু পরে লাইন ঠিক করা হয়। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রাম হইতে ৪০ মাইল দূরে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত করা হইয়াছিল। রেল লাইন বন্ধ হইয়াছে। তবে যাত্রী ও মালপত্র অন্য গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বিদ্রোহীরাই রেল লাইনচ্যুত করিয়াছে কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বর্ণনা: ৭ জন নিহত। কলিকাতা ১৯শে এপ্রিল, চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গত রাত্রির দাঙ্গা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। গতকল্য রাত্রি ১০টায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তাহার পূর্বে কোনরূপভাবে সতর্ক করা হয় নাই। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; অকজিলিয়ারী ফোর্স ও পুলিশের অস্ত্রাগার লুন্ঠিত হইয়াছে।

অকজিলিয়ারী ফোর্সের নিকট ৯০টি রাইফেল ও ২০৩টি লুইসগান ছিল। আক্রমণকারীরা পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে। ৬০টির অধিক এখন আর ব্যবহার করা চলে না। আক্রমণকারীদের সঙ্গে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র ও বহু রিভলবার ছিল। আক্রমণকারীদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন—তাহাদের সংখ্যা একশত বলিয়া অনুমিত

হয়। সকলেই চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া আছে। সশস্ত্র পুলিশ তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মোট মৃতের সংখ্যা এইরূপ ঃ ২ জন শ্বেতাঙ্গ, ২ জন কনষ্টেবল ও ৩জন ট্যাক্সিচালক। তাহা ছাড়া কয়েকজন আহত। শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও শিশুদের ষ্টীমারে চড়াইয়া দিয়া তাহাদের পুরুষগণ কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে ৩০ মাইল দূরে রেলের লাইন খুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল সৈন্যদল তথায় গিয়া পৌঁছিলে অবস্থা ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়।

গভর্নরের প্রত্যাবর্তন ঃ কলিকাতা ১৯শে এপ্রিল। বাংলার গভর্নর একজিকিউটিভ কাউন্সিলের ২টি সভা করিবার পর গত রাত্রিতে কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাত্রা করিয়াছিলেন। শিলিগুড়িতে ই, বি, রেলের কর্মচারীদের নিকট হইতে চট্টগ্রামে হাঙ্গামার খবর পাইয়া তিনি তখন কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। আজ বিকালে তিনি কলিকাতা ফিরিয়াছেন।

চট্টগ্রাম হাঙ্গামায় বড়লাটের চাঞ্চল্য। নয়াদিল্লী, ১৯শে এপ্রিল ঃ আজ বড়লাটের কার্যকরী কাউন্সিলের এক জরুরী সভায় চট্টগ্রামে হাঙ্গামা, বাঙ্গালার ও অন্যান্য স্থানের অবস্থা, পুলিশ ও মিলিটারীর ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। চট্টগ্রামের হাঙ্গামা বিস্তৃতি লাভ করে নাই বলিয়াই মনে হয়। দেশের সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। [বঙ্গবাণী ২০-৪-৩০]

পাহাড়ে জঙ্গলে ৮ ঘণ্টাকাল ব্যর্থ অন্বেষণ ঃ পুলিশ ইন্সপেক্টার জেনারেলের রিপোর্ট।

২০শে তারিখে বাঙ্গলার পুলিশ ইন্সপেক্টার জেনারেল চট্টগ্রাম হইতে নিম্নলিখিত রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন ঃ—

চট্টগ্রামের উত্তরের পাহাড়গুলি ৮ ঘণ্টাকাল অন্বেষণের পর এইমাত্র ফিরিলাম। একেবারে পার্বত্যদেশ, তায় গভীর জঙ্গল, খোঁজ করা বড় সহজ নয়। ডাকাত দলকে ধরিতে পারি নাই। পুলিশের চেষ্টায় ব্যাজ, ব্যাণ্ডেজ, পেট্রল প্রভৃতির কাগজের মোড়কের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয়,

তাহারা এই দিক দিয়াই গিয়াছে। কাল সকালে পাহাড়ে পুনরায় খোঁজ করিব। রাত্রে আর কোন গোলযোগ হয় নাই। আক্রমণকারীদের এখনও পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ম্যাজিস্ট্রেটের মোটরে ৯ বার গুলি বর্ষণ ঃ গত শুক্রবার রাত্রে একদল লোক সরকারী অস্ত্রাগার লুঠ করায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীগণ টেলিফোন এবং কলিকাতা ও ঢাকা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয় এবং ধূম ও জোরারগঞ্জের মধ্যবর্তী রেল লাইন ভাঙ্গিয়া দেয়। ফলে একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ াকে।

...সংবাদ পাওয়া মাত্রই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু পথেই আক্রমণকারীগণ তাঁহার মোটর আক্রমণ করে। তাহার মোটরের উপর নাকি ৯ বার গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল। একজন কনস্টেবল নিহত ও চালক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করেন।

যতদূর জানা যায়, ২জন শ্বেতাঙ্গ ও ৯জন ভারতীয় নিহত হইয়াছে। অনেক লোক আহত অবস্থায় সেনট্রাল হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল ও রেলওয়ে হাসপাতালে আছে। শহরের কয়েকটি স্থানে কয়েকখানি মোটর পাওয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীদল এইগুলি ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করে। সে রাত্রে শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা ও শিশুদের পাহাড়তলী কারখানায় নিরাপদে রাখা হয়। আক্রমকারীগণ নির্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছে। এখনও পর্যন্ত তাহাদের পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

শহরে গুর্খা সৈন্য ঃ এই কাণ্ডে শহরে যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। রাত্রি ৯টার পর হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত কাহাকেও বাহিবে আসিতে দেওয়া হয় নাই।

নানাস্থান হইতে একদল গুর্খা সৈন্য আনা হইয়াছে। রাত্রে শহরে সশস্ত্র পাহারা বসানো হইয়াছে। গতকল্য টেলিগ্রাফ লাইন সংস্কার করা হইয়াছে এবং টেলিফোন লাইনও আংশিকভাবে সংস্কার করা হইয়াছে।

বহু লোকের বাড়ি খানাতল্লাস করা হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বন্দুক পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ কোনরূপ সংবাদ সরবরাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের একজনের মুখ পুড়িয়া গিয়াছে এবং আরও একজনের ক্ষতচিহ্ন আছে। [বঙ্গবাণী ২২-৪-৩০]

পাহাড়ে খানাতল্লাসের আয়োজন স্পেশাল ট্রেনে সৈন্য প্রেরণ। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে অনেকগুলি বাড়ি খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে খানাতল্লাসের জন্য একটি স্পেশাল ট্রেনে একদল সৈন্য হাটহাজারী যাত্রা করিয়াছে।

···আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার জানাইয়াছেন, রাত্রি ৯ ৩৭ মিনিটে যে মেল ট্রেন ছাড়ে, তাহাতে চট্টগ্রাম হইতে কোন যাত্রী লওয়া হইবে না। রাত্রির গাড়িগুলি ঘনটায় ১৫ মাইল বেগে যায়। এখনো টেলিফোন লাইন সম্পূর্ণ সারানো হয় নাই। নতুন এক্সচেঞ্জ বসাইতে বহু টাকা ব্যয় হইবে।

বিপ্লবপন্থীদের কার্য কেবল শহর ও রেল লাইনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐ রাত্রে বহু গ্রামে বিপ্লবী ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছিল।

[বঙ্গবাণী ২৩-৪-৩০]

সৈন্যদলের ব্যর্থ অনুসন্ধানঃ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী নিকটবর্তী পাহড়তলী তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের কোন সন্ধান পায় নাই। গুর্খা সেনাদল সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে মেশিন গান লইয়া পাহাড়গুলি পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতেছে। বিদ্রোহীরা বিশেষ বিচারবুদ্ধি সহকারে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিল বলিয়া শোনা যাইতেছে। প্রকাশ, তাহাদের মধ্যে একদল ড্রাইভারদিগকে ক্লোরোফরম যোগে অজ্ঞান করিয়া কতকগুলি মোটর হস্তগত করে এবং তাহাদিগকে সেই অবস্থায় তাহাদের ঘরের মধ্যে আটক করিয়া রাখে।

তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যের পোষাক পরিধান করিয়াছিল এবং অন্যান্য সকলের পরিধানে খাঁকি হাফপ্যান্ট ছিল। জলের কলের

সুপারিটেনডেনট মেশিনগান চালাইয়া বিদ্রোহীদিগকে দূরে রাখিতে শ্বেতাঙ্গদিগকে সাহায্য করেন।

......পরবর্তী সংবাদ প্রকাশ, ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার সেনাদল চট্টগ্রামের নকটবর্তী একটি পাহাড়ে একদল বিদ্রোহীকে ঘিবিয়াছে।

বিদ্রোহীদেব সহিত খণ্ডযুদ্ধ অনুমান ১২জন নিহত ঃ চট্টগ্রামেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানাইয়াছেন, অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৪জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কিন্তু প্রধানদলের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

একদল পাহাড়েব এক সুবক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছে। গত ২২শে তাবিখে ইহাদেব সহিত সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস দলের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুমান ১২জন আক্রমণকাবী নিহত হইয়াছে। সবকারী সৈন্যদলের কহ নিহত হয় নাই।

২৩শে প্রত্যুষে ফেনীতে একখানি ট্রেনে ৪জনকে চট্টগ্রাম কাণ্ডেব সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় এবং খানাতল্লাসের জন্য অ্যাসিস্ট্যানট স্টেশন মাস্টারের অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। খানাতল্লাস আরম্ভ হইলে তাহাবা বিভলবাব বাহির করিয়া ১জন পুলিস দারোগা, ২জন কনস্টেবল, একজন টিকিট কালেক্টব ও ১জন চৌকিদারকে আহত কবিয়া পলায়ন করে। পুলিশ একটি রিভলবার পাইয়াছে।

১০ জন বিদ্রোহী নিহত ঃ চট্টগ্রাম, ২৩শে এপ্রিল ঃ—পরবর্তী বিবরণে প্রকাশ, পাহাড়ে সৈন্যদলের সহিত সংগ্রামে ১০ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে। তাহাদের মৃতদেহ এখনও শহরে আনা হয় নাই। কেবল একজন আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

সৈন্যদল অন্যান্য বিদ্রোহীদের অনুসবণ করিয়া চলিতেছে। তাহারা আরও দূব অঞ্চলে সরিয়া পড়িতেছে। আরও একদল সৈন্য আজ আসিয়া পৌছিয়াছে এবং সন্দেহজনক স্থানে কড়া পাহারা চলিতেছে। চট্টগ্রাম নাজির হাট লাইনে যাত্রী লওয়া হইতেছে না। একখানি মেশিনগান নাকি ঘটনাস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজন

হইতে পারে বলিয়া ৪০খানি ট্যাক্সিও আনা হইয়াছে।

বহু যুবক গ্রেপ্তার ঃ পুলিশ চন্দনপুরার মোক্তার চন্দ্রকুমার সেনের বাড়ি হইতে তাঁহার পুত্র শ্রীমান হিমাংশু সেনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীমান জে এম সেন স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। তাহার মুখ ও শরীরের বিভিন্ন স্থান পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তৎসঙ্গে বাবু চন্দ্রকুমার দস্তিদারের পুত্র অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তামাকুমাণ্ডতে উকীল রজনীরঞ্জন বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

শনিবার বৈকালে সদর ঘাটের বাবু সারদাপ্রসন্ন গুহের পুত্র শ্রীমান অর্দ্ধেন্দু গুহকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গতকল্য রবিবার আর ২জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া বেজায় গুজব। অপরাহ্ণে যোগেন্দ্র (মনা) গুপ্ত মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গুর্খা আমদানী ঃ গতকল্য রবিবার শহরে গুর্খা সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। সংবাদ লইয়া জানা গেল প্রায় ১৫০ জন গুর্খা স্পেশাল ট্রেনে ঢাকা হইতে আমদানী করা হইয়াছে। পরের গাড়ীতে আরও ৩০জন আসিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

[বঙ্গবাণী ২৪-৪-৩০]

রেঙ্গুন মেল আটক ঃ গত শনিবার বেলা ১২টায় রেঙ্গুন মেল প্যাসেঞ্জার লইয়া চট্টগ্রাম জেটীতে আসে, কিন্তু ঐ দিন ষ্টিমার জেটীতে ভিড়ান হয় নাই। পরদিন রবিবার বেলা ৭/৮ টার সময় ষ্টিমার জেটীতে ভিড়ান হয়।

[দৈনিক জ্যোতি ঃ চট্টগ্রাম]

বিলোনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ ঃ কুমিল্লা ২৪শে এপ্রিল, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য হইতে প্রায় একশত পুলিশ বিলোনিয়া মহকুমার পাহাড়ের দিকে চট্টগ্রামের ব্যাপারে লিপ্ত বিদ্রোহীগণকে ধরার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। [বঙ্গবাণী ২৭-৪-৩০]

এখনও মফঃস্বলে সন্ধান ঃ চট্টগ্রাম ২৬শে এপ্রিল, ক্যাপ্টেন জনস্টনের নেতৃত্বে আসাম রাইফেলের ২টি প্লেটুন আজ এখানে আসিয়া

পৌঁছিয়াছে। এখনও জেলার নানাস্থানে পুলিশ কাজ করিতেছে। আর নূতন কোন সংবাদ নাই।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তার ঃ চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২৬শে এপ্রিল কলিকাতায় বাঙ্গলা সরকারের নিকট খবর দিয়াছে,—অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। আসাম রাইফেলের দুটি প্লেটুন আজ সকালে চট্টগ্রামে আসিয়াছে।

চট্টগ্রাম হাঙ্গামায় ২১জন ধৃত বি এ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বন্ধ ঃ এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম হাঙ্গামা সম্বন্ধে ২১জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ছাত্র ১৬জন—তিনজন বি এ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবার অনুমোদন লাভ করেন নাই, যদিও তাহাদের প্রিন্সিপাল চট্টগ্রামের কমিশনারের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, জেলের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হউক।

সাব ইন্সপেক্টার যতীন্দ্রনাথ রায় এবং আরও কয়েকজন কনস্টেবল —যাহারা সম্প্রতি গুলিবিদ্ধ হইয়া আহত হইয়াছিল—ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছে। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্যন্ত অপরাধীদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। [বঙ্গবাণী ২৮ ৪-৩০]

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তারের ধুম ঃ চট্টগ্রাম ২৯শে এপ্রিল, আক্রমণকারীদের প্রথম দলের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাদের গতিবিধিও অজ্ঞাত। গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস চলিতেছে। রাত্রি ৯টার পর রাস্তায় বাহির হওয়া সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে।

আক্রমণকারীদের সন্ধানার্থ বিমানপোত ঃ চট্টগ্রাম ৩০শে এপ্রিল ঃ পাহাড় অঞ্চলে ঘুরিয়া আক্রমণকারীদের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অদ্য একটি বিমানপোত আসিয়াছে। আর একটি বালককে দগ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, সে অদ্য জেলা হাসপাতালে মারা গিয়াছে; ইহাকে লইয়া এখনও পর্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা ২৩ হইল।

চট্টগ্রাম পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান মিঃ লিসম্যান বলেন, বিদ্রোহীরা চট্টগ্রাম ক্লাব ও ইয়োরোপীয় নাগরিকগণকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। জনৈক নিহত বিদ্রোহীর পকেটে চট্টগ্রাম

ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের নক্সা ছিল। সুর্মাভ্যালী লাইট হর্স সৈন্যদল প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ও গুর্খা সৈন্যদল শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। [বঙ্গবাণী ১-৫-৩০]

চট্টগ্রামে খানাতল্লাস : চট্টগ্রাম ১লা জুলাই, গতকাল শহরে বহুসংখ্যক বাড়িতে খানাতল্লাস হইয়াছে। ১জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ সুবোধচন্দ্র চৌধুরী, সহায়রাম দাস ও মোক্তার চন্দ্রকুমার সেনের একটি পুত্র মহকুমা হাকিমের নিকট একারার করিয়াছে।

অস্ত্রাগার লুঠের মামলা মুলতুবী : চট্টগ্রাম ২রা জুলাই, পুলিশ এখনও কাগজপত্র তৈয়ার করিতে না পারায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা ১৬ই জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। ট্রাইবিউনালের সদস্যগণের নাম এখনও জানা যায় নাই।

অনন্ত সিং গত রবিবার কলিকাতায় পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া আর কোন পলাতক আসামীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আজ সকালে চট্টগ্রাম শহরের উপর একখানি উড়োজাহাজ ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। এখনও সাঁজোয়া গাড়ি পাহারা দেয়।

প্রসিদ্ধ উকিল রঞ্জনলাল সেনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র রজত সেন কালারপোলের নিকট নিহত হন। এই মামলা জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংএর পিতা গোপালবাবুকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই মামলার পলাতক আসামী শ্রীমান আনন্দ গুপ্তের পিতা মনাবাবুকেও জামিনে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অনন্তবাবু স্বয়ং ধরা দিয়াছেন। অপর আসামীদের জন্য গভর্নমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যহ খানাতল্লাস হইতেছে। ফকীর সেন নামক জনৈক আসামী রাজসাক্ষী হইবে বলিয়া প্রকাশ। [বঙ্গবাণী ১০-৭-৩০]

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা : আগামী ১৬ই জুলাই জেলের ভিতর একটি বিশেষ আদালতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে। প্রকাশ, এই আদালতে থাকিবেন চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ জে

ইউনি, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ এবং পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর আব্দুল হাই। সরকার পক্ষে থাকিবে প্রায় ৩৫০ জন। সরকারী কৌঁসুলী খান-বাহাদুর আব্বাস সত্তার সরকার পক্ষে মামলা চালাইবেন। জেলের মধ্যেই বিচারকার্য চলিবে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা: আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল। হাজতে আবদ্ধ আসামীগণ:—

নিম্নলিখিত আসামীগণকে হাজতে রাখা হইয়াছে। অনন্ত সিং ধীরেন্দ্র দস্তিদার, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ বিশ্বাস, সহায়রাম দাস, নিতাই পদ ঘোষ, সুবোধ চৌধুরী, অশ্বিনী চৌধুরী, সুখেন্দু দস্তিদার, হেরম্ব বল, শান্তি নাগ, ফকির সেন, নন্দ সিং, রণধীর দাশগুপ্ত, ননীগোপাল দেব, আশুতোষ ভট্টাচার্য, মলিন ঘোষ, লালমোহন সেন, অনিলবন্ধু দাস এবং সুবোধ রায়।

নিম্নলিখিত আসামীগণ জামীনে মুক্ত আছেন:—শ্রীপতি চৌধুরী, বিনয়কুমার সেন, অর্ধেন্দু গুহ, গোপাল সিং (উকিল), যোগেন্দ্র—ওরফে মোনা গুপ্ত, বঞ্জনলাল সেন, অনিল রক্ষিত, সুবোধ বল মধু বসু।

ফেরারী আসামীগণ:—নিম্নলিখিত ফেরারী আসামীগণের বিরুদ্ধেও চার্জসীট দাখিল করা হইয়াছে:

আনন্দ গুপ্ত, সরোজকান্তি গুহ, হেমেন্দ্র দস্তিদার, জীবন ঘোষ, লোক-নাথ বল, নির্মলচন্দ্র সেন কালীপদ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র দে, কৃষ্ণ চৌধুরী, সূর্যকুমার সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী হরিপদ মহাজন, বিনোদ দত্ত, ভবতোষ ভট্টাচার্য, তারকেশ্বর দস্তিদার দীপ্তিমেধা চৌধুরী, ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, নারায়ণ সেন, সীতারাম বিশ্বাস, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, সুরেশ দেব, বিনোদ চৌধুরী।

নিহতগণের তালিকা: চট্টগ্রাম হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী রামগড় রোডের নিকটবর্তী জালালাবাদ পার্বত্য অঞ্চলে ২২শে এপ্রিলের সংঘর্ষে নিম্নলিখিতগণ মারা গিয়াছে:—

নরেশচন্দ্র রায় (ময়মনসিং) ত্রিপুরা সেন (ঢাকা) বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (কুমিল্লা) হরিগোপাল বল, মতি কানুনগো, প্রভাস বল, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিনবিকাশ ঘোষ ও শশাঙ্ক দত্ত। এতদ্ব্যতীত অপর একজনকে সনাক্ত করা যায় নাই।

অর্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদে আহত হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়। অমরেন্দ্র নন্দী সদরঘাটে (চট্টগ্রাম) আত্মহত্যা করে।

৭ই মে কোলগাঁওয়ে (কালারপোল) নিম্নলিখিত ক'জন মারা যায় : রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায় (ফরিদপুর) মনোরঞ্জন সেন (চট্টগ্রাম)। জালালাবাদ ও কোলগাঁওয়ে যে ১৫ জন মারা যায়, তাহাদের ফটো রাখিয়া তাহাদের শব পরে পোড়ান হয়।

এই মামলায় প্রায় ৩৪৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইবে। তন্মধ্যে পুলিশ লাইনের ৯ জন, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ভলান্টিয়ার্স রাইফেল সেনাবাহিনীর ১১ জন এবং টেলিফোন অফিসের ৬ জনের সাক্ষ্য লওয়া হইবে।

বিচারালয়ের ব্যবস্থা : ঠিক বেলা ১২ টার সময় জজগণ আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আসামীর পক্ষ হইতে ৪৬জন ব্যবহারজীবী উপস্থিত হন। আসামীদিগকে বিভিন্ন দলে কড়া পাহারায় বিচারালয়ে আনয়ন করা হয়। আসামী ফকীব সেন এপ্রুভার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহাকে অপরাপর আসামীদের হইতে স্বতন্ত্র রাখা হয়।

অনন্ত সিং জজদিগকে বলে, মামলার শুনানীতে সে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক নহে ; সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেও চাহেনা। অনিলবন্ধুও আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না।

মিঃ এন, আর দাশগুপ্ত ব্যবহারজীবীগণ কর্তৃক বিচার গৃহের প্রবেশ দ্বারে টিকেট প্রদর্শনের ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—উহা অবমাননাকর। উহা দ্বারা বিচারালয় অভিনয় গৃহে পরিণত হয়। তিনি জানান যে, আগামীকল্য হইতে তিনি টিকেট দেখাইবেন না। জজগণ বলেন, ব্যবহারজীবীদের নির্বিঘ্নতার জন্য উহার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যাহারা ভালরূপে পরিচিত তাঁহাদের টিকেট না দেখাইলেও

চলিবে।

চট্টগ্রামে বিপ্লববাদ আন্দোলনের ইতিহাস : বঙ্গবাণী ২৬-৭-৩০। অগ্ন বিশেষ আদালতে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে সরকারী উকিল প্রথমে চট্টগ্রামে বিপ্লববাদী দলের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে বিগত ১৯১৪ সালে সতেন্দ্র সেনের হত্যায় চট্টগ্রামে বিপ্লববাদীদলের অস্তিত্বের প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর ১৯২৩ সালে পাবাইকোবা ডাকাতিতে উহাব অস্তিত্বের দ্বিতীয়বার পবিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৪ সাল এবং ১৯২৩ সালেব মধ্যবর্ত্তী কাল বিপ্লববাদমূলক কার্যেব প্রবলভাবে আয়োজন স্থাপিত হয়। বর্তমান অস্ত্রাগাব লুণ্ঠন ব্যাপার উক্ত বিপ্লববাদ মূলক কার্যাবলীর এক অংশ মাত্র।

অতপর তিনি নোয়াপাডাব ডাকাতি হইতে আবম্ভ কাবিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন দ্বন্দ্ব, সুখেন্দুবিকাশ প্রভৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। দলের ধন-ভাণ্ডাবেব সাহায্যে একখানি মোটরগাড়ী ক্রয় করা হইল। ইহাদের পরবর্তী কার্য দ্বাবা বুঝা যাইতেছে যে দলের লোকদিগকে মোটরগাড়ী চালনায় শিক্ষিত কবাই মোটরগাড়ী ক্রয়েব উদ্দেশ্য। বিপ্লববাদীরা নিবঞ্জন সেনের বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত পুষ্করিণীব ধাবে বন্দুকের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ শিখিত। এই সময়ে দলের অন্যান্য লোকেরা ট্রেন ধ্বংস করিবাব এবং টেলিগ্রাফের তাব কাটিবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিতে আবম্ভ কবে। তাহার পর দলের নেতারা দলের জন্য আরও লোক সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে জেলার সর্বত্র সমিতি স্থাপনে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করে এবং তাহাতে সফলও হয়। তাহারা খাঁকি শার্ট ও প্যাণ্ট পরিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের মতো সজ্জা করিত। সেনাদলের কর্মচারী-দের মতো ব্যাজ সংগ্রহ করিয়াছিল। উহারা বড় হাতুড়ী ও অন্যান্য যন্ত্র, বন্দুক, টর্চলাইট ও কার্তুজ সংগ্রহ করিয়াছিল। রাসায়ণিকের নিকট হইতে ক্লোরোফর্ম্ম (পটাশিয়াম ক্লোরেট ?) সংগ্রহ করিয়া বোমাও প্রস্তুত করিয়াছিল।

ইহার পর তিনি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিবৃত্ত সমস্ত বর্ণনা করেন। তাহারা ক্ষিপ্রগতিতে ৪০।৫০ জন মোটর হইতে অবতরণ করিয়া ভলান্টিয়ার রাইফেল সৈন্যদলের অনেককে গুলী মারিয়া হত্যা করে, তাহার পর অস্ত্রাগারের দরজা ভাঙ্গিয়া অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ ওয়াকার ও তাহার সহকারীকে হত্যা করে এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া যায়। এ সকল ঘটনাও তিনি একে একে বর্ণনা করেন।

লুণ্ঠনকারীদের পলায়নের বিষয় বর্ণনা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। পরে ঐ দিনের জন্য মামলা মুলতুবী থাকে—ফ্রী প্রেস।

(শুক্রবারের শুনানী) চট্টগ্রাম ২৫শে জুলাই। অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হয়। সৈন্যদলের হেডকোয়ার্টার্স ও পুলিশ লাইন কিরূপে এককালে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং চট্টগ্রামকে পৃথিবীর অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কিরূপে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে হইতে ফিসপ্লেট স্থানান্তরিত ও টেলিগ্রাফের তার কর্তিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য সরকারী উকিল বিভিন্ন আসামীর স্বীকারোক্তির উল্লেখ করেন।

আক্রমণের পর আসামীদের গতিবিধি এবং জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশের সহিত বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ ও তাহার ফলে দশজন বিদ্রোহীর মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী উকিল বর্ণনা করেন। দুইজন মুমূর্ষু আসামী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যেভাবে জবানবন্দী করিয়াছিল তাহারও তিনি উল্লেখ করেন। ঐ দুইজন আসামী পরে মারা যায়।

অতঃপর সরকারী উকিল বলেন, সহরে খানাতল্লাসকালে পুলিশ মিঃ যোগেশ গুপ্তের কন্যা জ্যোৎস্নার লিখিত একখানি চিঠি পায়। চিঠিখানিতে জ্যোৎস্না তাহার ভাইদের সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিল। তাহার এক ভাই নিহত হইয়াছে এবং আর এক ভাই এখনও ফেরার। তদন্তকালে পুলিশ দক্ষিণেশ্বর বোমার ন্যায় কতকগুলি বোমা ও রিভলভার, কার্তুজ, পুস্তিকা এবং বিদ্রোহীদলের পরিত্যক্ত মোটর গাড়ীতে কয়েকখানি কাপড়চোপড় পাইয়াছিল। বিদ্রোহীদল পাহাড়ে

সংঘর্ষের পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্ত আর কয়েক ব্যক্তির সহিত ফেনী রেলওয়ে স্টেশনে ধৃত হইয়াছিল কিন্তু সুবোধ চৌধুরীর প্রতি গুলী বর্ষণ করিয়া সে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অতঃপর সরকারী উকিল কালাবপুর গ্রামে গ্রেপ্তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানের নিকট অনন্ত সিং যে চিঠি দিয়াছিল তাহা হইতেই তাহার অপরাধ প্রমাণিত হয়। উক্ত পত্রে অনন্ত বলিয়াছিল যে, সে ব্যক্তিগত কারণে আত্মসমর্পণ করিতেছে কিন্তু সবকারী উকিল বলেন যে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাহার উপায় ছিল না।

সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্বেই আদালত অদ্যকার মতো শেষ হয়। অনন্ত তাহাব পক্ষে কৌসুলী দিবার প্রার্থনা করে। তাহাব প্রর্থনা মঞ্জব হয়। [এ, পি]

সরকারী উকিলের ব্যক্তব্য শেষঃ নারীবেশে বিপ্লবী।

বঙ্গবাণী ২৭-৭ ৩০। গতকল্য ২৬শে জুলাই সরকাবী উকিল তাঁহাব বক্তব্য শেষ করেন। প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিব বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখাইয়া তিনি বলেন যে জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধের পর বিপ্লবীরা কয়েকদলে বিভক্ত হইয়া কেহবা মুসলমান সাজিয়া কেহবা নারীর ছদ্মবেশ ধরিয়া সরিয়া পড়ে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর আশু দাস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ শুটারকে জেরা করা হয়। মিঃ শুটার তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের দলপতি অনন্ত সিংহ নহেন। বিপদ এড়াইবার জন্যই যে তিনি সেদিন চট্টগ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে লুণ্ঠনের সংবাদও তিনি পূর্বে পান নাই।

অনন্ত সিং গতকল্য হইতে নিজের পক্ষ নিজেই সমর্থন করিতেছেন। অভিযুক্ত সুবোধ চৌধুরী বলে যে সে পুলিশের নিকট কোনো স্বীকারোক্তিই করে নাই। পুলিশ ঐ স্বীকারোক্তি তাহার মুখ দিয়া

বাহির করাইতে নাকি তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে।

বিদ্রোহী অনন্তলালের পত্র ঃ চট্টগ্রাম ২৫শে জুলাই ১৯৩০। অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলার আসামী অনন্তলাল সিং ২৮শে জুন তারিখে কলিকাতায় আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পূর্বে মিঃ লোম্যানের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ ঃ—

প্রিয় লোম্যান,

২৮শে জুন তারিখে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি অবশ্য এ সুযোগ ছাড়িবেন না। নিশ্চয়ই তখন আমাকে গ্রেফতার করিবেন। আমিও তাহার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি আত্মসমর্পণের জন্য আপনার নিকট যাইতেছি ইহা যেন আপনার মনে উদয় না হয়। লোক আত্মসমর্পণ করে কখন ? যখন সে সম্পূর্ণ অসহায় হয় এবং পলাইবার কোনো উপায় তাহার থাকে না, তখন—কেবল তখনই সে আত্মসমর্পণ করে। আমি কি এখন অসহায় ? না, নিশ্চয়ই না, আমার আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী অস্ত্র আছে, আমার যথেষ্ট অর্থ আছে, আমাকে সাহায্য করিবার লোক অনেক আছে, বলা বাহুল্য— বাঙ্গলার বাহিরে তথা ভারতের বাহিরে পলাইয়া যাইবার, আশ্রয় লইবার মত অনেক স্থান আমার আছে। এখন আমি আমার বন্ধুদের সহিত পলাইয়া আছি, আমরা নিরাপদেই আছি। তথাপি আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ দিতেছি। আপনি কি মনে করেন আমি আমার কোনো কার্যের জন্য অনুতপ্ত ? না, কখনই নয়। আমি একটুও দুঃখিত নহি। তবে কি আমি কোনো কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে চলিতেছি ? না তাহাও নয়। ইহা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতরূপে আমি এ পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি।

বিদ্রোহী অনন্তলাল সিংহ।

ঃ শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু ঃ আসামী পক্ষ সমর্থনের সম্ভাবনা

চট্টগ্রাম ২৪শে জুলাই, অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সম্মুখে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ এ সি মুখার্জি, এন আর দাশগুপ্ত,

আখণ্ড চন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার দত্তের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলগণ কোন কোন আসামীর পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনা যায় মিঃ বি সি চ্যাটার্জি তাঁহার অন্যান্য মামলা শেষ করিয়াই আসামী পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য চট্টগ্রাম আসিবেন। ইহাও শুনা যায় যে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যদি কলিকাতায় কংগ্রেসের ব্যাপারের কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনিও আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে আসিবেন।

শুনা যায় আসামীদের মা, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ বসুকে রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে অব্যাহতি দিয়া আসামীপক্ষ সমর্থন করিবার অবকাশ দিবার জন্য শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে এক জরুরী তার করিয়াছেন।

জনসাধারণ এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টারের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। মামলা ভালরূপে চালাইবার জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা আশা করা যায়। —ফ্রী প্রেস।

লালমোহন সেন, ফকীর সেন, অনিলবন্ধু দাস ও সুবোধ চৌধুরী :— ইহারা স্বীকারোক্তি করিয়া অপবের সহিত নিজদিগকে জড়াইয়াছে। সুবোধ চৌধুরী আদালতে বলে—'আমি পুলিশের নিকট কোন এজাহার করি নাই। সরকারী উকীল যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। আমি পরে আমার বক্তব্য বলিব। পুলিশ আমার উপর নির্যাতন করিয়াছিল। ।বঙ্গবাণী ২৯ ৭-৩০

চট্টাগ্রাম অস্ত্রাগাব লুঠের জের : চট্টগ্রাম, ২৯শে জুলাই, অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউনালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী আবার আরম্ভ হয়।

আসামী ফকীর সেনকে অপব আসামীদের নিকট হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল। ফকীর সেন প্রার্থনা করে যে, তাহাকে অপর আসামীদের নিকট যাইতে অনুমতি দেওয়া হউক। ফকীর সেন স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। তাহার পক্ষ সমর্থনার্থ কোন ব্যবহারাজীবও নিযুক্ত হয় নাই।

ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট বলেন,—সে অল্পবয়স্ক বলিয়া তাহাকে পৃথক কাঠগড়ায় রাখা হইয়াছে। ফকীর কিন্তু জিদ করিতে থাকে এবং আসামীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ মুখার্জীকে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অনুরোধ করে। ফকীর পরে ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়া দেয় এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মিঃ মুখার্জীকে ক্ষমতা প্রদান করে।

আসামী অনন্ত সিং বিচারকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন, যে সকল সাক্ষীর এখনও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই, তাহারা সনাক্তের উদ্দেশ্যে বাহির হইতে তাহাদের প্রতি উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কোন সাক্ষী বিচার কক্ষের নিকট আসিতে পারিবে না বলিয়া আদালত কড়া হুকুম দেন।

সোমবারের শুনানীর বিবরণঃ চট্টগ্রাম, ২৮শে জুলাই, অদ্য স্পেশাল ট্রাইবিউনালে রিজার্ভ পুলিশের সাবইন্সপেক্টার সঞ্জীব নাগের এজাহার গৃহীত হয়। এই সাবইন্সপেক্টারই ১৮ই এপ্রিল তারিখে থানায় ঘটনার প্রথম সংবাদ দিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন, বন্দেমাতরম ধ্বনি ও বন্দুকের আওয়াজে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বদেশী বিদ্রোহীগণ কর্তৃক পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রান্ত হইয়াছে।

তিনি পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্টকে সংবাদ দেন ও শহর কোতোয়ালীতে গমন করেন। তথা হইতে রাত্রি প্রায় পৌনে একটার সময় পুলিশ লাইনে প্রত্যাবর্তন করেন। তখনও বিদ্রোহীদিগকে তিনি পুলিশ অস্ত্রাগারে দেখিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা চলিয়া গেলে তিনি সদলে অস্ত্রাগারে যান এবং দেখেন যে অস্ত্রাগারের দরজা ভগ্ন। দুইটি কাঠের বাক্সে যে সকল রিভলবার ছিল তাহা নাই এবং একজন প্রহরী গুলির আঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অস্ত্রাগারে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল।

অস্ত্রাগারের বাহিরে বিভিন্ন এটাচিকেসে ও মোটর গাড়ী সমূহে বহু বন্দুক, রিভলবার, বোমা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহীদল কর্তৃক লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রের এক তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

দেখা যায় যে, প্রায় ৫৬টি বন্দুক, ২টি ওয়েবলি রিভলবার ও প্রায় ৩২৫০ কৌটা বারুদ অপহৃত হইয়াছে। [বঙ্গবাণী ২৯-৭-৩০]

১৬ই সেপ্টেম্বরের বিবরণ : বেলা প্রায় পৌনে ১২টার সময় কমিশনারগণ তাঁহাদের আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অনন্ত সিং, লালমোহন সেন এবং ফকীর সেনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। গণেশ ঘোষ এবং লোকনাথ বলের (ইতিমধ্যে চন্দননগরে ধৃত) পক্ষে ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু। ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত জে, কে, ঘোষাল দাঁড়াইয়াছিলেন শ্রীপতি চৌধুরী, যোগেন্দ্র গুপ্ত এবং অনন্ত গুপ্তের পক্ষে। বাকী আসামীদের পক্ষে ছিলেন স্থানীয় উকিলগণ।

তারপর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, সঞ্জীবচন্দ্র নাগকে জেরা করেন।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল তারিখ রাত্রিতে জ্যোৎস্না ছিল, না অন্ধকার?

উঃ—অন্ধকার।

প্রঃ—পুলিশ লাইনে যারা এসেছিল তাদের কাউকে চিনতে পেরেছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—তাদের কি পোষাক ছিল তা নজরে পড়েছিল?

উঃ—না।

প্রঃ—তাদের কাছে কি অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাও বলতে পারেন না আপনি?

উঃ—না, আমি দেখিনি।

প্রঃ—আপনি বলেছেন, বন্দেমাতরম চীৎকার শুনে আপনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, তারা সব বিপ্লবী। তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, বিপ্লবীরাই কেবল বন্দেমাতরম চীৎকার করে?

উঃ—না, তা আমি বলতে পারিনে

কৌসুলী শ্রীশ বসু অতঃপর সাক্ষীকে আরও জেরা করেন।

প্রঃ—অস্ত্রাগারের সম্মুখে কোন আলো ছিল কি?

উঃ—ছিল, মোটর গাড়ীর হেড লাইট আর টর্চ লাইট।

প্রঃ—তাহলে সেখানে আপনার কোন পরিচিত লোক থাকলে আপনি

তাকে চিনতে পারতেন না ?

উঃ—আলো খুব জ্বলজ্বল করছিল, নইলে হয় তো চিনতে পারতাম।

প্রঃ—ঐসব আলো দিয়ে যদি লোকগুলোকে ফোকাস করা যেতো এবং ওদের মধ্যে কেউ যদি আপনার পরিচিত থাকতো তাহলে তাকে আপনি চিনতে পারতেন নিশ্চয় ?

উঃ—আলোগুলো বড্ড জ্বলজ্বল করছিল—চোখে ধাঁধা লাগল।

ইহার পর সরকারী সাক্ষী শশীভূষণ দাশগুপ্তকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু জেরা করেন।

প্রঃ—পরদিন জালালাবাদে যখন (নিহতদের) ফটো তুলতে গিয়েছিলেন, তখন কি কেউ এসেছিল আপনার কাছে ?

উঃ—একজন কনেস্টবল এসেছিল। বলল—পুলিশ সুপারিটেণ্ডেন্ট আমাকে ডেকেছেন।

প্রঃ—ফটো তুলতে আপনার কতক্ষণ লেগেছিল ?

উঃ—আড়াই ঘণ্টা।

রঞ্জন সেন চট্টগ্রাম আদালতের একজন উকিল। তিনিও এই মামলার আসামী। সাক্ষীকে তিনিও জেরা করেন।

প্রঃ—লর্ড রোনাল্ডস যখন বাংলার লাট ছিলেন, তখন তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন—মনে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—তিনি চট্টগ্রামে এলে তখনকার কমিশনার মিঃ কে. সি. দে ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে তাঁকে একটি পার্টি দিয়েছিলেন। এটা কি সেই ফটো ? (ফটো দেখিয়ে) এখানে রঞ্জন সেনের ছবি দেখতে পাচ্ছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—মিঃ ক্লেটনকে জানেন ?

উঃ—হ্যাঁ, তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ছিলেন।

প্রঃ—বিলেত যাবার আগে তিনি সস্ত্রীক রঞ্জন সেনের সঙ্গে ফটো তুলেছিলেন জানেন ?

উঃ—হ্যাঁ জানি [বঙ্গবাণী ২২-৯-৩০]

চট্টগ্রাম স্পেশাল ট্রাইবিউনাল। কলকাতা, ৪ঠা অক্টোবর। অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৫ খৃস্টাব্দের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৪ ধারার ১ এবং ২ উপধারা মতে সকাউন্সিল গভর্নর বাহাদুর গত ৯ই জুলাই ৯৯৭২ ৯৯৭৩ ও ৯৯৭৪ নং নোটিশ অনুযায়ী আসামীদের বিচারার্থ (১) চট্টগ্রামের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জে, ইউনি, আই সি, এস (২) অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর (৩) পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টব খান বাহাদুর মৌলভী এ, এইচ, এম, আব্দল হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু যেহেতু কমিশনার রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুরেব সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার সম্ভবানা—সেহেতু উক্ত আইনের দশ ধারাব ৪ নিয়মের খ উপনিয়ম মতে সপারিষদ গভর্নর অবসরপ্রাপ্ত জিলা এবং সেশন জজ রায় নবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বাহাদুরকে আসামীদের বিচারার্থ রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের (যিনি পদত্যাগ কবিয়াছেন) স্থলে নিয়োগ করা হইল। [বঙ্গবাণী ৫ ১০-৩০]

অম্বিকা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার: অম্বিকা চক্রবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাব অন্যতম পলাতক আসামী। ইহার নামে পাঁচ হাজাব টাকার পুরস্কাব ঘোষণা কবিয়া এক সরকারী হুলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। অদ্য ভোর ৪-৩০ ঘটিকার সময় পুলিশ ইঁহাকে কচুই গ্রামে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রাম চট্টগ্রাম পটিয়া থানার এলাকাধীন।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র হোড়ের বাড়িতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক প্রফুল্ল দে ও ষোড়শ বর্ষীয় বালক বিপিন চৌধুবী এবং গৃহস্বামী হবিশচন্দ্র হোড়কেও গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রামে আনয়ন করা হইয়াছে এবং হাজতে রাখা হইয়াছে। [বঙ্গবাণী ১১-১০-৩০]

১৮ই সেপ্টেম্বরের শুনানী: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানীর বিবরণ দেওয়া হইল:—ফরিয়াদী পক্ষের ১৪ এবং ১৫ নং সাক্ষী হীরালাল হিমানী এবং প্রভুদাসকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কোনই প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করেন নাই। শুধু শ্রীযুক্ত ঘোষালের প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন যে, সনাক্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে জেলে নিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারে না।

টেলিগ্রাফ অপারেটারের সাক্ষ্য : ফরিয়াদী পক্ষের ২০ নং সাক্ষী আহমদউল্লা (টেলিগ্রাফ অপারেটার) সরকারী কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল।

১৮ই রাত্রি ৮টা হইতে পরদিন ভোর ৭টা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ অফিসের ভার আমার উপর ছিল। ৯-৪৫টার সময় দরজা পিছনে রাখিয়া আমি বসিয়া থাকি। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ৬।৭ জন ব্যক্তি আসিয়া অতর্কিতে আমার হাত পা বাঁধিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। আমি তাহাদের কাহাকেও দেখি নাই। আমার মনে হয়, ৬।৭ জন হইবে। তাহারা আমার নাকের নিকট কি একটা ধরে এবং আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। পরে কি ঘটিল তাহা আমি বলিতে পারি না।

যখন জ্ঞান লাভ করি, তখন দেখিতে পাই যে এক্সচেঞ্জ রুমের দক্ষিণ-ভাগে আমি পড়িয়া আছি। ভয়ে আমি কাঁপিতে থাকি এবং চিৎকার করি, কিন্তু কেহই তথায় আসে না তখন অফিসের পূর্বভাগে অবস্থিত জোনাব আলির বাসায় আমি যাই এবং তাহাকে এক্সচেঞ্জের নিকট নিয়া আসি। তথায় আসিয়া দেখিতে পাই যে, ২।৩ জন লোক আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছে। পরে আরও লোক আসিয়া হাজির হয়। তখন আমাকে থানায় লইয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন—এক ব্যক্তি আমার মুখ চাপিয়া ধরে, এক ব্যক্তি চক্ষু বাঁধে এবং অপর এক ব্যক্তি হাত ধরিয়া রাখে। কয়জনে আমার হাত ধরিয়া রাখে তাহা আমি বলিতে পারি না। [বঙ্গবাণী ১৩-১০-৩০]

আদালতে অন্যতম আসামী অম্বিকা চক্রবর্তী : চট্টগ্রাম, ১৩ই অক্টোবর :—পূজার ছুটির পর অদ্য নূতন কমিশনার সহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ

লাহিড়ী বিশেষ আদালতের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু অদ্য পুলিশের এসিস্টাণ্ট সুপারিটেণ্ডেণ্টকে জেরা করেন। সরকারী উকিল আদালতে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, অন্যতম ফেরারী আসামী অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী ধৃত হইয়াছে। এই আসামীকে অন্যান্য আসামীর সহিত যোগ করিয়া নূতনভাবে মামলা চালাইবার জন্য আজ আর কোন আবেদন কবা হয় নাই।

[বঙ্গবাণী ১৪-১০-৩০]

ফরিয়াদী পক্ষের ১৬ নং সাক্ষী আলি আহমেদকে (ট্যাক্সি চালক আহমদ রহমনেব সহকারী) শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

শ্রীযুক্ত বসুঃ আপনি ঐ দিকে (সরকারী কৌঁসুলির দিকে) তাকাইয়া কি দেখিতেছেন?

প্রেসিডেন্ট ইউনিঃ সাক্ষী তাহার ইচ্ছামত নিশ্চয়ই সকলেব দিকে তাকাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত বসুঃ তা ঠিক, কিন্তু কৌঁসুলীর নিকট হইতে কোন নির্দেশ পাইতে পারেন না।

সরকারী কৌঁসুলীঃ ইহা অত্যন্ত অন্যায়।

প্রেসিডেন্টঃ ঐরূপ কিছু ঘটিলে আমাকে জানাইবেন।

শ্রীযুক্ত বসুঃ কিন্তু চোখের ইসারা আপনাকে দেখাইবার আগেই যে শেষ হইয়া যায়।

প্রেসিডেন্টঃ আচ্ছা আমি লক্ষ্য রাখিব।

শ্রীযুক্ত বসুঃ কিন্তু আপনি যখন লিখিতেছেন, তখন উহা কি প্রকারে সম্ভব?

পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্টের সাক্ষ্যঃ অতঃপর ২১ নং সাক্ষী মিঃ জে আর জনসন (চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট) প্রদান করেন। তিনি বলেনঃ ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে সাবইন্সপেক্টার সঞ্জীব নাগ এবং কনস্টেবল জরাসন্ধ বড়ুয়া রাত্রি প্রায় ১০-৩০টার সময় বাংলোয় আসিয়া আমাকে জানায় যে, পুলিশ লাইন স্বদেশীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে আমি তখন টেলিফোন করিতে যাই কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া

সিদ্ধান্ত করি যে, লাইন কাটিয়া গিয়াছে।

আমি সঞ্জীব নাগকে কোতোয়ালী পুলিশ থানায় এবং কনস্টেবল জরাসন্ধকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করি। ডি আই জি মিঃ ফারমার এবং আমি আমার গাড়িতে করিয়া এ এফ আই, হেড কোয়ার্টার্স অস্ত্রাগার অভিমুখে যাই। অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, সমগ্র জায়গাটি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আছে। তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া আমি বরাবর পাহাডতলী অভিমুখে অগ্রসর হই। পথে দেখি যে, তিনজন ইউরোপীয়ান দৌড়াইতেছেন। তন্মধ্যে সার্জেণ্ট ব্ল্যাকবার্নও ছিলেন। তিনি আমাকে জানান যে, এ, এফ, আই অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারেল নিহত হইয়াছেন।

তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের চাবি কাহার নিকট রহিয়াছে। চাবি ব্যবাক্লকের নিকট রহিয়াছে—তিনি এই কথা বলিলে আমি তাহাকে ব্যবাক্লকেব বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলি। তৎপর আমরা তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া এবং তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলি যে, প্রতিবেশীগণকে জাগাইয়া অস্ত্রাগারের দরজা খুলিতে হইবে। আমরা মিঃ ফ্রান্সিসের বাংলোয় গমন করি এবং তথা হইতে মিঃ ফ্রান্সিস সহ পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে উপস্থিত হই। ইতিমধ্যে আমি মেসার্স টমাস ওয়েস্ট টায়ার্স প্রোভান এবং ফ্রীম্যানকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করি এবং বলি যে, তাহাদের পাহাড়তলী অস্ত্রাগারে যাইতে হইবে। মিঃ ফ্রান্সিসের গাড়ীতে একটি লুইসগান নেওয়া হয়। আমার গাড়িতে ৩।৪জন রাইফেলধারী গমন করেন। আমরা এ, এফ, আই অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, আক্রমণকারীদল চলিয়া গিয়াছে। আমি তখন ঘটনাস্থল অনুসন্ধান করি এবং দেখি যে, একটি গাড়ীর চালকের মাথার খুলি উড়িয়া গিয়াছে এবং উক্ত গাড়ীরই পশ্চাতের আসনে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

জনৈক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকেও মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ী নিকটেই ছিল। তখন গাড়ীর

চালক মাটির উপর মুখ রাখিয়া গোঙাইতেছিল এবং গাড়ীর মধ্যে সার্জেণ্ট মেজর ফ্যারেলের মৃতদেহ দেখিতে পাই।

মিঃ ফারমার এবং আমি সিদ্ধান্ত করি যে, আমাদের অবিলম্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, কোতোয়ালী পুলিশ থানা এবং পুলিশ লাইন ইত্যাদি পরিদর্শন করা আবশ্যক। তৎপর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গমন করিয়া এবং তথায় সকলই ঠিক রহিয়াছে দেখিতে পাই। কোতোয়ালী পুলিশ থানায় যাইয়া দেখি যে, তাহারা ইতিমধ্যেই এ সংবাদ পাইয়াছে। ইহার পর আমি ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে যাই এবং তথাকার গ্যারেজে আমার গাড়ীখানা রাখিয়া দিই।

পরে লুইসগান সহ আমরা ওয়াটার ওয়ার্কসের দিকে অগ্রসর হই। আমি দেখিতে পাই যে জনৈক ব্যক্তি আমাদের দিকে আসিতেছে। ঐ ব্যক্তি অগ্রসর হইলে তাহাকে সঞ্জীব নাগ বলিয়া চিনিতে পারি। পুলিশ লাইনের উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে লুইসগান সহ আমি অগ্রসর হই। লুইসগানটি তথায় রাখা হইলে পর অস্ত্রাগারের নিকটে যাহাদিগকে ঘুরিতে দেখা যায়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ৩।৪ বার গুলি ছোঁড়া হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে তাহারাও আমাদের দিকে গুলি চালায়।

আমরা যে স্থানে আশ্রয় নিয়াছিলাম তাহা মোটেই নিরাপদজনক নয় দেখিয়া আরও সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় নিবার জন্য আমি চেষ্টা করি। এই সময় আমাকে বলা হয় যে, আমাদের বারুদ বেশী নাই, মোটে দুই ড্রাম আছে।

মিঃ ফারমার আমাকে আরও কিছু বারুদ আনিবার জন্য বলেন। অতঃপর আমি পুনরায় ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের গ্যারেজে যাইয়া আমার গাড়ীখানা আনয়ন করি এবং এ. এফ. আই. অস্ত্রাগারে যাইয়া আরও কিছু বারুদ সংগ্রহ করিয়া ওয়াটার ওয়ার্কস্‌এ প্রত্যাবর্তন করি।

অস্ত্রাগার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাই যে, মিঃ ফারমার তাঁহার দলবল সহ ওয়াটার ওয়ার্কস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঘরের ছাদে

আশ্রয় নিয়াছেন। তথা হইতে নামিয়া অক্সিলিয়ারী কোর্সের ২০।২৫ জন সদস্যকে আমরা দেখিতে পাই। তখন আমরা দুইটি দল গঠন করিয়া বস্তির মধ্য দিয়া লাইনের দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু তখন আক্রমণকারীগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ত'ন রাত্রি অনুমান ৩টা হইবে।

আমরা অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, অস্ত্রাগারে তখনও আগুন রহিয়াছে। কাপড়ের দোকানের পাশের রাস্তায়ই একখানা মোটর গাড়ী পড়িয়াছিল। ঐ গাড়ীর পিছনে একগাছা দড়িও ছিল। অস্ত্রাগারের নিম্নে একখানা শিভ্রোলেট এবং একখানা বেবি অস্টিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। শিভ্রোলেট গাড়ীখানায় বহু সংখ্যক পুলিশ রাইফেল এবং অস্টিনখানাতে অল্প সংখ্যক রাইফেল বন্দুক ছিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে পর কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পরিত্যক্ত জিনিস সমূহের একটা তালিকা করিতে বলা হয়। কাপড়ের দোকানে যাইয়া দেখি যে, তথায় কি একটা জিনিস পড়িয়া আছে। পরে দেখি—উহা একটি বোমা। রাস্তার উপরেও একটি বোমা পাওয়া যায়।

ভোর ৬-৩০টার সময় টেলিফোন অফিসে গমন করি। তথায় দেখি যে, এক্সচেঞ্জ বোর্ড এবং তার সকল পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তথায় টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ স্যুট-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ৮-৩০টার সময় পুলিশ লাইনে যাই এবং কোতোয়ালীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ঘটনার বিস্তৃত অনুসন্ধানের ভার দিই। সার্জেণ্ট মসেড ও আরও ৪০ জন পুলিশ কর্মচারীকে আক্রমণকারীদের অনুসন্ধানার্থ পাহাড়ের দিকে প্রেরণ করি।

১৯শে এপ্রিল দ্বিপ্রহরে আমি গণেশ ঘোষের বাটিতে যাই এবং গোয়েন্দা বিভাগের সারদা ভট্টাচার্যকে ঐবাড়ী খানাতল্লাসী করিতে বলা হয়। তথায় প্রায় ১৫।২০ মিনিট আমি অপেক্ষা করি। আমি সারদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কিছু পাইয়াছেন কিনা? তিনি আমাকে ৪।৫টি বন্দুক দেখান, এতদ্ব্যতীত অনেক কাগজপত্রও

পাওয়া যায়। একটি প্রয়োজনীয় দলিলও ঐ কাগজপত্রের মধ্যে ছিল। উহা লোক সংগ্রহ করিবার তালিকা।

অপরাহ্ণ ৪-৩০টাব সময় আমরা সংবাদ পাই যে, আক্রমণকারীদের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পাবে। বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়া ঐ দিকে আমরা অগ্রসর হই। যখন আমরা ফিবিতেছিলাম, তখন জনৈক কনেস্টবল সংবাদ প্রদান করে যে, নিকটবর্তী কোনও এক বাসায় একজন আহত বালক বহিয়াছে। আমরা ঐ বাটীতে প্রবেশ করি এবং একটি কম্বলের নীচ হইতে বালককে বাহির কবি। বালকটির বক্ষ হস্ত পদ প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আহত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে চুপ করিয়া থাকে। সে তাহার নাম সুধাংশু অথবা হিমাংশু সেন বলে। হিমাংশুকে আমি হাসপাতালে নিয়া যাইবাব জন্য বলি।

২০শে এপ্রিল আমি আরও অন্যান্য পুলিশ কর্মচাবীসহ নাগরখানা পাহাড়েব পাদদেশ পর্যন্ত গমন করি। ঐস্থানে যে লোকজন ছিল তাহার চিহ্ন তখনও তথায় ছিল। ২১শে তারিখ এমন বিশেষ কিছু ঘটে নাই। অপরাহ্ণ ৩টার সময় সাবইন্সপেক্টার মহিদর আলি সংবাদ আনয়ন করে যে, হাট হাজারী বাস্তার পার্শ্বে মসজিদেব নিকট পাহাড়ে বিদ্রোহীদের দেখা গিয়াছে।

২৩শে এপ্রিল আমি এই মর্মে আদেশ পাই যে, জনৈক ফটোগ্রাফার মহকুমা হাকিম এবং সিভিল সার্জন সহ পাহাড়ের দিকে যাইতে হইবে ঐ পাহাড়ের নাম জালালাবাদ পাহাড়। তথায় যাইয়া আমি মিঃ লুইস এবং ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর একটি দল এবং সাব-ইন্সপেক্টার হেম গুপ্তকে দেখিতে পাই।

আমি রাস্তার উপর দশটি মৃতদেহ দেখিতে পাই। তথায় একজন আহতও ছিল। তাহার জবানবন্দী মহকুমা হাকিম গ্রহণ করিয়াছেন। সে তাহার নাম মতিলাল কানুনগো বলিয়াছে। সে একটার সময় মারা যায় এবং ফটোগ্রাফার তাহার ফটো তুলিয়া রাখে।

মিঃ লুইস এবং হেম গুপ্তের নিকট জানিতে পারি যে, আরো একটি

বালকও গুরুতর আহত হইয়াছে। ট্রেনে তাহাকে চট্টগ্রামে নেওয়া হয়। ফটো তুলিবার সময় মতি কানুনগো মারা যান। হেমবাবু আমাকে জানান যে, নরেশ রায়ের নিকট ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের একটি নক্সা পাওয়া যায়। অপরাহ্ণ ৩-৩০টার সময় আমি পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করি।

২৪শে সকাল বেলা ১০-৩০ টার সময় কোতোয়ালী থানাতে আমি যখন কাজ করিতে থাকি, তখন একজন কনেস্টবল দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জানায় যে, একজন বিদ্রোহী তাহাকে রিভলবার প্রদর্শন করিয়া ভয় দেখাইতেছে। আমি তখনই উপস্থিত হইয়া পুলিশ কর্মচারিগণকে ঐ স্থান ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ করি। আলকারণ লেন দিয়া আমরা অগ্রসর হইবার সময় দেখিতে পাই যে, কালভার্টের নিম্ন হইতে আমার প্রতি কেহ একটি পিস্তল লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। আমি তখন দুইবার গুলি চালাই এবং বালকটি আহত হয়। কালভার্টের নিম্ন হইতে তাহাকে আনয়ন করা হইলে তাহাকে অমরেন্দ্র নন্দী বলিয়া চেনা যায়। তখনই ডাক্তার ডাকিয়া পাঠান হয়।

পুলিশ সুপারিটেণ্ডেন্টের সাক্ষ্য শেষ হইবার পূর্বেই আদালতের কার্য সেদিনকার মত শেষ হইয়া যায়। [বঙ্গবাণী ১৫-১০-৩০]

ঃ শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর জেরা ঃ

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রি হইতে পরদিবস ভোর পর্যন্ত আপনি কি আক্রমণকারীদের কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—সাবইন্সপেক্টার সঞ্জীববাবু কাহাকেও সনাক্ত করিয়াছেন কিনা তাহা কি খোঁজ করিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—জরাসন্ধ বড়ুয়া কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা কি খোঁজ করিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—তাহা হইলে সঞ্জীববাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়ার পর হইতে তৎপরদিবস সকাল ৮-৩০ টার মধ্যে এমন কাহারও সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই—যে নাকি কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিয়াছে ?

উঃ—আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই।

প্রঃ—সনাক্ত করিয়াছে বলিয়া ঐসময়ের মধ্যে কেহ আপনার নিকট বলেও নাই ?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনি হিমাংশুকে কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন ?

উঃ—হ্যাঁ, তাহাকে শুধু দগ্ধীভূত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করি।

প্রঃ—সে কি বলিল ?

উঃ—কোন উত্তর প্রদান করিল না।

এই সময় প্রেসিডেন্ট সাক্ষীর প্রতি কতিপয় কাগজপত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, গণেশ ঘোষের বাড়ীতে ঐসকল কাগজপত্রই কি সারদাবাবু তাহাকে দেখাইয়াছিলেন ? সাক্ষী সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বসু—ঐসকল কাগজ কি আপনি হস্তে নিয়াছিলেন ?

উঃ—না, সারদাবাবু হাতে করিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, কাগজগুলি খুবই দরকারী—যেহেতু কাগজে অনেক লোকের নাম রহিয়াছে। আমি ঐ কাগজগুলি অত্যন্ত সাবধানে রাখিয়া দিবার জন্য বলি। [বঙ্গবাণী ১৬-১০-৩০]

ঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য ঃ

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ আর উইলকিনসন সরকারী কৌঁসুলীর সরকার পক্ষে এসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ লুইসের সাক্ষ্য ঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠন মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হইলে এসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ লুইসের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষী জবানবন্দীতে বলেন যে গত ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তিনি পুলিশ লাইনে হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছে সংবাদ পাইয়া ঐস্থানে

যান এবং অস্ত্রাগার হইতে আগত গুলির শব্দ শ্রবণ করেন। এক জন হাবিলদার ঐ সময়ে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল যে "স্বদেশী" লোকরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়াছে।

অতঃপর সাক্ষী পুলিশ লাইন হইতে রেলওয়ে কোষাগারে যান এবং তথাকার শান্ত্রীদিগকে সতর্ক হইতে উপদেশ দেন। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখেন যে রেলওয়ে অস্ত্রাগার প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। মিঃ জনসন সাক্ষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন এই সাক্ষীও ঐসকল কথার পুনরুল্লেখ করেন। গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে সাক্ষী কর্নেল ডালেসের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সিপাহী লইয়া চৌধুরীহাটে যান। ঐস্থানে আক্রমণকারীদের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তদনু-সারে চতুর্দ্দিকে তদন্তকারীদল প্রেরণ করা হয়। তৎপরে সাক্ষী পর্বতে বিদ্রোহীদের সহিত কিরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করেন। কিছু দূরে বারুদের আগুন দেখিতে পাইয়া পুলিশ বাহিনী ঐদিক লক্ষ্য করিয়া লুইস কামান (লুইসগান কামান নয়. অনুবাদকারী ভুল করে কামান লিখেছেন মনে হয়) দাগিতে আরম্ভ করে। বিদ্রোহী-রাও কামান (?) দাগিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দেয়। কিন্তু তাহাদের গুলীবর্ষণ ক্রমান্বয়ে মন্দীভূত হইয়া আসে।

২৩শে এপ্রিল তারিখে সাক্ষী একটা পাহাড়ে চড়িয়া ১০টা মৃতদেহ দেখিতে পান। সকলের পরিধানে একই বেশ ছিল। ঐস্থানে সাক্ষী সহস্রাধিক খালি টোটা প্রাপ্ত হন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ আর উইলকিনসন সরকারী কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন: ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে যখন আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, তখন বারা-ন্দায় কতিপয় ব্যক্তির পায়ের শব্দ শুনিয়া জাগরিত হই এবং বাহিরে আসিয়া একজন পুলিশ কনেস্টবল এবং টেলিগ্রাফ পিয়নকে দেখিতে পাই। পুলিশ কনেস্টবল বলে যে, পুলিশ লাইন স্বদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেট তাহাকে প্রেরণ করিয়াছে আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া কনেস্টবল জরাসন্ধ বড়ুয়া সহ

আমার গাড়ীতে করিয়া অগ্রসর হই। আমার ভৃত্য কনেস্টবলটি আমার নিকট বন্দুক ও এক প্যাকেট কার্তুজ দিয়া দেয়। পিকাডেলি সার্কাসের নিকট ক্যাপ্টেন টেট, মিঃ লজ, অপব একজন ইয়োরোপীয়ান ও কতিপয় মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হয়।

আমি পুলিশ সুপারিটেণ্ডেন্টের বাংলোয় যাই এবং জানিতে পারি, তিনি এ, এফ, আই অস্ত্রাগার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। তৎপর আমি পুনরায় ক্যাপ্টেন টেটের নিকট যাই। ঐ সময় রেলওয়ে স্টেশনের দিক হতে অপর একখানি মোটর আসিয়া হাজির হয়। ঐ গাড়ীতে কতিপয় মহিলা ছিলেন। আমরা মহিলাগণকে ঐ গাড়ীতে করিয়াই রেলওয়ে এজেণ্টের বাংলোতে পাঠাইয়া দিই।

অতঃপর ক্যাপ্টেন টেট এবং আমি এ, এফ, আই অস্ত্রাগার অভিমুখে অগ্রসর হই। আমার চালক গাড়ী চালাইতেছিল। পিছনের আসনে আমি এবং আমার পার্শ্বে জরাসন্ধ বড়ুয়া ছিল। মিঃ টেটের গাড়ীতে লজ, ক্যারেল এবং হোয়াইট ছিলেন। অস্ত্রাগারের নিকট উপস্থিত হইলে পর আমাদের গাড়ীর গতি রোধ করা হয়।

আমি তাহার উত্তরে "বন্ধু" বলিয়া গাডী চালাইতে থাকি। এই সময় অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে থাকে এবং ফিরিয়া যাও এ শব্দ শুনিতে পাই। আমার গাড়ীর চালক আহত এবং জরাসন্ধ বড়ুয়া নিহত হয়। টেটের সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা জেটির দিকে যাত্রা করে পুনরায় অস্ত্রাগারে আগমন করি। আমরা তখন দেখিতে পাই যে, অস্ত্রাগারে তখনও আগুন জ্বলিতেছে এবং কয়েকজন ইয়োরো-পীয়ান তথায় সমবেত হইয়াছেন।

পরে পুলিশ লাইন হইতে মিঃ জনসন আগমন করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সময় আক্রমণকারীগণ চলিয়া গিয়াছিল।

আমরা হেড কোয়ার্টার্সে ৩টার সময় যাই। তথায় বহু মৃতদেহ দেখি। অতঃপর আমার গাড়ীর চালককে পাহাড়তলী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ফিরিয়া আসিয়া আমি দেখি যে, আমার বন্দুক এবং কার্তুজের প্যাকেটটি হারাইয়া গিয়াছে। ৬-৩০ কিম্বা ৭টার সময় আমি

আমার বাংলোতে ফিরিয়া যাই।

২২শে এপ্রিল মিঃ ফারমার এবং অন্যান্যের সহিত বিদ্রোহীদল পাহাড়ে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করি। এ এফ আই এবং ই বি এফ রাইফেলস্ বাহিনীর সৈন্যগণকে তথায় প্রেরণ করিতে আমি এই শর্তে রাজী হই যে, সন্ধ্যার পূর্বেই তাহারা শহরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। এই বন্দোবস্ত শহর রক্ষার্থে করা হয়।

অনন্ত সিংকে যখন চট্টগ্রামে আনয়ন করা হয়, তখন আমি জেল দরজায় ছিলাম। যখন তাহাকে জেলেব মধ্যে লওয়া হয়, তখন আমি 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি শুনিতে পাই। আমি জেল সুপারিটে-ণ্ডেন্টকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, মামলার বিচারাধীন আসামীগণ ওরূপ ধ্বনি করিয়াছে। তাহারা এই বলিয়াছে যে, 'আমাদের দলপতি আসিয়াছেন'।

ঃ শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর জেরা ঃ

প্রঃ—অনন্ত সিং কোন ক্লাবের ব্যায়াম শিক্ষক তাহা আপনি জানেন?

উঃ—হ্যাঁ শুনিয়াছি।

প্রঃ—তাহাব বেতন সম্পর্কে কিছু জানেন?

উঃ—সে কোনও প্রকার ভাতা পাইত কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু যেখানে সে কাজ করিত সেই প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ৫০ টাকা করিয়া ভাতা পাইত।

প্রঃ—এই সমস্ত ক্লাব মাঝে মাঝে যে শাবীরিক শক্তি প্রদর্শনী করিয়া থাকে তাহা আপনি জানেন?

উঃ—আমি তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কোথাও দেখি নাই।

প্রঃ—১৮ই তারিখের ঘটনার পূর্বে কোনও প্রকার সশস্ত্র বিদ্রোহ বা ঐরূপ কিছু ঘটিতে পারে বলিয়া কখনও কি আপনার মনে জাগে নাই?

উঃ—বিপ্লবীদের আক্রমণ ঘটিতে পারে বলিয়া আমার ধারণা ছিল।

প্রঃ—ঐ সন্দেহের জন্য কোনও প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল কি?

উঃ—আমি উহার উত্তর দিতে অস্বীকার করি।

প্রঃ—আপনি সে অধিকার পাইতে পারেন না।

উঃ—আমি বিস্তৃত বলিতে পারি না।

প্রঃ—আমি এখনও তাহা জানিতে চাহি না।

উঃ—কতকাংশে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বৈকি।

প্রঃ—পূর্ববারের জেরায় আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উত্তেজিত পুলিশকর্মচারীগণ দ্বারা এই আক্রমণ হইয়াছে কিনা, তখন আপনি বলিয়াছেন—'না'। এখনও কি তাই বলেন?

উঃ—হ্যাঁ।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, পুলিশ বাহিনী তাহাদের বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য বাঙ্গালা সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছিল উহা আমি যে মাসে জানিতে পারি। ঐ আবেদন সরকারের হস্তগত হইয়াছে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না।

[বঙ্গবাণী ১৯-১০-৩০]

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত: ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামীদের কৌঁসুলীদের মধ্যে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত উপস্থিত থাকেন। প্রেসিডেন্ট কামিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কোনও আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন কিনা। উত্তরে কামিনীবাবু জানান যে, তিনি আসামী গোলাপ সিংএর পক্ষ সমর্থন করিবেন, কিন্তু সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া মামলার তদ্বির করিতে পারিবেন না। তবে যখনই দরকার হইবে, তখনই তিনি উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে অন্য কোন কৌঁসুলী আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন। [বঙ্গবাণী ২৫-১০ ৩০]

অতঃপর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী সার্জেন্ট ব্লাকবার্নকে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আপনি পাহাড়তলীর দিকেই গমন করেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—প্রথম যখন আপনি পাহাড়তলীতে যান তখন সময় কত?

উঃ—রাত্রি ১১-১৫ মিনিট হইবে।

প্রঃ—প্রকৃত পক্ষে আক্রমণকারীদের কাহাকেও আপনি দেখেন নাই?

উঃ—না, শুধু টর্চ হাতে তাহাদিগকে ইতঃস্তত ঘুরিতে দেখিয়াছি।

প্রঃ—উক্ত রাত্রিতে কেহই আক্রমণকারীদের দেখিয়াছে বলিয়া আপনাকে বলেন নাই?

উঃ—না।

স্টেশন মাস্টারের সাক্ষ্য: ১৮ই এপ্রিল ধুম স্টেশনে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় রিলিভিং স্টেশন মাস্টারের কাজ করেন। তিনি বলেন যে, লাকসাম হইতে চট্টগ্রামে যে বোলতার ট্রেন যায় তাহা ৯-৩৫ টার সময় ধুম স্টেশন অতিক্রম করিয়া যায়।

কিছু সময় পরই মিরসরাই হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে,—ট্রেনখানা কোথায়? তদুত্তরে তিনি জানান যে, ট্রেনখানা ধুম স্টেশন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার অল্প সময় পরেই ট্রেনের এঞ্জিনের একজন খালাসী ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বলে যে, ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে। অতঃপর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া উক্ত সংবাদ লাকসাম ও চট্টগ্রাম স্টেশনে প্রেরণ করেন।

আকবর আলীর সাক্ষ্য: ফরিয়াদী পক্ষের ৩৯নং সাক্ষী আকবর আলী বলে যে, সে অস্ত্রাগারের একজন প্রহরী। ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে অস্ত্রাগারে নিযুক্ত ছিল।

রাত্রি ১০টার সময় তাহার পাহারা বদল হয়। অতঃপর বারান্দার একটি খাটিয়ার উপর সে শয়ন করে। কিছু সময় পর পৃষ্ঠদেশে গুরুতর আঘাত পাইয়া সে জাগরিত হয়। সে দেখিতে পায় যে ঐ সময়কার প্রহরী কিষেনবক্স নীচে পড়িয়া আছে। অপর প্রহরী গোলাম জিলামের কি অবস্থা হয় তাহা সে দেখে নাই।

অতঃপর সে ডবলমুরিং পর্যন্ত চলিয়া যায়। তথায় সে দরজার পার্শ্বে বসিয়া থাকে। ভোর ৪টার সময় ডবলমুরিংএ ক্যাপ্টেন টেটকে সে দেখিতে পায়। পরে সে দুই দিবস পর্যন্ত জাহাজে তথাকার খালাসীগণ সহ বাস করে। অতঃপর বাগদাদশা আসিয়া তাহাকে অস্ত্রাগারে লইয়া

যায়। বাগদাদশা বর্তমানে তাহার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া তাহার জন্মস্থান পাঞ্জাবে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু অতঃপর সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—কয়টার সময় তুমি শয়ন করিতে যাও ?

উঃ—১০টার সময়—পাহারা শেষ হইবার পরেই।

প্রঃ—তাহার কতক্ষণ পরে তোমার ঘুম আসে ?

উঃ—২।৩ মিনিট পরেই।

প্রঃ—পাহাবা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যদি ঘুমাইয়া পড, তাহা হইলে যখন পাহারা দিতেছিল, তখন কি ঝিমাইতেছিলে ?

উঃ—না।

প্রঃ—ডবলমুরিং থেকে পরদিন কেন ফিরিয়া আস নাই ? খুব ভয় পাইয়াছিলে ?

উঃ—না, ভয় পাই নাই, তবে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসাব পথ জানিতাম না।

প্রঃ—তুমি ডবলমুরিং যাইতে পারিলে অথচ ফিবিয়া আসিবাব পথ বাহির করিতে পার নাই ?

উঃ—আমি পথ জানিতাম না।

শীতলপ্রসাদ দুবের সাক্ষ্য : ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী কনেস্টবল শীতলপ্রসাদ দুবে বলে যে, গত ১৮ই এপ্রিল রাত্রে সে পুলিস ব্যারাকে ছিল। রাত্রি সওয়া দশটার সময় অস্ত্রাগাবেব নিকট 'বন্দোমাতরম' ধ্বনি হইতে থাকে। ইহা শুনিয়া সে অস্ত্রাগার অভিমুখে যায় এবং অস্ত্রাগার হইতে ২০।২৫ হাত উত্তরে পৌছিয়া দেখে যে, খাকি সার্ট ও হাফপ্যাণ্ট পরিহিত ৫০।৬০ জন লোক অস্ত্রাগার ঘেরাও করিতেছে। তাহাদের নিকট টর্চ লাইট ছিল এবং তাহারা গুলি চালাইতেছিল। একটি গুলি আসিয়া সাক্ষীর বাম করতলে লাগে এবং সে ছুটিয়া পুলিশ হাসপাতালে যায়। পুলিশ হাসপাতাল হইতে তাহাকে পরে জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তিরিত করা হয়! সেখানে দুই মাস চিকিৎসার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রে পুলিস ব্যারাকে কতজন কনেস্টবল ছিল?

উঃ—৬০।৭০ জন।

শ্রীযুক্ত জে, কে, ঘোষাল জিজ্ঞাসা করেন—যে সাবইন্সপেক্টার তোমার জবানবন্দী লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে তুমি কি বল নাই ৬০।৭০ জন ছিল?

উঃ—বলিয়াছিলাম।

প্রঃ—তিনি কি উহা লিপিবদ্ধ করেন নাই?

উঃ—জানি না।

প্রঃ—তুমি কি তাহাকে বল নাই যে, যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বন্দেমাতরম বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল?

উঃ—বলিয়াছিলাম।

প্রঃ—কিন্তু উহাও কি লিপিবদ্ধ হয় নাই?

উঃ—জানি না। [বঙ্গবাণী ২৮-১০-৩০]

গডফ্রের সাক্ষ্য: ফরিয়াদী পক্ষের ৪৮নং সাক্ষী চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ অফিসের এস, ডি, ও, মিঃ ডবলিউ, ই, গডফ্রে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলেন যে, ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ৯টা পর্যন্ত তিনি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ছিলেন। পরে তিনি মেজর ফ্যারেলের স্ত্রী মিসেস ফ্যারেলসহ মেজর ফ্যারেলের বাংলোতে যান। বাংলোটি অস্ত্রাগারের সীমানার মধ্যে। তিনি গাড়ীতে করিয়াই গিয়াছিলেন। মেজর ফ্যারেল তখনও ইনস্টিটিউটে ছিলেন। কখন মেজর প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

মিসেস ফ্যারেলকে বাংলোতে রাখিয়া যখন তিনি ফিরিতেছিলেন, তখন ক্রশ রোডে ২।৩ খানা মোটর দেখিতে পান। গাড়ীতে যাহারা ছিল তাহাদের খাকি পোষাক ও মুখমণ্ডল সাদা ছিল। একখানা সবুজ রংয়ের প্রকাণ্ড শিভ্রোলেট গাড়ী দেওয়ান হাটের দিক হইতে আসিয়া তাহার দক্ষিণ ভাগে প্রায় তাহার গাড়ীর উপরই আসিয়া পড়ে। তিনি তাহার পথে অগ্রসর হন।

মিঃ ব্রিসের বাংলো অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় আলোবিহীন অবস্থায় একখানা গাড়ী তিনি দেখিতে পান। ঐ গাড়ীখানা তখন হঠাৎ চলিয়া যায়। গাড়ীর মধ্যে কে ছিল তাহা তিনি দেখেন নাই। তখন রাত্রি ৯টা ২০ মিঃ হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার বাটী চলিয়া যান।

রাত্রি ১০টার সময় যখন তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার জানালায় একটি বুলেট আসিয়া পড়ে। উহা কোন প্রকার পট্‌কা হইবে ব'লয়া তিনি মনে করেন এবং নিদ্রা যান। দুপুর রাত্রিতে টেলিফোন ইন্সপেক্টার জনাব আলী তাহাকে জাগরিত করিয়া বলে যে, কতিপয় অজ্ঞাতব্যক্তি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পোড়াইয়া দিয়াছে।

তখনই তিনি ঘটনাস্থলে যান এবং দেখিতে পান যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ তখনও জ্বলিতেছে। তিনি তা সারাই করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হন। অতঃপর রাত্রি ২টার সময় তিনি তাহার বাটীতে গমন করেন। যখন তিনি একখানা ভাড়াটে গাড়ী করিয়া তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন পুলিশ লাইন হইতে কতিপয় বুলেট তাহার পাশ দিয়া চলিয়া যায়।

সকালবেলা তিনি জানিতে পারেন যে, জোরারগঞ্জের নিকটে তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে নাঙ্গলকোটেও তার কাটিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পান। [বঙ্গবাণী ২৯-১০-৩০]

মিঃ উইটনের সাক্ষ্য ঃ সাক্ষী মিঃ ই, পি, উইটন চট্টগ্রামস্থিত বুলক ব্রাদার্সের একজন সহকর্মী। তিনি বলেন যে ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০টার পর তিনি চট্টগ্রাম ক্লাবে কিছুক্ষণ ছিলেন। এই সময় মিঃ লেজ আসিয়া তাহাকে বলেন যে. এ, এফ, আই, হেডকোয়ার্টার্সে যাইতে হইবে। তাহারা যখন অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন পথিমধ্যে ক্যাপ্টেন টেটের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়।

ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ীতে করিয়াই তখন তাহারা অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রশ রোডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর দুইখানা গাড়ীতে কিরিয়া তাহারা এ, এফ, আই অস্ত্রাগারে

উপস্থিত হন। অস্ত্রাগার হইতে প্রায় ২০ হাত দূর হইতে তাহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইতে থাকে। তখন আশ্রয় লাভের জন্য গাড়ীর পশ্চাতে তিনি গমন করেন, কিন্তু একটি বুলেট আসিয়া তাহার মস্তকের বাম পার্শ্বে বিদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি ব্রিজের দিকে দৌড়াইয়া যান।

সাক্ষীকে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

প্রঃ—জেল ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ীতে করিয়া একটি বন্দুক নিয়াছিলেন কি?

উঃ—আমার স্মরণ হয় না।

প্রঃ—তিনি কি আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, অস্ত্রাগার আক্রান্ত হইয়াছে?

উঃ—না, বলেন নাই।

প্রঃ—ক্যাপ্টেন টেট বলিয়াছিলেন?

উঃ—না, বলেন নাই। বঙ্গবাণী ৩০-১০-৩০]

ডি. এস, পি র সাক্ষ্য: ফরিয়াদী পক্ষের ৫২নং সাক্ষী ডি; এস, পি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মল্লিক অতঃপর সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রামে ৬ই এপ্রিল ১৯৩০, কার্যভার গ্রহণ করার পর হইতে মার্চ মাসের শেষপর্যন্ত জেলার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল।

যখন তিনি কাজে যোগদান করেন তখন একজন ইন্সপেক্টার, ৫ জন সাব-ইন্সপেক্টার, ৬ জন সহকারী সাবইন্সপেক্টার, ৪ জন হেড কনেস্টবল এবং ১২।১৩ জন কনেস্টবল ছিল। রেলওয়ে স্টেশন, সভা সমিতির উপর লক্ষ্য রাখাই তাহাদের কাজ।

নভেম্বরের শেষ ভাগে তাহারা এই আদেশ পান যে, ছয়জন ভূতপূর্ব রাজবন্দীর উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের নাম শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল এবং চারুবিকাশ দত্ত। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা গুপ্তচরের সংখ্যা বাড়াইয়া দেন। বিশেষ কোন সংবাদ থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট জানাইবার আদেশ দেওয়া হয়।

সাক্ষীকে অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু জেরা করেন।

প্রঃ—আপনি জেলার গুপ্তচর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে ভূতপূর্ব রাজবন্দীদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—অস্ত্রাগার আক্রমণের পূর্বে কেহ কি আপনার নিকট ঐরূপ কোন রিপোর্ট করিয়াছিলেন?

উঃ—আমার স্মরণ হয় না।

প্রঃ—আপনি শুধু, আমার স্মরণ হয় না, বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। হ্যাঁ কিম্বা না বলিবেন। আচ্ছা, আপনি আপনার কোনও গুপ্তচর অথবা তাহাদের উর্দ্ধতন কোনও কর্মচারী হইতেএইরূপ কোনও রিপোর্ট পাইয়াছিলেন কি যে, গণেশবাবু অথবা অনন্তবাবু—কিম্বা লোকনাথবাবু আক্রমণের জন্য কোনও প্রকার আয়োজন করিতেছেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—তাহারা যে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়াছিলেন কি?

উঃ—হ্যাঁ, শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষ কলিকাতা হইতে যে অস্ত্র আনয়ন করিতেছেন তাহা তিনি শুনিয়াছেন। এই সংবাদ পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্টের মারফতে আসে। এবং তাহা খুব সম্ভব জানুয়ারী মাসে।

প্রঃ—এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়ার পর ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে কোনদিন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ী খানতল্লাসী করিয়াছিলেন কি?

উঃ—না।

প্রঃ—রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ীতে একটি বোমা ফাটিয়াছিল জানেন কি?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—ঐ সম্পর্কে বর্তমান আসামীদের কারও বাড়ী খানাতাল্লাসী করিয়াছিলেন কি?

উঃ—না।

প্রঃ—১৮ই এপ্রিল রাত্রির অন্ধকার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?

উঃ—খুবই অন্ধকার ছিল।

প্রঃ—ঘটনার পরে কোতোয়ালী হইতে যাইয়া আপনি কি করিলেন ? ঘুমাইতেছিলেন কি ?

উঃ—না বস্তীতে বসিয়া আমি লক্ষ্য রাখিতেছিলাম।

প্রঃ—আক্রমকারীদের প্রতি একবারও গুলি চালাইয়াছিলেন ?

উঃ—না, যখন আমরা লাইনের দিকে অগ্রসর হই, তখন আমাদের প্রতি গুলি বর্ষিত হয়। সুতরাং আমরা পিছনে ফিরিয়া যাই এবং বাড়ির পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করি।

প্রঃ—আচ্ছা আপনি পুলিশবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ একবারও গুলি চালাইতে পারিলেন না—ইহা কি হাস্যকর ব্যাপার নহে ?

উঃ—আমরা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাই নাই। রাত্রির অন্ধকারে কিছু না দেখিয়া গুলি চালান অবিবেচকের কাজ হইত।

অতঃপর সাক্ষীকে কালার পুলের ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে পর শ্রীযুক্ত জে, কে, ঘোষাল পুনরায় সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসুর প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, যখন ফণী নন্দীকে গ্রেপ্তার করিয়া শিকলে বাঁধিয়া আপনার সকাশে আনয়ন করা হয়, তখন সে উলঙ্গ অবস্থায় ছিল। আপনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?

উঃ—না, আমি ঐ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করি নাই।

প্রঃ—আপনি একজন উচ্চাপদস্থ পুলিশ কর্মচারী। 'আমি তদন্ত করি নাই'—এই কথা বলিলে আপনার পক্ষে অন্যায় করা হয়।

[বঙ্গবাণী ২-১১ ৩০]

দারোগা হেমচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষ্য : এইদিন ফরিয়াদী পক্ষের ৫নং সাক্ষী দারোগা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুপ্ত সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ঢাকা হইতে ১৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে তিনি চট্টগ্রাম আগমন করেন। কোতোয়ালীতে যাওয়ার পরই সংবাদ পাইয়া তিনি কতিপয় সার্জেন্ট,

ডি আই জি এবং এস জি একদল পুলিশসহ দেব পাহাড়ে গমন করেন। তথায় আসামী মনা গুপ্তের বাটী এবং সমগ্র পাহাড়টি তল্লাসী করেন। ৫ই মে তিনি মোহরায় আসামী ফকির সেনকে গ্রেপ্তার করেন। ৭ই মে রাত্রি প্রায় ৮-৩০ টার সময় তিনি সংবাদ পান যে, কতিপয় সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি নদী পার হইয়া ওপারে যাইতেছে। এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি আরও কতিপয় পুলিশকর্মচারী সহ সেই দিকে গমন করেন। নদী পার হইয়া তাহারা দেখিতে পান যে, প্রায় ছয়জন লোক চলিয়া যাইতেছে। তখন তাহারা (পুলিশবাহিনী) সাহায্য পাইবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে পলায়নকারীরা অদৃশ্য হইয়া যায়।

কালার পুলের ঘটনা : সাক্ষী বলেন যে, পরে তাহারা কালার পুল অভিমুখে গমন করেন। যখন তিনি সদলবলে কালার পুল অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন কিছু দূরে তাহারা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পান। কালার পুলে যাইয়া তিনি দেখিতে পান যে, ইতিমধ্যেই ডি, আই, জি এবং কর্নেল স্মিথ তথায় পৌছিয়াছেন এবং আসামী সুবোধ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কনেস্টবল প্রসন্ন বড়ুয়া গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল।

সমিরপুর অভিমুখে চারিজন আসামী গিয়াছে শুনিয়া ডি, আই, জি কতিপয় গুর্খা সৈন্য সহ সেইদিকে গমন করেন। যখন তাঁহারা একটি পুকুরের নিকট দিয়া যাইতে থাকেন তখন তাহাদের প্রতি গুলি বর্ষিত হয়। ৪।৫ মিনিট উভয় পক্ষ গুলি চালাইবার পর বিদ্রোহী পক্ষ চুপ করে। তৎপর ঘটনাস্থলে যাইয়া তাহারা দেখিতে পান যে, ৩ জন যুবক নিহত হইয়াছে এবং একজন আহত অবস্থায় রহিয়াছে।

নিহত তিনজনের নাম মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন এবং স্বদেশ রায়। আহত দেবপ্রসাদকে তিনি (সাক্ষী) জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কিছু বলিতে ইচ্ছা করে কিনা। দেবপ্রসাদ উত্তরে বলেন যে, 'এই কি মিঃ লোম্যান। তাহা হইলে তাহাকে আমি গুলি করিতে ইচ্ছা করি।' অতঃপর সে তাহার দক্ষিণহস্ত দেখাইয়া বলে যে, 'এই হাত জখম

বলিয়া, নচেৎ আমায় জীবিত ধরিতে পারিতে না।'

এই সময় শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষী মিঃ লোম্যান সম্বন্ধে উল্লেখ করায় তাহা নথিভুক্ত করিতে আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, 'যদি মিঃ লোম্যান এখানে উপস্থিত থাকিত তবে তাহাকে গুলি করিতাম' —এই জবানবন্দীর কোন কারণ থাকিতে পারে না।

খান বাহাদুর আব্দুল হাই—কিন্তু এই ইচ্ছা কি খারাপ নহে?

শ্রীযুক্ত বসু ঃ হ্যাঁ, যদি মিঃ লোম্যান তথায় থাকিতেন।

[বঙ্গবাণী ৫-১১-৩০]

হেম গুপ্তকে জেরা ঃ আসামী পক্ষের কৌঁশুলী শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—২২শে এপ্রিল অপরাহ্নে আপনারা সদলবলে জালালাবাদ পাহাড় অভিমুখে অগ্রসর হন। আচ্ছা, কতিপয় রাজদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনারা কি পুলিশবাহিনী হিসাবে যান, না যুদ্ধার্থ সামরিক বাহিনী হিসাবে যান?

উঃ—আমার মতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়া পুলিশ কর্মচারীগণই তথায় যান।

প্রঃ—বিদ্রোহীরা যখন পর্বতের চূড়া হইতে গুলি বর্ষণ করে, তখন আপনারা কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন?

উঃ—পাহাড়ের পাদদেশ হইতে প্রায় ৫০ ফুট দূরে একটি খাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

প্রঃ—আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনারা গুলি চালাইয়াছিলেন?

উঃ—আমার সাথের পুলিশ গুলি চালায়।

প্রঃ—গুলি চালাইবার আদেশ কে প্রদান করেন?

উঃ—ক্যাপ্টেন টেট্।

প্রঃ—তিনি তো পুলিশ কর্মচারী নহেন? আপনি বলিতে পারেন তিনি কাহার আদেশক্রমে গুলি চালাইবার হুকুম দেন?

উঃ—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

প্রঃ—আপনারা অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদের ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—কিম্বা পাহাড়টিকে ঘিরিয়া বিদ্রোহীদের ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন?

উঃ—না। [বঙ্গবাণী ঃ৯-১১-৩০]

আরও জেরা ঃ প্রঃ—আপনি ফকির সেনকে তাহাব পল্লীগ্রামের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লঞ্চে করিয়া আনিয়াছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—লঞ্চের উপর আপনি ফকিরের নিকট হইতে একটি জবানবন্দী বাহির করিবার জন্য তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনি কি তাহাকে বলেন নাই—'বলবি-বলবি, যখন টরচার (পীড়ন) হবে, তখন বলবি।'

উঃ—না, আমি তাহা বলি নাই।

প্রঃ—যে সময় সে হাজতে ছিল, সে সময় আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিতেন?

উঃ—মাঝে মাঝে।

প্রঃ—আপনি কি জানেন যে, তাহাকে জালালাবাদে নিহত ব্যক্তিদের ফটোগ্রাফ দেখান হইয়াছিল?

উঃ—আমি জানি না।

প্রঃ—যখন ফকিরের পরিবারের লোকেরা কোতোয়ালীতে তাহার সহিত দেখা করেন, তখন জনৈক কর্মচারী ফকিরকে বলিয়াছিল যে, সে যদি একটি জবানবন্দী না দেয়, তবে তাহার পরিবারের লোকদের উপর উৎপীড়ন করা হইবে,—তখন কি আপনি কাছে ছিলেন?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনার জ্ঞাতসারে কি ফকিরকে বলা হইয়াছিল যে, যদি তিনি একটি জবানবন্দী দেন, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে আর কোর্টে উহার পুনরুক্তি করিতে হইবে না?

উঃ—না, আমি এরূপ কিছু জানি না। [বঙ্গবাণী ১১-১১-৩০]

ফেণী স্টেশনের ঘটনা: সরকারী পক্ষের সাক্ষী ফেণীর পুলিশ ইন্সপেক্টার ফজল বসির তাহার সাক্ষ্যে বলেন—তিনি সাব ইন্সপেক্টার যতীন্দ্র রায় এবং কয়েকজন কনেস্টবল সহ গত ২২শে এপ্রিল রাত্রে ফেণী রেল স্টেশনে ডিউটিতে ছিলেন। তিনি ভাটিয়ারীর স্টেশন মাস্টারের নিকট হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পান যে, চারটি সন্দিগ্ধ রকমের যুবক ৩ নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছে। উক্ত ট্রেনখানি রাত্রি প্রায় একটায় ফেণী স্টেশনে আসে।

তাহারা তখন উক্ত যুবকদের খোঁজে ট্রেনের নিকট গমন করেন। গার্ড তাহাদিগকে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া দিয়া বলেন যে, যুবকগণ ঐ কামরায় ভ্রমণ করিতেছে। সাব ইন্সপেক্টার যতীনবাবু তাহাদিগকে নামিতে বলেন। কিন্তু তাহারা যতীনবাবুকে অনুরোধ করিয়া বলে, তাহারা যদি নামে তবে ট্রেন ফেল করিবে।

তারপর তাহাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে সাক্ষী ছাড়া সাবইন্সপেক্টার যতীনবাবু, একজন হাবিলদার, ৪।৫ জন কনেস্টবল এবং কয়েকজন রেল কর্মচারী ছিলেন। যুবকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় যে, পায়খানায় যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া যায়। হাবিলদার এবং দুইজন কনেস্টবল তাহার সঙ্গে যায়।

সাব ইন্সপেক্টার যখন একজন যুবকের দেহ খানাতল্লাশ করিতে যায়, তখন অপর একজন সাক্ষীর দিকে গুলি ছোঁড়ে। তারপর আর একটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। সাক্ষী তারপর লাফাইয়া বাহির হন। নিকটে একজন টিকেট কালেকটার ছিল, তাহার আঙ্গুলে গুলি লাগে। ইহার পর তিনি চারটি এবং বাহির হইতে ২।৩টি গুলির শব্দ শুনিতে পান। গুলি ছোঁড়ার পর ঘরের মধ্যের এবং বাহিরের যুবকগণ দৌড়াইয়া পালায়।

পরে তিনি দেখিতে পান সাব ইন্সপেকটার যতীন রায়, কনেস্টবল মণীন্দ্র পাল এবং ইয়াকুব আলি আহত হইয়াছে। মণীন্দ্র একজন আততায়ীর হাত হইতে একটি গুলি ভরা ছয়নলা রিভলবার কাড়িয়া লইয়াছিল। পাবলিক প্রসিকিউটার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ঐসব যুবকদের

কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন কিনা। সাক্ষী বলেন—তিনি দুইবার—একবার জুলাই মাসে, আর একবার অকটোবর মাসে সনাক্তকরণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারই তিনি কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন নাই।

পাবলিক প্রসিকিউটার তখন সাক্ষীকে ডকের উপর আসামীদের মধ্য হইতে কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারেন কিনা সে বিষয় চেষ্টা করিতে বলেন। আসামী পক্ষের মিঃ বসু ইহাতে আপত্তি করেন।

কৌঁশুলী জে, কে, ঘোষাল সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—যুবকেরা কি পোষাক পরিয়াছিল তাহা কি আপনার মনে আছে?

উঃ—তাহাদের পরনে ধুতি ছিল। একজনের গায়ে চাদর এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়—অন্যান্যদের গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ছিল।

প্রঃ—কেহ যদি বলে যে, তাহাদের গায়ে কালো কোট ছিল, তবে তাহা ভুল হইবে?

উঃ—হ্যাঁ, যতদূর আমার স্মরণ আছে।

জে, কে, ঘোষাল (আদালতের প্রতি): আমার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কারণ—সাব ইন্সপেকটার যতীন রায় জবানবন্দী দিয়াছেন যে, তাহাদের দুইজনের গায়ে কালো কোট ছিল।

ক্যাপ্টেন টেট্ এর সাক্ষ্য: এই দিবস ফরিয়াদী পক্ষে ক্যাপ্টেন টেট্ সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ১০ টার সময় তাহার প্রহরী তাহাকে জাগরিত করিয়া বলে যে, স্বদেশীরা পুলিশ লাইন এবং অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়াছে।

মেসার্স স্যুটার এবং লজএর বাটী যে পাহাড়ে অবস্থিত তাহার বাটীও সে স্থানেই অবস্থিত। তাহার স্ত্রীকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য তিনি স্ত্রীকে নিয়া গাড়ীতে করিয়া ক্লাবের দিকে যাইতে থাকেন। তিনি মিসেস লজ এবং তাহার স্ত্রীকে এজেন্টের বাংলো অভিমুখে প্রেরণ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহ অস্ত্রাগার অভিমুখে অগ্রসর হন। সাথে সাথেই তাহাদের উপর গুলি বর্ষিত হইতে থাকে। তাহার

গাড়ীর জানালার স্ক্রীনের মধ্য দিয়া দিয়া ৪।৫টি বুলেট প্রবেশ করে। তাহারা তখন রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। স্টেশন পৌঁছিয়াই তাহারা জেটীস্থিত অস্ত্রাগারে যাইবার নিমিত্ত একখানা এঞ্জিনের জন্য আদেশ প্রদান করেন। জেটিতে গমন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট উইলকিনসন একটি জাহাজ উঠিয়া বিনা তারে এই সংবাদ প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন।

ইত্যবসরে সাক্ষী অস্ত্রাগার হইতে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র বাহির করেন। পরে তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইয়া এ, এফ, আই হেড কোয়ার্টার অভিমুখে গমন করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অস্ত্রাগার তখনও জ্বালিতেছিল। সাক্ষী বলেন যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া প্রায় ৪৭৫০০ টাকার ক্ষতি সাধন করিয়াছে। [বঙ্গবাণী ১২-১১-৩০]

সুরেশ দস্তিদারের সাক্ষ্য: ৬৯ নং সাক্ষী স্থানীয় এক দর্জির দোকানের কাটার সুরেশ দস্তিদার সাক্ষ্য প্রদান করে। সাক্ষী বলে যে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী খাকী রংয়ের ২টি ড্রিল কোট সে গণেশ ঘোষকে দেয়। ড্রিল কোর্টের অর্ডার শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষই দিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ দোকানে শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংকে নিয়া আসেন। শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং এর মাপও লিখিয়া নেওয়া হয়।

এই সময় শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিবার জন্য সাক্ষীকে বলা হয়। ডকে আসামীগণকে দেখিয়া সাক্ষী বলে যে, তথায় গণেশ ঘোষ নাই। সাক্ষীকে তখন ডকের আরও নিকটে যাইয়া দেখিতে বলা হয়। কিন্তু সাক্ষী বলে যে, আসামীদের মধ্যে সে গণেশ ঘোষকে দেখিতে পাইতেছে না।

প্রেসিডেন্ট:—তাঁহাকে তুমি পুর্বে জানিতে ?

উঃ—হাঁ।

প্রেসিডেন্ট:—এবং এখন তুমি তাহাকে এখানে দেখিতেছ না ?

উঃ—আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমি আসামীদিগকে আরও ভাল করিয়া দেখিতে চাই।

আসামীগণকে অতঃপর বারান্দায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। সাক্ষী অনন্ত সিংকে সনাক্ত করিতে সক্ষম হয় কিন্তু গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিতে পারে না। সাক্ষী বলে যে, আসামীদের মধ্যে গণেশ ঘোষ নাই।

প্রেসিডেণ্ট ঃ—পূর্বেও তুমি গণেশ ঘোষকে জানিতে ?

উঃ—হাঁ।

প্রেসিডেণ্ট ঃ—সে কোথায় থাকিত ?

উঃ—সদর ঘাটে তাহার কাপড়ের দোকান ছিল এবং ঐ দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় আমি তাহাকে দোকান ঘরের মধ্যে দেখেয়াছি।

প্রেসিডেণ্ট ঃ—সেই দোকান দেখাইয়া দিতে পার ?

উঃ—হাঁ।

শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর রক্ত বমন ঃ (সিউড়ী জেলে স্থানান্তরিত)
সিউড়ী, ২১শে নভেম্বব, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠের মামলার আসামী শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ চক্রবর্তীকে এখানে আনিয়া স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছে। তাঁহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। তাঁহাকে অবজারভেসন ওয়ার্ডে রাখা হইয়াছে। শোনা যায়, থুথুর সঙ্গে তাঁহার দুইবার রক্ত উঠিয়াছিল। [বঙ্গবাণী ২২-১১-৩০]

গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেকটারের সাক্ষ্য ঃ সরকারী কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তরে গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেকটার সারদা ভট্টাচার্য বলেন যে, ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে তিনি তাহার বাসাতেই ছিলেন। ১০টা কিম্বা ১১টার মধ্যে একটা কনেস্টবল আসিয়া তাহাকে জানায় যে, পুলিশ লাইন আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, আক্রমণকারীরা আসিয়া তাহার বাটী আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং তিনি বাড়ী পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার নিকট একটি ও তাহার প্রহরীর নিকট একটি রিভলবার ছিল। তাহারা উভয়েই বাড়ী পাহারা দিতে থাকেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—পরদিন আপনি যখন গনেশবাবুর বাটী খানাতল্লাসী করিতে যান, তখন সাক্ষী হইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নব নন্দীকে কি আপনি নিয়া যান ?

উঃ—তিনি অল্পসময় তথায় ছিলেন, পরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

প্রঃ—আপনার খানাতল্লাসীর কার্যপ্রণালী অনুমোদন করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়াই কি তিনি চলিয়া যান ?

উঃ—না।

প্রঃ—রাত্রে কনস্টেবলের মুখে শুনিয়াই কি আপনার সন্দেহ হইল উহা গণেশ ঘোষের কাজ ?

উঃ—সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষের দলের কাজ বলিয়া সন্দেহ হয়।

প্রঃ—গণেশ ঘোষকেই যদি আপনার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা হইলে তখনই কেন তাহার বাড়ীতে যাইয়া খানাতল্লাসী করেন নাই ?

(সাক্ষী উত্তরদানে বিরত থাকেন)

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন, আপনার বাড়ী আক্রান্ত হইবার ভয়ে আপনার ভৃত্যসহ আপনি পাহারা দিতেছিলেন। কিন্তু যদি সমস্ত পুলিশ কর্মচারীই ঐ রাত্রিতে স্ব স্ব বাড়ী পাহারা দিতেন, তাহা হইলে চট্টগ্রামের কি অবস্থা দাঁড়াইত বলিতে পারেন ?

উঃ—আমি জানি না ঃ

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন যে, বাড়ীর বাহির না হইলে উহা পাহারা দেওয়াতেই আপনায় কর্তব্য শেষ হইয়াছিল ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তাই বলুন। চট্টগ্রাম পুলিশের কতদূর কর্তব্যজ্ঞান আছে তাহা আমাদের জানা দরকার। আচ্ছা, আপনার বাড়ী হইতে কোতোয়ালী কতদূর ?

উঃ—খুব নিকটেই।

প্রঃ—আপনার বাড়ী পাহারা দিবার জন্য তথায় সাহার্য্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ?

উঃ—আমি তাহাদের সাহার্য্য চাই নাই।

প্রঃ—আপনাদের গুপ্তচর বিভাগের কার্য যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, অস্ত্রাগার আক্রমণ দ্বারা তাহা বোঝা যায় না কি?

উঃ—না।

অতঃপর কৌঁসুলী সাক্ষীকে একটি কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলেন—আপনি খানাতল্লাসী তালিকায় ইহাকে বোমা তৈয়ারী করিবার যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কি?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—কিন্তু আপনি শুনিয়া বোধহয় আশ্চর্য হইবেন যে, গণেশ ঘোষের পিতা তামাক রাখিবার জন্য এই বাক্সটি ব্যবহার করিতেন

[বঙ্গবাণী ২৪-১১-৩০]

চাঁদপুর গুলি বর্ষণের বিস্তৃত বিবরণ: ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় শুনানী আরম্ভ হইল প্রথমেই সরকারী কৌঁসুলী আদালতকে জানান যে, এই মামলায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালিপদ চক্রবর্তী নামক দুইজন ফেরারী আসমীকে চাঁদপুরের নিকটবর্তী এক জায়গায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উক্ত আসামীদ্বয় চাঁদপুরের রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টারকে গুলি মারিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের নিকট রিভলভার বোমা ইত্যাদি পাওয়া গিযাছে। ঐ রিভলবারই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার হইতে খোয়া গিয়াছিল। ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই ঐ আসামীদ্বয় ফেরার অবস্থায় থাকে। এক্ষণে এই আসামী দুইজনকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী এবং পুলিশ ইন্সপেক্টারকে হত্যার দরুন বিচারার্থ কুমিল্লা নেওয়া হইবে। [বঙ্গবাণী: ৮-১১-৩০]

ফেণীতে গুলি মারার আরও নূতন সংবাদ: ইয়াকুব আলী পূর্বে ফেণী পুলিশ থানায় কনস্টেবলরূপে চাকুরী করিত। ২২শে এপ্রেল রাত্রিতে ফেণী স্টেশনে গুলি দুর্ঘটনায় তাহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তজ্জন্য বর্তমানে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদাম করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় শুনানী পুনরায়

আরম্ভ হইলে সে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিয়া বলে যে, উক্ত আসামীই ফেণী স্টেশনে মলমূত্র ত্যাগ করিবার অছিলায় বাহিরে গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আনন্দবাবুকে দেখাইয়া বলে যে সে তাহাকে এবং কনস্টেবল মণীন্দ্র পালকে গুলি করিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংকে দেখাইয়া বলে যে, সেই প্রথম গুলি চালায়।

প্রেসিডেন্টের আপত্তি: আদালতের বারান্দায় যখন সনাক্তকরণ হইতেছিল এবং সাক্ষীর মন্তব্য প্রেসিডেন্ট লিখিয়া লইতেছিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট জুনিয়ার কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত পুলিন দত্তকে বলেন যে, তিনি যাহা লিখিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত দত্তের তাহা দেখা উচিত নহে। শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে, তিনি কিছুই দেখেন নাই, শুধু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সনাক্তকরণ ব্যাপার শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু যখন সাক্ষীকে জেরা করিতে যাইবেন, তখন আসামীদের কাঠগড়া হইতে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিং তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। আদালতের অনুমতি নিয়া শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাদের নিকট যান। তখন প্রেসিডেন্ট ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ বলেন যে, তাঁহাদের কৌঁসুলীকে রীতিমত অপমান করা হইয়াছে এবং তাঁহারা কিছুতেই উহা সহ্য করিবেন না।

প্রেসিডেন্ট:—আমার লেখা জুনিয়ার কৌঁসুলীকে উঁকি মারিয়া দেখিতে কিছুতেই আমি অনুমোদন করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত দত্ত:—কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে, আমি ঐ স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম মাত্র এবং হঠাৎ আমার চক্ষু লেখার উপর পড়িয়াছিল।

প্রেসিডেন্ট:—আচ্ছা, আমি এই উত্তরেই সন্তুষ্ট রহিলাম।

শ্রীযুক্ত বসু:—আমার মনে হয়, সমগ্র বিষয়টি ভুলবশতঃই উদ্ভব হইয়াছে। (অনন্তবাবু ও গণেশবাবুর প্রতি) এ বিষয় নিয়া আর অধিক গণ্ডগোল করা সঙ্গত নহে। মামলার কার্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল।

অতঃপর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী ভূতপূর্ব কনস্টেবল মণীন্দ্র পালকে মিঃ জে. কে. ঘোষাল জেরা করেন।

প্রঃ—সনাক্তকরণের জন্য তুমি চট্টগ্রাম জেলে গিয়াছিলে?

উঃ—হ্যাঁ, ঐ সময় সেখানে ইন্সপেক্টারও ছিলেন।

প্রঃ—সেখানে কাহাকেও সনাক্ত করিয়াছিলে?

উঃ—না, আমি সনাক্ত করিতে পারি নাই। [বঙ্গবাণী: ১৮-২১-৩০]

চট্টগ্রাম শহরময় ভীষণ চাঞ্চল্য: চট্টগ্রামে কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ষদেশে আদালত গৃহসমূহের নিকট ভূগর্ভ হইতে পুলিশ চারিটি বাক্স খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। ঐগুলি ইলেকট্রিক তার দিয়া বাঁধা ছিল এবং তারের একপ্রান্ত মাটির নীচ দিয়া প্রায় ৫০ ফুট দূর পর্যন্ত গিয়াছিল। বাক্সগুলি ডিনামাইট পূর্ণ বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। ঐগুলি খোলা হয় নাই—শীলমোহর করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর এক স্থানে একটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ অনুরূপ তিনটি বাক্স পাইয়াছে। প্রত্যূষে নিবারণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি একটি টিন বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ধৃত হয়। উহার বাড়ী কুমিল্লায়। প্রকাশ, তাহারই এজাহারের ফলে নল পাড়ায় একটি বাড়ী খানাতল্লাস কালে অনুরূপ আরও তিনটি টিন পাওয়া যায়।

অপরাহ্নে আদালতের বাড়ীসমূহের নিকট কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরও চারটি টিন পাওয়া যায়। ঐগুলির চারিদিকে ইলেকট্রিক তার দিয়া বাঁধা ছিল এবং তারের একপ্রান্ত তৃণাচ্ছাদিত ভূপৃষ্ঠের নীচে প্রায় ৫০ ফুট পর্যন্ত গিয়াছিল।

টিনগুলি যখন ১৫ ইঞ্চি গভীর মৃত্তিকাতল হইতে উত্তোলিত করা হয়, তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তথায় ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারকারী স্পেশাল ট্রাইবিউনালের কমিশনারগণ পরে ঐ স্থান পরিদর্শন করেন। [বঙ্গবাণী: ৩-৬-৩১]

হিন্দু যুবকগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি: চট্টগ্রাম, ৮ই জুন। অদ্য অপরাহ্নে ১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোকদিগের উপর

সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। উপরোক্ত বয়সের যুবকগণ এবং ছাত্রগণ সর্বদা লাল দীঘি ও নদীর তীরে অপরাহ্নে বেড়াইতে যান। তাহারা দ্রুতপদে রাত্রি ৭ ঘটিকার মধ্যে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ৭-৩০ মিনিটের মধ্যে উপরোক্ত স্থান সমূহ ও রাস্তা-ঘাট হইতে হিন্দু ভদ্রলোকগণ চলিয়া যাওয়ায় শহর মরুভূমির ন্যায় দেখা যাইতেছে। [বঙ্গবাণী: ৯-৬-৩১]

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা: চট্টগ্রাম, ১লা অক্টোবর। নূতন স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সমক্ষে গত সোমবার ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। সোমবার আরম্ভ করিয়া মঙ্গলবারে জলযোগের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী উকিল রায় বাহাদুর রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা হইতে আগত) তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করতঃ মামলার বিবরণ কমিশনারগণের সমক্ষে উপস্থিত করেন।

এই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ না হইতেই কমিশনারগণ রায় প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবার সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইবার পর প্রথম সরকারী সাক্ষী এস. ডি ও, মিঃ রায় সাক্ষ্য দেন ও বলেন, তিনি নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেন আসামীদ্বয়ের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর আসামীদের বিরুদ্ধে কিরকম চার্জ হইতে পারে সরকারী উকিল তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেসিডেণ্ট সকল আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। অতঃপর ৭ জন আসামী শ্রী অর্দ্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, সুনীল সেন, প্রভাত দত্ত ও অনিল রক্ষিত উক্ত ধারায় আপনাদিগকে দোষী বলিয়া এবং অপর ৪ জন হৃদয় দাস, চন্দ্রকুমার বসু, নিশি দে ও আশুতোষ দে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করে।

অতঃপর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ সেন (অবশ্য অন্য দুই জন কমিশনারের সম্মতিক্রমে) নিশি দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসুকে বেকসুর খালাস দেন ও অপর ৮ জনের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেনকে ৩ বৎসর, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল

মল্লিককে দুই বৎসর এবং অনিল রক্ষিত ও প্রভাত দত্তকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রেসিডেন্ট তাহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে কারাগারে বি শ্রেণীভুক্ত রাজবন্দীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। এক্ষণে শুধু একজন আসামী হৃদয় দাসের বিরুদ্ধে এই স্পেশাল ট্রাইবিউনালের মামলা চলিতেছে। [বঙ্গবাণী: ৬-১০-৩১]

পুলিশ ইন্সপেক্টার হত্যার বিচার: চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খানবাহাদুর আসানুল্লার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী হরিপদ ভট্টাচার্যের বিচার গত সোমবার হইতে অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ সুকুমার বসুর আদালতে আরম্ভ হইয়াছে কোর্ট গৃহে ও বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছে। সরকার পক্ষে রায়বাহাদুর কামিনীকুমার দাশ ও আসামী পক্ষে এ্যাডভোকেট অন্নদাচরণ দত্ত, জ্ঞানদাচরণ দত্ত, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, রমাপ্রসন্ন সিংহ ও আরও কয়েকজন উপস্থিত হইতেছেন।

প্রথমে সরকারী সাক্ষী দারোগা সিদ্দিক দেওয়ান স্বচক্ষে খান বাহাদুরকে আসামী কর্তৃক গুলি করার ঘটনা ও তৎপর স্বহস্তে আসামীকে ধৃত করার ব্যাপার বর্ণনা করিলে আসামীর উকিল অন্নদাবাবু সাক্ষীকে প্রায় ২ দিন জেরা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সাক্ষী গভর্নমেণ্টের অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে—আসামীর নিকট যে রিভলবার পাওয়া যায়, তাহা হইতেই যে গুলি করা হইয়াছিল তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন। অন্নদাবাবু এই ব্যক্তিকেও বহুক্ষণ ধরিয়া জেরা করিয়াছেন। এই চাঞ্চল্যকর মামলার খবর জানিবার জন্য শহরের লোকের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ নেলসন চট্টগ্রাম হাঙ্গামার তদন্তে ব্যাপৃত আছেন। এ পর্যন্ত বহু ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহাদের অনেকেই, এমন কি মহকুমা হাকিম মিঃ রায় ও সিনিয়ার ডেপুটি মিঃ নন্দীও সাক্ষ্যে বলিয়াছেন,—হিন্দু দোকানপাট ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারের সময় পুলিশ নিশ্চেষ্ট ছিল। এমন কি থানার সামনেই মিঃ নন্দীর

মাথায় জখম করা হয়। অথচ দোষী ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য পুলিশ অগ্রসর হয় নাই। [বঙ্গবাণী : ৬-১০-৩১]

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

সরকারী পক্ষের সওয়াল : চট্টগ্রাম, ৩০শে নভেম্বর। গত দুই সপ্তাহ চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলিপুর হইতে আগত) সরকার পক্ষের সওয়াল করিতেছেন। তাহা এখনও চলিতেছে। আসামীরা কিভাবে ভূতপূর্ব রাজবন্দী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল (বর্তমান আসামীদের মধ্যে), অম্বিকা চক্রবর্তী, সুর্য সেন (পলাতক) ও নির্মল সেন (পলাতক)—এই ছয়জন ব্যক্তির নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক ভীতিপ্রদ ষড়যন্ত্রের দল গড়িয়া তোলে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া পরিশেষে ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) রাত্রে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনের ও রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী সৈন্যের অস্ত্রাগার ঘর লুণ্ঠন করে ও প্রায় ৮ জন (প্রহরী ও অন্যান্য) লোকের প্রাণ নাশ করে, টেলিফোন অফিসের তার প্রভৃতি অগ্নিতে বিনষ্ট করে, ধুম ও লাঙ্গলকোট স্টেশনে রেল-লাইন উৎপাটন করে, ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলে এবং তৎপরে ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যার সময় জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশ ও মিলিটারী লুণ্ঠনকারীদের সন্ধানে ও গ্রেপ্তারে যাওয়ায়, তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে।

সেই রাত্রে আবার কয়েকজন ফেণী স্টেশনে ১ জন দারোগা ও ২ জন কনস্টেবলকে গুলি করিয়া পলায়ন করে ও ৬ই মে রজনী যোগে কালার পুল অঞ্চলে ৬ জন সশস্ত্র আসামী পুলিস ও গ্রামবাসী কর্তৃক তাড়িত হইয়া ৩জন গ্রামবাসী ও ১ জন কনস্টেবলকে হত্যা করে। এইসব যে এই আসামীদের দ্বারা গঠিত একই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য কার্য, তাহা ইতিমধ্যেই সরকারী উকিল প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তৎপর রায়বাহাদুর সাক্ষ্য আলোচনা করিয়া আরও বলিয়াছেন যে, ঘটনার পরদিন হইতে এই দলের কাহাকেও শহরে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, এবং যে মাত্র ১ জনকে পাওয়া গেল, তাহার সর্বাঙ্গ অগ্নিতে

পুড়িয়া যাওয়ায় জখমদৃষ্টে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুলিশ লাইনে যখন অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখন সেখানেই এই জখম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে মৃত্যুর পূর্বে যে বিবৃতি দিয়াছে তাহাতে পূর্বরাত্রে তাহাদের দলের কার্যাবলী বিষয়ে কিছু বিবরণ প্রকাশ পায়।

৫ জন আসামীর স্বীকারোক্তি কিভাবে উক্ত ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে, তাহার সম্বন্ধে এক্ষণে রায়বাহাদুর সওয়াল করিতেছেন।

[বঙ্গবাণী : ৩-১২-৩১]

আসামী পক্ষের সওয়াল : চট্টগ্রাম, ১১ই ডিসেম্বর। অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী উঠিলে আসামী পক্ষের এ্যাড-ভোকেট মিঃ সন্তোষকুমার বসু তাঁহার সওয়ালে বলেন যে, হত্যার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। অস্ত্রাগারে হানা দিবার সময় যে দুইখানি মোটরগাড়ী জোর করিয়া লওয়া হইয়াছিল, আক্রমণকারীদের যদি মতলব থাকিত, তাঁহারা সেই ড্রাইভারদ্বয়কে গুলি করিয়া হত্যা করিতে পারিত, কিন্তু একজন ড্রাইভারকে হাত পা বাঁধিয়া একটা ঘরের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছিল এবং অপর ব্যক্তিকে ক্লোরফর্ম করিয়া কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান করিয়া রাখিযা গিয়াছিল।

টেলিগ্রাফ অফিসে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং তথাকার কর্মচারী-গণকেও ঐরূপ করা হইয়াছিল। উক্ত কর্মচারীদের সাক্ষ্য বিপজ্জনক হইবে—উহা জানিয়াও আক্রমণকারীরা তাহাদের হত্যা করে নাই।

হিমাংশু সেনকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন আগুনে দগ্ধ হইয়া জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। সে নিজেকে অপরাপরের সহিত জড়িত করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করে। মিঃ বসু বলেন, তাহার বিবৃতি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

সহায়রাম দাস ও ফকির সেনের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে মিঃ বসু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্ররোচনায় ফেলিয়া এবং মুক্তির লোভ দেখাইয়া ভীষণ আতঙ্কের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের নিকট হইতে উহা আদায় করা হইয়াছিল। তাহারা অব্যবহিত কাল পরেই

তাহাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। যাহাতে তাহারা উহা না করে সেজন্য মহকুমা হাকিম যথেষ্ট উদ্বেগ দেখাইয়াছিলেন।

ফকির সেনের প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তির উপরই ফরিয়াদী পক্ষ তাহাদের সমগ্র মামলা দাঁড় করাইয়াছেন। ফকির সেনকে কয়েক দফায় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের ডাকবাংলোয় লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পিতা মাতাকেও আনিয়া যাহাতে সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার না করে সে চেষ্টা করা হয়। মিঃ বসু এই সম্পর্কে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণের উপর তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন যে, এইসব প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন যে, পাহাড়ের নিকট চট্টগ্রাম হইতে সাঁজোয়া গাড়িতে প্রেরিত সেনাদলের সঙ্গে আসামীদের লড়াই হয়। ফকির সেনকে তথায় লইয়া গেলে সে জঙ্গলের ভিতর পতিত একটি রিভলভার তুলিয়া লইয়া গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে। মিঃ বসু বলেন, যদি সত্য সত্যই ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা স্বীকারোক্তি পরীক্ষা করিবার চোট সহ্য করা ফকিরের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলিয়াছেন যে, জেলের ভিতরে আসামীদিগকে সনাক্ত করিবার সময় ফকির সেনকে একটি বোরখায় ঢাকিয়া আসামী-দিগকে সনাক্ত করিতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সময় ফকির হঠাৎ বোরখার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া আবেগভরে চীৎকার করিয়া বলে—"এই যে আমি তোমাদেরই ভীরু বন্ধু! তোমাদের সকলকে ফাঁসি দিতে যাইতেছি।" মিঃ বসু বলেন, "ভীরু"—এই কথাটি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাহার নিকট স্বীকারোক্তি পাইবার জন্য তাহাকে অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। আসলে পুলিশই তাহাকে মূল কাহিনীর তথ্য জোগাইয়াছিল।

আসামী সুবোধ বিশ্বাস সম্বন্ধে কৌসুলি বলেন, লুণ্ঠনের পর দিবস গণেশ ঘোষের বাড়ীতে যখন খানাতল্লাসী হয়, তখন ঐ বাড়ীর নিকটেই রাস্তায় একশিশি ঔষধ হস্তে সুবোধকে গ্রেফতার করা হয়।

সুবোধ তখন মাত্র জ্বর এবং বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে সারিয়া উঠিয়াছে এবং পার্শ্ববর্তী এক ডিসপেন্সারীতে ঔষধ ক্রয় করিতে যায়। পুলিশের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার অভিযোগে তাহাকে সন্দেহ করা হইয়াছে। গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা ইহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

লালমোহন সেনের নাম অনুসন্ধানকারী পুলিশ কর্মচারীদের তালিকায় দৃষ্ট হয় নাই বা যাহাদিগকে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকায় তাহার নাম ছিল না। সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে, লালমোহন কলিকাতায় পুলিশ কর্মচারীর নিকট মিথ্যা নামে পরিচয় দিয়াছিল। উহা তাহার পক্ষে ঠিকই হইয়াছিল। কারণ সে কোনরূপ দোষ না করিয়া থাকিলেও পুলিশের চর সর্বদা তাহাকে অনুসরণ করিত ও চোখে চোখে রাখিত।

তাহার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ যে স্বীয় স্বীকারোক্তি সে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মক্কেলগণকে শুধু সন্দেহের বশে মামলায় জড়িত করা হইয়াছে কিন্তু অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বা ষড়যন্ত্রের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব প্রমাণিত হয় নাই। তিনি বিদ্রোহীদের তালিকা ও প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া সমালোচনা করেন এবং তাঁহার মক্কেলদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

পূর্ণ এগার দিন ধরিয়া শ্রীযুক্ত বসু আসামীদের পক্ষে বক্তৃতা করিয়া অদ্য তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু অদ্য রাত্রে কলিকাতায় রওনা হইবেন। আর ছয় জন আসামীর পক্ষে কৌঁসুলী কামিনীকান্ত ঘোষাল অদ্য তাঁহার সওয়াল জবাব আরম্ভ করেন।

[বঙ্গবাণী: ২২-১২-৩১]

শ্রীযুক্ত শাসমলের সওয়াল আরম্ভ: চট্টগ্রাম, ১১ই জানুয়ারী। প্রধান আসামী অনন্ত সিং গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের পক্ষে কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত শাসমল সওয়াল আরম্ভ করেন। আসামী ননী দেবের কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তকে কুমিল্লায় গ্রেফতার করার পর শ্রীযুক্ত চ্যাটার্জীকে তাহার কৌঁসুলী নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া

প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত শাসমল তাঁহার বক্তৃতার উদ্বোধনে বলেন যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই মামলার সাক্ষ্য তিনি গোড়া হইতে না শুনিতে পারায় তাহাকে খুব কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। সরকার পক্ষ হিমাংশুর বিবৃতিকে মৃত্যুকালীন ঘোষণারূপে দাখিল করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি হিমাংশুর বিবৃতির ত্রুটিগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলেন ঐ বিবৃতি স্বেচ্ছা প্রদত্ত নহে। হিমাংশুর সর্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় সে অত্যান্ত শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। ঐ সময়ে তাহার বিবৃতি গ্রহণ করা হয়। ঐ বিবৃতি স্বাক্ষরিত হয় নাই।

হিমাংশুর বিবৃতিকে যদি মৃত্যুকালীন জবানবন্দীরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কেবলমাত্র তাহার মৃত্যুর অথবা ক্ষতের কারণের উল্লেখ থাকা কর্তব্য। এ বিবৃতি দ্বারা অপরাপর লোক-দিগকে জড়িত করা চলে না—এই যুক্তি দেখাইয়া শ্রীযুক্ত শাসমল বলেন হিমাংশুর বিবৃতি গ্রহণীয় হইতে পারে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শাসমল মতিলাল কানুনগো এবং অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারের স্বীকারো'ক্ত লইয়া আলোচনা করেন। তিনি বলেন—১৯৩০ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে উভয়ের সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। পাহাড়ের উপর মতিলালের মৃত্যু হয়, অর্দ্ধেন্দুকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ২৩ শে এপ্রিল রাত্রি ১ ঘটিকার সময় তথায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মতিলালের স্বীকারোক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে কৌসুলী বলেন যে, লিখিত দলিলে তাহার খাঁটি কথাগুলি থাকিতে পারে না। কেননা তাহার অবস্থা ঐ সময়ে এতই খারাপ ছিল যে, তাঁহার পক্ষে বিবৃতি প্রদান করা সম্ভব ছিল না। মিঃ লুইশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, মতিলাল মাঝে মাঝেই যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল। যে ফটোগ্রাফার দলের সঙ্গে পাহাড়ে গমন করে সেই বলিয়াছে যে মতিলালের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এস. পি. বলেন—মতিলাল অপরাহ্ন ১ ঘটিকার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়,

অক্ষমতাবশতঃ স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করিতে পারে নাই। ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, মতিলালের অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, তাহার বুঝিবার এবং বিবৃতি সত্য বলিয়া স্বীকার করার শক্তি ছিল না। আঙ্গুলচিহ্ন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন, মতিলালের বিবৃতি'তে তাহার বিবৃতির ছাপ লওয়া হয় নাই। এই সকল কারণে উক্ত বিবৃতিকে মতিলালের বিবৃতি বলিযা গ্রহণ করা অসম্ভব হইযা পড়িয়াছে।

অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন—২৩শে এপ্রিল প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকায় অর্দ্ধেন্দুর ভার গ্রহণ করা হয় এবং ঐদিন রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার শরীরের নিম্নাংশ বন্দুকের গুলিজনিত ক্ষতের ফলে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সেনের নিকট বিবৃতি প্রদান করিতে প্রথমতঃ সে অস্বীকার করে। যখন অর্দ্ধেন্দুর পুরাপুরি জ্ঞান ছিল না, তখন মহকুমা হাকিম তাহার বিবৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিবৃতি গ্রহণের কালে সে অর্দ্ধ-চৈতন্য বা অচৈতন্য অবস্থায় ছিল। বিবৃতিতে তাহার স্বাক্ষর অথবা আঙ্গুলের ছাপ লওয়া চলে নাই। যদি তাহার পুরাপুরি চৈতন্য থাকিত তাহা হইলে সে বিবৃতিতে স্বাক্ষব করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। একমাত্র মহকুমা হাকিম ব্যতীত অপর কোন সাক্ষী হইতে এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই যে, অর্দ্ধেন্দুর নিকট বিবৃতি পঠিত হইয়াছে এবং সে উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই সকল কারণে অর্দ্ধেন্দুর বিবৃতি টিকিতে পারে না।

"অনন্ত পুলিশ লাইনের প্রহরীকে গুলি করিয়াছিল"—হিমাংশু সেনের এই উক্তি অপর কেহ সমর্থন করে নাই। পুলিশ লাইনে বেবি অস্টিন মোটর পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহাকে ঘটনার সহিত জড়িত করা যায় না। ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে অনন্ত মোটর চালাইয়াছে ইহার কোন প্রমাণ নাই। একজন সাক্ষী কর্তৃক ফেণীর গুলিমারা ব্যাপার সম্পর্কে অনন্তের সনাক্তকরণের উপর আস্থা স্থাপন করা চলে না।

মিঃ লোম্যান ও অপরাপর পুলিশ কর্মচারীর নিকট অনন্তর চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে লিখিত। উহা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আসামী গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল সম্বন্ধে তিনি বলেন—তাহাদের বিরুদ্ধে নরহত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগের কোনও প্রমাণ নাই। উপসংহারে তিনি ট্রাইবিউনালকে দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত দণ্ডের বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। [বঙ্গবাণী : ১৭-১-৩২]

সওয়াল জবাব শেষ : চট্টগ্রাম ৩০ শে জানুয়ারী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শেষ দলের ১৫ জন আসামীর পক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীশ বসু অদ্য তাঁহার সওয়াল জবাব শেষ করেন। উপসংহারে তিনি কতিপয় আসামীর তরুণ বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে ট্রাইবিউনালকে অনুরোধ করেন। সরকার ও আসামী পক্ষের সওয়াল জবাবের জন্য প্রায় তিন মাস লাগিল। ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট বলেন যে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী রায় প্রদত্ত হইবে। [বঙ্গবাণী : ৩১-১-৩১]

রায় প্রকাশ আসন্ন

কর্তৃপক্ষের সতর্কতা অবলম্বন : চট্টগ্রাম, ১২ই ফেব্রুয়ারী। লাল পতাকা দ্বারা চিহ্নিত জেলের নিকটবর্তী সীমানায় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জরুরী ক্ষমতা জারী করিয়াছেন। পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেটেলমেণ্ট এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, চট্টগ্রাম লুণ্ঠন মামলার রায় প্রকাশ সম্পর্কেই এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় দেওয়া হইবে। [বঙ্গবাণী : ১৪-২-৩২]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায়

অনন্ত সিং প্রভৃতি বারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুইজনের সশ্রম কারাদণ্ড : পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত।

চট্টগ্রাম ১লা মার্চ। সুদীর্ঘ ১৯ মাসকাল বিচার চলিবার পর আজ চট্টগ্রামের লোমহর্ষক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার যবনিকাপাত হইল

বিচারকগণ নিম্ন-লিখিত ১২ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন: (১) অনন্ত সিং (২) গণেশ ঘোষ (৩) লোকনাথ বল (৪) আনন্দ গুপ্ত (৫) ফণী নন্দী (৬) সুবোধ চৌধুরী (৭) সহায়রাম দাশ (৮) ফকীর সেন (৯) লালমোহন সেন (১০) সুখেন্দু দস্তিদার (১১) সুবোধ রায় এবং (১২) রণধীর দাশগুপ্ত।

আসামী অনিল দাসকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং (২) নন্দলাল সিংকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ফ্রী প্রেসের বিবরণে প্রকাশ আসামী অনিল দাশকে তিন বৎসর বোরস্টাল স্কুলে আটক রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইযাছে।

নিম্নলিখিত ১৬ জন আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। (১) নিতাই ঘোষ (২) শান্তি নাগ (৩) অশ্বিনী চৌধুরী (৪) ননী দেব (৫) মালন ঘোষ (৬) শ্রীপতি চৌধুরী (৭) মধুসূদন গুহ (৮) সুবোধ বিশ্বাস (৯) সুবোধ মিত্র (১০) সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী (১১) সুকুমার ভৌমিক (১২) সুবোধ বল (১৩) হেরম্বলাল বল (১৪) বিজয় সেন (১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং (১৬) বীরেন্দ্র দস্তিদার। কিন্তু মুক্তি পাইবার পর ইহাদিগকে পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দণ্ডিত আসামীগণকে দ্বিপ্রহরের সময় চট্টগ্রাম হইতে কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বিচারকগণ সমস্ত আসামীকেই জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রায় চার মাস কাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে তদন্ত চলে। ইন্সপেক্টার আব্দুল আজিম খাঁ-ই প্রধানতঃ এই তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। তিনি পরিশেষে ৫৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে (মৃত ১৯ জন বাদে) চার্জ সিট দাখিল করেন। তন্মধ্যে ৩২ জন ধৃত হইয়া বিচারার্থে প্রেরিত হয় এবং ২৪ জন ফেরার হয়।

১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের নিকট এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসে স্যার

চার্লস টেগার্ট কলিকাতার একদল পুলিশ লইয়া চন্দননগরে ৪জন ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তন্মধ্যে গণেশ ঘোষ লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্তকে বিচারার্থে স্পেশাল ট্রাইবিউনালের নিকট পাঠান হয়। (অপর আসামী জীবন ঘোষাল চন্দননগরেই মারা যান) আসামীদের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) আবার নূতন করিয়া বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারকালে অন্যান্য ফেরারী আসামীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীর হত্যা সম্পর্কে চাঁদপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। এই হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণের ফাঁসী এবং কালীপদর যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড হয়।

এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আরও একটি শাখা গজায়। চট্টগ্রাম পুলিশ ইন্সপেক্টার খানবাহাদুর আসানুল্লার হত্যাকাণ্ডে এই সম্পর্কে আসামী হরিপদ ভট্টাচার্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। অন্যান্য ফেরারীদের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তীকে এবং সম্প্রতি আরও একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের পরে বিচার হইবে। ইহাদের ছাড়া এখন আরও ১৭ জন আসামী ফেরার আছে। ইহাদের ধরিবার জন্য ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

মোট ৩৫ জন আসামীকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই জনের (অর্দ্ধেন্দু গুহ এবং অনিল রক্ষিত) বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। তাহাদিগকে পরে এখানে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত করা হয়।

আরও তিনজন আসামী—রঞ্জন লাল সেন, গোলাপ লাল সিং (উভয়ে উকিল) এবং যোগেন্দ্র—ওরফে মনা গুপ্তকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই মামলায় ৩১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়। ইহাদের সাক্ষ্য প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠার টাইপকরা কাগজে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তদন্তকারী ইন্সপেক্টার আব্দুল আজিজ খাঁর জবানবন্দীতেই প্রায়

৭০০ পৃষ্ঠা গিয়াছে। উক্ত ইন্সপেক্টার প্রায় ৪ মাস জবানবন্দী দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া সরকার পক্ষ প্রায় ১১০০ একজিবিট দাখিল করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, মাস্কেট, বেআইনীভাবে আমদানী করা অস্ত্রশস্ত্র, বোমা-গুলি-বারুদ, একটি লুইস বন্দুক, ৪ খানা মোটর গাড়ী, খাকি পোষাক, জলপূর্ণ বোতল ও অন্যান্য নানা প্রকার জিনিস, বিপ্লবী ইস্তাহার, বিপ্লবী সংগ্রহ তালিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জিনিস কতক বিভিন্ন স্থানে এবং কতক অন্যতম প্রধান আসামী গণেশ ঘোষের গৃহে পাওয়া যায়।

কমিশনারগণ বলিয়াছেন: ফকির সেন, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার ও রণধীর দাশগুপ্ত সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট তাহাদের অল্প বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তপথে চালিত স্কুলের ছাত্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু আইন অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা তাঁহাদের কর্তব্য। [বঙ্গবাণী : ২-৩-৩২]

চট্টগ্রামে সৈন্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ

সেনাদলের ক্যাপ্টেন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত: 'দার্জিলিং, ১৪ই জুন। এইখানে এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকট বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরন ও ২ জন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট ২টি রিভলভার ও গুলি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের একজন নির্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। [আনন্দবাজার: ১৫-৬-৩২]

সূর্য সেনকে ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার: ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কার্যে বিপ্লবীদের নেতা বলিয়া কথিত সূর্য সেনকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে বা এমন সংবাদ দিতে পারিবে যাহাতে সে ধরা পড়ে, তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ১৩ই

জুন তারিখ পটিয়ায় বিপ্লবীদের সহিত যে সংঘর্ষের ফলে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হইয়াছে, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের পরিচালক।

[আনন্দবাজার ৩-৭-৩২]

চট্টগ্রামের পলাতকা

ধরিবার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা: চট্টগ্রাম ১২ই জুলাই। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।

[আনন্দবাজার: ১৩-৭-৩২]

২৪শে সেপ্টেম্বর আঘাত হানলেন অগ্নিযুগের বীরাঙ্গনা সেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার।

বোমা, রিভলবার ও রাইফেল

প্রীতি সম্মেলনে ইউরোপীয়ানদিগকে আক্রমণ: চট্টগ্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর। গতকল্য রাত্রি ১১টার সময় বিপ্লবী বলিয়া বর্ণিত একদল লোক পাহাড়তলী ইনস্টিটিউট নামক আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাবে অতিশয় দুঃসাহসিকভাবে ইউরোপীয়ানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীর দলে পুরুষের বেশে সজ্জিত একজন নারীও ছিল।

আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে একজন বৃদ্ধা ইউরোপীয়ান মহিলা নিহত এবং ইন্সপেক্টার ম্যাক-ডোনাল্ড, সার্জেন্ট উইলিস এবং অপর ছয়জন ইউরোপীয়ান আহত হন।

একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আক্রমণকারী দলের আর সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। পুরুষের পোষাকে সজ্জিত ২০ বৎসর বয়স্কা এই নারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ ক্লাব হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছিল। ইহার বক্ষস্থলে গুলিবিদ্ধ হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, এই স্ত্রীলোকটিকে কুমারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার বি. এ. বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। সে নাকি চট্টগ্রাম শহরের শ্রীযুক্ত

জগৎবন্ধু ওয়াদ্দাদারের কন্যা। তাঁহার পকেটে রিভলবার ও রাইফেলের কতকগুলি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছিল।

[আনন্দবাজার ২৬-৮-৩২]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নামে যা খ্যাত তার মূল নায়ক এবং চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন তখনও ধরা পড়েন নি। তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য সরকার দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সেই দশ হাজার টাকার লোভ সামলাতে না পেরে অসৎ গ্রাম্য জমিদার নেত্র সেন বিশ্বাসঘাতকতা করে মাস্টারদাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেয়। তখন তাঁর বয়স ৩৯, স্বাস্থ্যও দুর্বল তথাপি তিনি সহজে ধরা দেন নি। পুলিসের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করেছিলেন এবং ধরা পরবার পর বর্বর পুলিসের হাতে অকথ্য নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন। আর সেই নেত্র সেন? তাকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল ভোজালির ঘায়ে।

মাস্টারদা গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি। ১৮-২-৩৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সেই খবর তুলে দিচ্ছি :

চট্টগ্রামের সূর্য সেন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারী সূর্য সেনকে গত রাত্রে পাটিয়া থানার গৈরালা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রধান আসামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সূর্য সেন পলাতক ছিলেন এবং তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গভর্নমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এরপর বিচার। মাস্টারদার সঙ্গে আরও দু'জন আসামী ছিলেন। তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা দত্ত। মাস্টারদা ধরা পড়লে এই তারকেশ্বরকে পরবর্তী নেতা নির্বাচিত করে রাখা হয়েছিল এবং কল্পনা পরে বিবাহসূত্রে কল্পনা যোশী নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের ১৪ অগস্ট রায় দেওয়া হল। ১৫ অগস্ট তারিখের ১৯৩৩ আনন্দবাজার পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়েছিল :

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রতি প্রাণদণ্ড
কুমারী কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

চট্টগ্রাম ১৪ই আগস্ট—অদ্য দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রাইবিউনাল হইতে অতিরিক্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় প্রদত্ত হয়। ট্রাইবিউনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ঐ একই ধারায় তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। কুমারী কল্পনা দত্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়।

আদালত প্রাঙ্গণের চারিদিকে পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। রায় প্রদত্ত হইবার পূর্বে সেনাদল কিছুকাল শহরে কুচকাওয়াজ করে।

আসামীরা শান্তচিত্তে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহারা বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিতে করিতে আদালত গৃহ ত্যাগ করে।

ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেন্ট রায়ের উপসংহারীয় অংশ পাঠ করেন। ১৫০ খানি টাইপ করা কাগজে রায় প্রদও হইয়াছে।

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছিল। আপিল অবশ্য অগ্রাহ্য হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি শেষ রাতে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়। ফাঁসির সঠিক তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে কারণ অনেকের মতে তাঁকে আরও একদিন আগে অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি ১৯৩৪ তারিখে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ফাঁসির পর তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা পড়ে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের

সর্বাধিনায়ক মহান বিপ্লবী সূর্য সেন অথবা মাস্টারদা নামে জনপ্রিয় ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষটির বিষয় আরও কিছু জানতে চাওয়া স্বাভাবিক।

যে সব দেশে বিপ্লব ঘটেছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেই বিপ্লব চরম পর্যায়ে পৌছবার আগে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করেছে। ভারতও ব্যতিক্রম নয়।

প্রথম ধাপ হল অত্যাচারী শাসক বা তার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হত্যা করা। উদ্দেশ্য, শাসকদের ভীত করা ও দেশবাসীকে নির্ভয় করে তোলা। ভারতে এর সূত্রপাত ১৮৯৭ সালে, দামোদর চাপেকর কর্তৃক র‍্যাণ্ড সাহেবকে হত্যা। এই হত্যা চলতেই থাকে ১৯১২ সালে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেন।

এমন হত্যাকাণ্ড পরে আরও চলেছে।

দ্বিতীয় ধাপ, সম্মুখ সংঘর্ষ। তার প্রমাণ, বালেশ্বরে বুড়া বলাম নদী তীরে চষাখণ্ড গ্রামে চারজন সঙ্গীসহ বাঘা যতীনের মরণপণ ট্রেঞ্চযুদ্ধ।

তৃতীয় ধাপ, খণ্ড বিপ্লব যা চট্টগ্রামে ঘটল মাস্টারদার অধিনায়কত্বে পরে বিয়াল্লিশের আন্দোলন।

সর্বশেষ ধাপ, বিপ্লব যা সংঘটিত হয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে।

তৃতীয় ধাপের জন্য মাস্টারদা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অনেকের জানা নেই যে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পর শেষবারে মতো গ্রেফতার হওয়ার অনেক আগে মাস্টারদা একবার কলকাতায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারও আগে শোভাবাজারে গুপ্ত আড্ডা থেকে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে একবার পালিয়েছিলেন। সে ১৯২৫ সালের কথা।

পরের বছরে ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে তিনি হঠাৎ গ্রেফতার হলেন, প্রায় দু'বছর লুকিয়েছিলেন। একদিন সকাল বেলা আটটা নাগাদ গুপ্ত আড্ডা থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে (বর্তমান নাম নির্মল চন্দ্র

স্ট্রীট)। একটা গলিতে ঢুকতে যাবার সময় দেখলেন গলির মাথায় দাঁড়িয়ে একজন সিগারেট টানছে। পুলিসের টিকটিকি নাকি ? মাস্টারদা ভুল করলেন। তিনি ভাবলেন কলকাতার পুলিসের লোক তাঁকে কি করে চিনবে ? তাই এগিয়ে চললেন, সেই টিকটিকি দাঁড়িয়েই রইল। মাস্টারদা সেই গলিতেই একটি বাড়িতে ঢুকে কথা বলে সেই গলি দিয়ে না ফিরে অন্য গলি দিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে বেরিয়ে গুপ্ত আড্ডায় ফিরে এলেন।

দুপুরে কিন্তু আবার সেই গলিতে সেই বাড়িতে যাওয়ার কথা এবং গেলেনও তবে অন্য গলি দিয়ে। পথে সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি নজরে পড়ল না।

যে বাড়িতে বসে কথা বলছিলেন সেই বাড়ির সামনে গলি কিন্তু গলিটা ব্লাইণ্ড। বেরোবার পথ নেই। ওঁরা বৈঠকখানা ঘরে বসে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ওঁদের নজরে পড়ল একজন ছোকরা সেই গলি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে যাবে কোথায়, গলি ত বন্ধ। সন্দেহজনক। কয়েক মিনিট পরেই ছোকরা ফিরে এসে তাঁদের জিজ্ঞাসা করল, অমুক বাবু বাড়িতে আছেন ? ওরা বললেন, ও নামের কোনো লোক এ বাড়িতে থাকে না। প্রশ্নকর্তা ছোকরা ভাল করেই জানে যে সে নামের কোন লোক এ বাড়িতে থাকেন না কিন্তু তার মতলব ছিল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঘরে লোকদের বিশেষ করে মাস্টারদাকে চিনে নেওয়া।

ফেরবার সময় হল। গলিটা দেখে আসবার জন্য মাস্টারদা একজনকে পাঠালেন, সে ফিরে এসে জানালো কয়েকজন লোক এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তারা এ পাড়ার লোক নয়, সম্ভবতঃ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক।

মাস্টারদা ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। ব্লাইণ্ড লেন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বাড়ির ছাদ টপকে তিনি ওধারে রাস্তায় নেমে ছাতা খোলবার সময় দেখলেন কিছুদূরে প্রশ্নকর্তা সেই ছোকরা দাঁড়িয়ে।

মাস্টারদা কয়েক পা এগোতে না এগোতে সেই ছোকরা দ্রুত কাছে এসে বলল দাঁড়ান মশাই। মাস্টারদা যেন শুনতে পান নি। তিনি এগিয়ে চললেন। ও মশাই থামুন না ; যেন হুকুম।

মাস্টারদা বললেন, থামব কেন ? উত্তর না দিয়ে ছোকরা মাস্টারদার একটা হাত সাজোরে ধরল। সে এত জোরে হাত ধরেছিল যে মাস্টারদা হাত ছাড়াতে পারলেন না। ছোকরা হাত নেড়ে ইসারা করতেই কয়েকজন লোক এসে তাঁকে ধরে মোটরে তুলে ১৩ নম্বর ইলিসিয়াম রো-এ সেন্ট্রাল আই বি অফিসে নিয়ে তুলল।

এরপর তাঁকে মেদিনীপুর এবং ভারতের কয়েকটি বিভিন্ন জেলে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু এ হল স্বতন্ত্র কাহিনী।

এরপর শেষবারের মতো গ্রেফতার হলেন চট্টগ্রামে। তারিখ আগে একবার উল্লেখ করেছি, ১৬ ফেবরুয়ারি ১৯৩৩। দশ হাজার টাকা পুরস্কার অর্থের লোভে গ্রামের জমিদার নেত্র সেন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। নেত্র সেনও উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। ভোজালিতে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

অথচ ঐ নেত্র সেনেরই এক ভাই ব্রজেন সেন নিরাপদ ভেবে মাস্টারদাকে পটিয়া থানার অধীন গৈরালা গ্রামে ক্ষিরোদপ্রভা বিশ্বাস নামে এক মহিলার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল। মহিলা সম্ভবতঃ মাস্টারদার কাজকর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। গ্রাম্য মহিলার স্বভাব অনুযায়ী তিনি হয়ত এই সরল মানুষটি সম্বন্ধে গালগল্প করে বেড়াতেন। সেইসব কথা নিশ্চয় কিছু মোড়ল জাতীয় মানুষের কানে উঠেছিল এবং তার ফলে বিশ্বাসঘাতকতা।

গ্রেফতারের তারিখেই রাত্রি আটটা আন্দাজ সময়ে জানা গেল যে গুপ্ত আড্ডা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তখন সেই বাড়িতে হাজির ছিল কল্পনা দত্ত (পরে যোশী) শান্তি চক্রবর্তী, মনি দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, ব্রজেন সেন এবং সম্ভবতঃ আর কেউ। তবে ধরা পড়েছিল মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন।

স্থির হল এখনি এই বাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। মাস্টারদা হুকুম দিলেন এক ঘণ্টার মধ্যে বই ও কাগজপত্র, নিজেদের টর্চ, রিভলবার, পিস্তল সব নিয়ে তৈরি হও।

সরকারের কড়া আদেশ জারী হয়েছে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ জারী হয়েছে। রাস্তা অন্ধকার ও নির্জন। রাত্রি ঠিক সওয়া ন'টায় সকলে সার বেঁধে একের পশ্চাতে আর একজন সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল। সবার আগে ছিল ব্রজেন সেন তারপরই মাস্টারদা।

একটা বাঁশের বেড়া পার হতে হবে। কিছু আওয়াজ হয়ে থাকবে। কাছেই কোথায় যেন বিনা মেঘে বাজ পড়ল, চড়া গলায় চ্যালেঞ্জ, কোন হ্যায় ?

সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাস্টারদা আদেশ দিলেন বাড়ির আড়ালে চলে যাও তারপর পশ্চিম দিকের বাঁশবন পার হয়ে পালাতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ পিস্তল বা রিভলবার মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে মাস্টারদার আদেশ মেনে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু কপাল মন্দ। শুকনো বাঁশ পাতায় জুতো পড়তে নির্জন নীরব অন্ধকারে সেই আওয়াজ যেন শতগুণে বেড়ে গেল।

ততক্ষণে সুশিক্ষিত গোরখা সেপাইরা আওয়াজ অনুসরণ করে কর্ডন রচনা করে ফেলেছে। তারা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। প্রথমে ধরা পড়ল ব্রজেন সেন। মাস্টারদা সেই সুযোগে কর্ডন ভেদ করবার চেষ্টা করলেন। একজন গোরখা দেখতে পেয়ে অনুসরণ করল। মাস্টারদা গুলি করলেন কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

একজন গোরখা আকাশে একটা গুলি ছুঁড়ল। সেই গুলি ফেটে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেল। সেই আলোয় মাস্টারদাকে দেখতে পেয়ে তিন দিক থেকে তিনজন গোরখা ছুটে এসে মাস্টারদাকে ধরে ফেলল। গোরখারা ব্রজেন ও মাস্টারদাকে মাটিতে ফেলে হাত পা বেঁধে গাছের সঙ্গে বেঁধে সারারাত ফেলে রেখেছিল। মাঝে মাঝে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আঘাত, সবুট লাথি এমন কি দেহে প্রস্রাবও

করেছিল। মাস্টারদা নীরবে উৎপীড়ন সহ্য করতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স উনচল্লিশ, স্বাস্থ্যও ভাল নয়।

মাস্টারদাকে এত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হয়েছিল যে আর একজন পুলিস অফিসার সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বলেছিল, ওকে আর মেরো না।

[চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাকে অধিকাংশ তথ্য সরবরাহ করেছেন শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ সেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। —লেখক]